চরপূর্ণিমা

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য প্রকাশ
৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

মুদ্রাকর : জগৎরঞ্জন মজুমদার, আকরিকা

৭. বিশ্বনাথ মতিলাল লেন. কলিকাতা-১২

নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

বন্দর

রামপদর অশনব্যসন

বিনোদনের বিপণন

স্বজনভূমি

গল্প সংকলন

যাত্রী নিবাস

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

(১)

কোমর অব্দি বালির মধ্যে ডুবে টিউকলটা একলা দাঁড়িয়ে। ঝাঁকে-ঝাঁকে বৃষ্টির ফলা। বিদ্ধ করে পিস্টন হাতল, জল উগরানোর লোহা নলিমুখ। শেষ আষাঢ়ের একটানা বৃষ্টিপাতে স্নান করে ধাতব বস্তুটা। ধুয়ে যায় চারপাশের বালি। রঙ ফুটে ধবধবে ফরসা।

আচমকা বাতাসের বেগে দূরের ঝাউ, বাইন, গরানের শাখা প্রশাখায় পাতাগুলো বৃষ্টির ফোঁটায় গা বুক মেজে-ঘষে নির্মল, সবুজ। সদ্য-রোপিত ঝাউচারা জলে রোদে তরতরিয়ে দু-আড়াই ফুট। লিকলিকে কাণ্ড-রেখায় কচি-কচি ডালপালা গজিয়ে নিজস্ব বেধ পরিসরে আকাশ আর আশপাশ দখল রেখে দাঁড়াতে হিমসিম।

অবিরাম বৃষ্টিপতনে মিহি সাদা বালি, জল শুষে নিতে-নিতে তলন্ত রেখায় চোরা ফল্গু। বালির চর কিনারে বিস্তারিত নোনাজল, সমুদ্র উপচে এঁকে বেঁকে শাখা নদী মুখি। জনপদে আগ্রহী। একলা টিউকলটার খানিক তফাতে বৃষ্টির ফোঁটার চড়বড় শব্দ। মালবাবুর ছোট্ট চালায় মেছো আড়ত। খড় হোগলার ছাউনির উপর কালো তেরপোলিন টান-টান করে বাঁধা। ফাল্গুন চৈত্র পার করে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েও মেছো ডিঙির কাছ থেকে সস্তায় কাঁচামাছ কিনে মাথা-মুটেয় একেবারে বাস রাস্তার বড় আড়তে চালান। ঝড় বৃষ্টির দাপট সয়ে একলা রাজত্বের নির্বিরোধ বসবাস মালবাবুর। এই ক'মাস।

মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়া। নোনাজলে ঘেরা লুথিয়ানা জঙ্গল দুলিয়ে বায়ু-প্রবাহ তছনছ করে সমুদ্র বুক। সাঁ সাঁ শব্দে গর্জে ওঠে নোনা ঢেউ। বড়-বড় ফণায় ঢেউ মাথা ফুলিয়ে ছোবল মারে কাছের জঙ্গলে দ্বীপের মাটিতে। বালি কিনারে। উপরে আকাশ নিচে নোনাজল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দ্বীপভূমি, মাঝখানের প্রলম্ব শূন্যতায় বৃষ্টির ফোঁটা অসংখ্য হিজিবিজি দাগ কেটে মুছে যায়। আবার বারিপতনে নতুন রেখা আঁকে! মুহূর্তে মুছে গিয়ে মহাশূন্যতা। আকাশ আকাশে থাকে, নোনা জল ভারী হয়। অন্তরীণ মাছেরা, নানা প্রজাতির মাছেরা খলবলিয়ে শুষি মারে জলের মধ্যে।

একলা টিউকল থেকে আরও দক্ষিণে মাথা উঁচিয়ে ঝাউ, দেওদার, আকাশমণি, বাইন, গোঁমুয়া ঝাঁকড়া হয়ে ঘন সবুজে দুর্ভেদ্য। বৃষ্টি মাখে, হাওয়ার দমকে মাথা নোওয়ায়, গা ঝাড়া দিয়ে জল ধরায়। ক'খানা বাচ্চাকাচ্চায় বানরগুলো মোটা ঘন পাতার নিচে ঠাঁই খুঁজে গা বাঁচায়। শাল বল্লার উঁচু খুঁটিতে কাঠের পাটাতন গড়ে তার উপর কাঠের দেওয়াল জানালায় চিলখালির ফরেস্ট অফিস। ফরেস্ট অফিসের অ্যাজবেস্টার ছাউনির মটকা ভেজে। বৃষ্টির ফোঁটা জলের ধারা হয়ে অ্যাজবেস্টারের খাঁজ ঢেউ বেয়ে ছাঁচ গড়ায়। খুঁটিতে খুঁটিতে উঁচু পাটাতন। তলা দিয়ে বৃষ্টি বেয়ে যায়, সাপ, বিছে বেয়ে যায় আরও উঁচু ঝোপ, নিরাপদ ঠাঁইয়ের খোঁজে। পাশে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগর ঢেউ

আছড়ে জলে বাতাসে শব্দ তোলে। ঝাউ বাইনের ডাল-পালা নাচিয়ে বাতাস ছিঁড়ে সাঁ সাঁ আওয়াজ। মড়কা ডাল শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায় বহুদূরে। অফিস চত্বরে পলি প্যাকেটে কচি ঝাউ চারা কৃষ্ণচূড়া আদুরে গায়ে এক দঙ্গল শিশুর মতো ভিজে সপসপে। চকচকে। নোনা জলের উপর আকাশ যেখানে বৃষ্টি ঝাপসায় একাকার, হঠাৎ ভুবন ঝলসিয়ে বিদ্যুৎ মেঘ ফালা ফালা করে বালির চর ডিঙিয়ে বাঁধ ঘেঁষে নতুন মাটিতে বাঁধানো বাইন গাছের গোড়ায় সিঁদুর রাঙানো এক চাঙড় পাথরের সোজাসুজি প্রচণ্ড কড়্‌কড়্ আওয়াজ করে। ক'দিনের বর্ষায় ডালে ডালে কচি পাতা। কচি ডগে ক্ষণিকে হাজার ফুলঝুরির চমক। বালিস্থানের সিঁদুর রাঙানো পাথরখণ্ডে কালী নির্বিকার অনন্ত কাল হয়ে অনড়। স্থানু। লোকমুখে বালিস্থানের কালী, বুড়ির ঝি। চণ্ডী। অবিরাম বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়, পাথরখণ্ডটির গায়ে বিদ্যুৎ ঝলক, কচি পাতার ডগে তাপ চোট। তখনও গুম্ গুম্ বাজে রয়ালগঞ্জের বড়-বড় পাল্লায় লকগেট। কেঁপে যায় পরিদর্শন কুঠির দরজা জানালা। মাথা মুড়িয়ে দোল খায় ক'খানা প্রকাণ্ড নারকেল গাছ।

বুনো কেঁটকি, ঝাউ হেঁতাল ঝোপ ফেলে বাঁধ। বাঁধের গা বেয়ে চালু মেটে পথ খানিক জাগিয়ে পঞ্চায়েতের ইট বিছনো রাস্তা সোজা বাস-রোডে। ডাইনে মাস্টারবাবুর প্লাস্টারহীন দোতালা। চিলে কোঠায় ব্যাটারি সেটে টিভির অ্যান্টেনা ভিজে জল পড়ে টপ্‌টপ্। গোড়ায় সিমেণ্টের চাতাল বাঁধানো বট গাছটা ভিজে পাতায় জড়সড়। বিজয়বাটির মস্ত আকাশের খানিক আগলে ভারি। বটের পাশ দিয়ে মেটে রাস্তাটা এঁকে বেঁকে কটা উঠোনের পাশ কাটিয়ে থেমে গেছে বনবিহারীর পুকুর পাড়ে। নিচু চালার দাওয়ায় এক টুকরো চট বিছিয়ে বসে। উবু হয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি দেখে। চটের পাশে একখানা তোবড়ানো, ধুলোর আস্তরে চামড়ার ব্যাগ। হাতলটার সেলাই ছিঁড়ে অকেজো। লোহার আংটা ছেড়ে দু-ফাঁক। ক্লিপ আঁটা তালা চাবির জায়গাটা মরচে পড়ে দু-দুটো পঞ্চায়েত নির্বাচন জ্ঞাপক। গত পঞ্চায়েত ভোটের আগেরটায় নির্বাচিত সদস্য বনবিহারী। জায়গা জমি বিলি, কাগজ পড়চা ঘাটতে-ঘাটতে ভূমি কমিটির দক্ষ সদস্য। তখন তো দেওয়ানি মামলা, হাইকোর্ট কেস রুখতে নিতান্ত কৃষক-সেবী সদস্য। ছেলেবেলায় বাপের সংসারে ভীষণ অভাব। সিক্স সেভেনে পড়তে-পড়তে চাষে হাল লাঙ্গলে, বোঝা বওয়া মুটে, মাটি কাটায় ঝড়া বওয়া মাথালি! সেই ছোকরা ভোটে জিতে সদস্য! কম জ্বলেছে পুরনো বাবুরা… ! হাতের বিড়ি টানতে গিয়ে নিভে ছাই। সুতরাং দেশলাই খোঁজে। পেয়ে যায়। তখনই উল্টো বাতাসের ঝাপটা চালা টপকে একদম দাওয়ায়। পাশের কাগজ-পত্তর সরাতে-সরাতে ডাকে, ও অমলা—একটু আসবে তাড়াতাড়ি ?

—ছেলেদের ভাত ফুটাচ্ছি। না গেলে চলবে নি? অমলা নিজের ব্যস্ততা জানায় সঙ্গে অনিচ্ছাটাও।

যদিও বৃষ্টির উপদ্রব এখন দাওয়ায় নেই; পাশের কাগজগুলো এলোমেলো। নিচু চালায় সরু এক ফালি দাওয়া। বাচ্চা মেয়েগুলো তাদের মাকে ঘিরে পাশ

কামরায়। মা উনুনে শুকনো পাতানাতার জ্বালুন ঠেলে-ঠেলে দিচ্ছে। আগুন চড়বড়িয়ে হুক্কা তৈরি করে। বাচ্চাগুলোর কচি গালে তাপ। হাঁড়ির ভাত ফোটে, বুট-বুট শব্দ। খানিকপরে গরম ফেন ভাত ডিশ বিছিয়ে টলটল করবে। সেই অভিজ্ঞতায় অধীর প্রত্যাশা, সংযম।

মাথা ঝাড়া দিয়ে খানিক লম্বাটে বছর দশেকের মেয়ে ঝুমা বলে, মা—দুটো আলু দাও না গো ভাতের মধ্যি ?

মা হেসে চুপ থাকে। জ্বালুন ঠেলে ধীরে-ধীরে। একটা-একটা কাগজ মেলে মন দিয়ে দেখে বনবিহারী। পুরনো আমলের খাজনার রসিদ। রসিদের মাথায় লেখা, শ্রীশ্রী বিশালক্ষ্মী মাতা সহায়। তারপর নাম। শ্রী নিবারণ নায়েক সাং পশ্চিম বিজয়বাটি। সন বাংলা ১৩৪৪ মাস চৈত্র মোট খাজনার পরিমাণ ৫ ॥৵০ আনা। একদম নিচে, "মালিকের পক্ষে আদায়কারী…।" কত কালের পুরনো সাদা কাগজ দশকের পর দশক পার হয়ে বিবর্ণ। ঠাকুর্দা নিবারণ বুড়ো বাণ্ডিল বেঁধে রেখে গেছিল টিনের সুটকেসে। সে সুটকেস জং ধরে জীর্ণ। গত বছর সুটকেসটা তুলতে গিয়ে টিনের খোল ঝরে ধসে ভগ্ন। যেমন করে রসিদ গ্রথিত দাগ খতিয়ান বাহক চাষ জমি ভাদ্রের একরাতের ভরা জোয়ারে পাড় ধসিয়ে সমুদ্রের পেটে! একদা চাষের জমিতে এখন সমুদ্রের ঢেউ নাচে। ডিঙি নোঙর ফেলে। গেঁমুয়া বাইনের ঝোপ বৃদ্ধি পায়।

আবার বাতাসের দমক। উঠোন পার হয়ে পুকুর ঘাটের সজনা গাছের ডালটা মট করে ভেঙে যায়।

কাগজগুলো ভাঁজে-ভাঁজে রেখে আর একটা পেয়ে যায়। কাগজখানা মেলে ধরে মুখে মৃদু হাসি বনবিহারীর। মোটা-মোটা হরফে রুমাল সাইজে খসখসে গোলাপি কাগজে ছাপা "শুভ পরিণয়" শিরোনামটার দু-পাশের কোণ থেকে দুই পরি ডানা মেলে উড়ে আসছে টাটকা ফুলের মালা হাতে। দুই দিক থেকে উড়ে আসা দুই পরির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় লেখা, শ্রীমান নিবারণ নায়েকের সহিত কুমারী উর্মিলার শুভ পরিণয়ে প্রীতি উপহার"। বিবাহ বাসর—দুর্গাচক। মিলন মন্দির—পশ্চিম বিজয়বাটি।

আষাঢ়ের আকাশে ঝিমঝিনি দিয়ে বৃষ্টি। গাছ-গাছালির ডগায় খড় কুটোর বাসা। কাক পাখি দোল খায়। ডানা পিঠের পালক ভিজে জবজবে। ছাঁচের জল দাওয়ার ধারি বেয়ে উঠোনে গড়ায়।

যত্নে কাগজটার ভাঁজ খুলে বনবিহারী দেখে, আশীর্বাণী। শুরুটা, ওগো বধূ—। শব্দ তিনটে পড়েই একটু থামে। জোরে হাঁক দেয় বউকে, ও অমলা একটু শুনো তো—খানিক আগে নিরস্ত করেও আবার হাঁক ডাক। সুতরাং অমলা উনুন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল তো রে। বার-বার হাঁকে কেন ?

মাথা ঝাড়া দিয়ে লম্বাটে, দশ বছুরে মেয়েটাও সঙ্গ নেয়। বাচ্চা ছেলেটা কাপড় খামচে হাঁটে। পাতানাতার জ্বালুন জোগান না পেয়ে আগুন খানিক নিস্তেজ।

পাশ চালার রান্নাশাল থেকে ক'পা ফেলতেই বনবিহারীর গায়ের কাছে।

বিরক্তি ফুটিয়ে গলার স্বর, কী বলো তো ?

দু-হাঁটুর মালাই চাকি আলগা। সবুজ লুঙিটার কাপড় চোপড় এক তাল হয়ে কোলের কাছে। দু-হাতে গোলাপি রঙের একখানা কাগজ। সেটা নিয়ে বলে, দেখবে ?

—কি ? জানতে চায় অমলা। পাশে দশ বছুরে মেয়ে ঝুমা। বাচ্চা ছেলেটা কাপড় আঁকড়ে মায়ের গায়ে লেপ্টে।

—ঠাকুর্দার বিবাহের কাগজ।

বনবিহারীর কথায় খানিক বিস্ময়! রান্নাশাল থেকে বেরিয়ে মুখ ভারী। হঠাৎ ভারী মুখ ফেঁসে হাসি ফুটে ওঠে। ঘনবদ্ধ দাঁতের উজ্জ্বলতায় হাসিটা আরও মনোরম লাগে। বনবিহারীর কাছে বউকে একজন রমণী মালুম হয়। নিজেকে বিন্যাস করতে উদ্যোগী তখন মেয়ে ঝুমা বলে, ওই যে সেদিন নারানি-তলার লোকটা ম্যাটাডর চড়ে ঢোল বাজিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছিল—সে রকম ?

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে। আকাশে খানিক রোদের আভা। বাদল ভরা মেঘ সঞ্চিত জলকণা বিলিয়ে রিক্ত। ফলত মেঘ অনেক পাতলা। রোদ্দুর ফেটে বেরয় মস্ত আকাশের ওই পরিসরটুকুতে। সুতরাং খড় ছাউনি দাওয়ার উপর একটু তেজি আলো। সেই আলোতে গোলাপি কাগজ মেলে বনবিহারী দেখে বলে, ঠাকুর্দার বাবা মার মনের কথা শুনবে ?

মেয়েটা মুখ নামিয়ে পড়তে যায়। বনবিহারী সুর করে, ওগো বধূ—

একটা ঘরে মানুষ হয়ে অপর ঘরে যেতে হয়
মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়া পরকে আপন করতে হয়।

মেয়ে ঝুমার পাশে দাঁড়িয়ে অমলা মুচকি হাসে। স্বকর্ণে নিজের নারী-জন্মের এমন রূঢ় সত্যটা শুনতেও কেমন বিড়ম্বনা! তখন বনবিহারী পড়ে,

…মন্দ জনে মন্দ কবে, বাসবে ভালো, ভালো জন।

অমলা গায়ের আঁচল টেনে ঢাকা-ঢুকি দিতে-দিতে বলে, শুধু কি দায় মেয়েদেরই ?

হাত ঝাপটায় অমলাকে ইঙ্গিত করে থামতে। সুখে-দুঃখে এতদিন একসঙ্গে ঘর সংসার করার পরও বনবিহারী অমলাকে একটু ঠোক্কর দেওয়ার প্রলোভন ছাড়তে পারে না। হাতের কাছে ছাপা অক্ষরে সুযোগ! তাই আবার বেছে-বেছে লাইন কটা শুরু করে,

…স্বামী লাগি ভালোবাসা আন তুমি হৃদয় ভরে,
সেবা ভক্তি নিয়ে এসো গুরু জনের তরে।

আর পড়ে শোনায় না বনবিহারী। শুধু তাকায় পাশে। বউ অমলা হলুদ কালোয় ডোরা কাটা বাঘছালের মতো প্রিন্ট সস্তা শাড়ি জড়িয়ে ফরসা চেহারা। ভরাট এবং পরিশ্রমী গড়ন। চিকন নেই। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে স্বামীর মুখ চোখ দেখে। চকিতে দৃষ্টিটা সরিয়ে নজর করে পুকুরপাড়ের কোণে ডালে পাতায় ভারী আমগাছে। কালচে সবুজ পাতা ক'দিনের বর্ষায় তেজি অথচ স্নিগ্ধ। ফলন কমে গেলেও ঝিঙে চারাটা আম গাছে লতিয়ে বেঁচে আছে। জুৎ হচ্ছে না

বুঝে বনবিহারী বলে, চুপ মেরে গেলে ?

—ওটা কারা লিখছে ?

—ঠাকুর্দার বাবা মা।

ঝুমা এতক্ষণ ঠিক ঢুকতে পারছে না। ঠাকুর্দা কথাটায় একটা খেই পেয়ে যায়। তখনই বলে ঝুমা, সেই বুড়োটা যে বড় বোটে করে বিয়ে করতে গেছিল ?

—শুধু বড় বোট ? ঘাটে-ঘাটে বোট থামিয়ে এই কাগজ ছড়িয়ে ছিল ঢোল কাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে। তারপর…গাঙ পারিয়ে পালকি চড়ে বিয়ের বাসর।

—কেন ? মেটাডর পায়নি ?

—ধুস্। তখন গাড়ি কোথায় ? পালকিতে যাচ্ছে। সঙ্গে ঢোল কাঁশি আর একজন লোক বস্তা ভরতি এই কাগজ নিয়েছে। শুধু লোকের হাতে হাতে বিলোচ্ছে। বাপ কাকাদের মুখে কম শুনেছি ঠাকুর্দার গল্প ?

—ধান বেচা জমিদারি পয়সা। দু হাতে ছড়িয়ে ফতুর। সে বংশের নাতিপুতিরা এখন…ভাতের জন্যে মাটি কাটে, লোকের বেড়া বাঁধে, বড় ব্যথায় গোটা-গোটা উচ্চারণে বলে কথাগুলো বউ অমলা।

আহত হয় বনবিহারী। একদা অতীত ঐশ্বর্য সমীহ আদায় করতে পারে না। বরং পীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। কথা ফুরিয়ে গম্ভীর। দমকা বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি ছাট ডিঙিয়ে দাওয়ার ধারি সীমা ভিজিয়ে দেয়। বাচ্চাটা মায়ের কাপড় ছেড়ে নখ দিয়ে দেওয়ালের মাটি খুঁটে-খুঁটে গর্ত করে। আর্দ্র হাওয়ায় দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে। নখে খুঁড়তে মজা।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া মেয়ে ঝুমা বাবার হাতের কাগজটা নিয়ে বলে, দেখি। কাগজটা খুলে চোখ বোলায়। হঠাৎ দেখতে পায় "দাদার বিয়েতে" কথাটার নিচে মোটা করে লাইন টানা। ঝুমা বানান করে, ভ অ ওকার র অ ভোর, ব একার এ বে, লা আ তএ বেলাতে, এমন ভেঙে-ভেঙে সময় নিয়ে পড়ে,

ভোর বেলাতে ফরসা রাতে ভাঙলো যখন ঘুম,
উঠে দেখি ঢোল বাজছে ডিগ ডুমা ডুম…,

ঝুমা মায়ের দিকে পরে বাবার দিকে তাকায়। বাবা কোনো সাড়া করে না। ঝুমার এত যত্নের পাঠটায় মন দেয় না। বাবা খুব ভাঙা মনে বাকি কাগজের একটা-একটা দেখে। আবার গুছিয়ে ভাঁজ করে চামড়ার পুরনো ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। বিয়ের কাগজ বানান করতে কোন পরিশ্রম নেই বরং প্রচুর উৎসাহ। ঝুমা পড়ে,

শাঁখ বাজে, বাজে সানাই কত নরম গরম সুরে
দাদার গায়ে দিচ্ছে হলুদ তাইরে নারে নারে…

অনেক আশা নিয়ে তারিফের লোভে তাকায় ঝুমা বাবা বনবিহারীর দিকে। বনবিহারী পুরনো আমলের হলদে আধখানা কাগজটায় দু-চোখ গেঁথে চিঠির ইংরেজি বর্ণ অক্ষর বুঝতে চেষ্টা করে। কুঁদে-কুঁদে পরিচিত ইংরেজি বর্ণ সমন্বয়ে যে অক্ষর যোজনা তার সঙ্গে মেধা মিশিয়ে ভিন ভাষায় শব্দ ব্যঞ্জনা নিজের কানে মেলায়। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে ইটের দেওয়াল

খোড়ো ছাউনি তলায় নড়বড়ে চেয়ারে উপবিষ্ট মানুষটার কাছ থেকে সঞ্চয় করা কিছু শব্দ বাক্য। নিজের স্মৃতির কোটর থেকে হাতড়ে হাতড়ে মেলায় আর এক একটা অর্থ সাজিয়ে বনবিহারী উত্তেজিত হয়। বিড়-বিড় করে, গভর্নমেণ্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। তারপর একটু-একটু পড়ে। অর্থ উদ্ধার করে, দশ'এর দুই ধারা মতে এস্টেট অ্যাকুইজেশান আইন অনুযায়ী শ্রী নিবারণ নায়েক পিং সুধীর সাং প/বিজয়বাটি নিম্ন তপশিল বর্ণিত জমির স্বত্ব ত্যাগ করবার নির্দেশ দেওয়া হল।

তপশিল ভূমি

মৌজা-দেবপ্রবাস জে-এল নং ৯১ খতিয়ান নং-২১৮ দাগ নং ৩৬১, ৩৬২, ৪৪০, ৪৪১ পরিমাণ, ১.০২ শতক, ০'৬৮ শতক, ২.২০ শতক, ১.৫২ শতক। একদম নিচের দিকে অশোকস্তম্ভ ঘিরে গোল সিল। তলায় লেখা, মহকুমা ভূমি আধিকারিক।

গোল সিলমোহরে অঙ্কিত তিন সিংহের মুখ চোখ একদম অস্পষ্ট। কাগজটা…সরকারি চিঠিটা আরও কমজোরি। ঠাকুর্দার নামটা আগেকার দিনে হ্যাণ্ডেল জলকালিতে লেখা বলে মনে হয় বনবিহারীর। তপশিল ভূমির পরিচয়টা আর একবার নজর করে বনবিহারী। মৌজা খতিয়ান দাগ নম্বরটা পড়তে-পড়তে নম্বর সংশ্লিষ্ট সেই ভূমি খণ্ডটুকু অনুমানে:··খানিক শৈশব যৌবনের অভিজ্ঞতা থেকে বেছে নিতে-নিতে ভাবে বনবিহারী,…আরে সে-জায়গা তো বালিস্থানের কালী…চণ্ডীর গাছতলার থানের বেশ নিকটে। এখন তো শুধু বালি…ভাদ্রে সাঁড়াসাঁড়ি কোটালে নোনা জোয়ার ওঠে। প্রায় চোদ্দ পনের বিঘার মতো জমি। বাঁধ ভেঙে তো নদী গত আজ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছর আগে। তার আবার স্বত্ব ত্যাগ কীসের? সরকারি কাগজটা সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। চাপ পড়ে মাঝখানটা খসে দু-ভাগ হয়ে যায়।

আকাশে গুড়-গুড়-গুম-গুম শব্দ। একই বাস্তুর ওপাশে ভাইয়ের খড় গাদির উপর একটা কাক গা-ময় ভিজে। গাদির একপাশে বৃষ্টির ছাট থেকে আড়াল খোঁজে। বাচ্চারা বৃষ্টি বন্দী হয়ে ছোট্ট দাওয়ায় হই-চই করে মুক্তি সন্ধানী। দেওয়ালে নখ গেঁথে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে বাচ্চাটা ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। খেয়াল করেনি অমলা। বরং তার দু-চোখ ভরে দখল করে আছে বনবিহারীর কাগজপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি। তার আহত ব্যক্তিত্ব। মুষড়ে পড়া পুরুষ। অমলা দেখতে পায়, মানুষটা ডান হাতে সরকারি কাগজ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে। তাকিয়ে থাকলেও তেমন কিছু যত্ন করে দেখছে না। চোখ মেলে থাকতে হয় বলেই দু-চোখ খোলা। নজরে কোন বস্তু দৃশ্য হয়ে গেঁথে নেই। লোকটা থির হয়ে ভাবে। তার মস্তিষ্ক জুড়ে দশ'য়ের দুই ধারা মতে দখলি নোটিশ…নোটিশ গ্রথিত দাগ খতিয়ান জ্ঞাপক ভূমি খণ্ডটুকু…এই চাষবাস বাস্তুভূমি সড়ক নালা নদী জঙ্গল নিয়ে রাষ্ট্রীয় মেদমাংসের সামান্য টুকরো কণাটুকু…! ঘরের ভিতর ছোট্ট চুবড়ি। খান কয়েক আলু, বাঁকা বেগুন দু-খানা, শুকনো বিবর্ণ ঝিঙে। বাচ্চাটা দুহাতে ঝিঙে দুটো ঝুলিয়ে এনে

অমলাকে বলে, মা—মা—মা চল্—

অমলার সম্বিত ফেরে। বাচ্চাকে দেখে বলে, কোথায় ?

—চল্। হাঁড়িতে দিবি—

গুম-গুম শব্দে আকাশ গোঙায়। ঘর বারান্দায় সেই আওয়াজ মৃদু। বাইরে ঝিমঝিমি বৃষ্টি। সমুদ্রে আকাশ ঠাঁই নিয়ে ক্লান্তি কাটায়। গোটা চরাচর ঝাপসা। হঠাৎ ভয়ঙ্কর চিক্কির মেরে মস্ত আঁকাবাঁকা জ্বলন্ত তরোয়াল আকাশ ফালা ফালা করে বনবিহারীর খোড়ো আবাস ডিঙিয়ে পুকুর পাড়ের আমগাছটা চমকিয়ে দেয়। সবুজ পাতায় পাতায় বৃষ্টি…বৃষ্টিতে সে আগুন ঝলসে যায়। ঝিঙে লতাটা কেঁপে ওঠে। ভীষণ গর্জন বাস্তু মাঠ-ঘাট দুলিয়ে। বাচ্চাটা আতঙ্কে মাকে জড়িয়ে পার পায়। বনবিহারীর হাতে পুরনো সরকারি কাগজ খসে যায়। নজর আমগাছটার শরীরে। ঝিঙে চারাটি তখন দৃশ্য বস্তু।

আওয়াজটা যেহেতু ঘর-বাস্তুর এত কাছে, মানুষের পুকুরঘাট গোয়াল গাদার কাছাকাছি…বিষণ্ণতা কাটাতে গৃহস্থ বধূ চেঁচায়, হই—শাঁখটা নি-আয় তো।

বেজে ওঠে শাঁখের বাদ্যি। কয়েক মুহূর্ত আগে এমন আকাশ ফাটানো ভয়ঙ্কর আওয়াজ…ঘর গোয়াল চমকানো তীব্র আলো…মানুষগুলো হাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিপন্ন। সুতরাং প্রথম গৃহস্থ বধূর শঙ্খধ্বনি তাদের বিব্রত চেতনায় ঘা দেয়। আরও আশ্রয় খোঁজে। মানুষকে জানাতে চায়, কাছেই বিপদ। এইটুকুই সব নয়। মানুষ মানুষকে পেতে চায়। ক্রমে আর একটা বাড়ি থেকে শঙ্খধ্বনি ওঠে।

অমলা ঠাকুরঘর থেকে শাঁখটা এনে ডান হাতের চেটো দিয়ে শাঁখের মুখটা থাবড়ায়। শব্দ ওঠে ঢপ্-ঢপ্। ঝিনিক-ঝিনিক বাজে হাতের চুড়ি নোয়া। গোল মুখে ফরসা গাল ফুলে ওঠে। ফুঁ দেয় শঙ্খ মুখে। ধ্বনি জাগে, বসবাসের ডেরা ডিঙিয়ে বাস্তু উঠোন চিরে প্রতিবেশীর বাস্তু উঠানে সে ধ্বনি পৌঁছয়।

সিমেন্ট বাঁধানো বটতলার পাশে হিউম পাইপ বসিয়ে বড় নালা বানিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েত। এলাকার গড়ানো জল কলকল শব্দে বেয়ে যাচ্ছে গাঙ বাঁধের দিকে। নালা বাঁধিয়ে পঞ্চায়েতের বিছনো ইটে হাঁটে ক'ঘর বসবাসী মুসলমান। মাটির দেওয়ালের উপর টালি সাজিয়ে ছাউনি। ছাউনিটাই মসজিদ। মসজিদের মাঠে বৃষ্টি। বৃষ্টি পুড়িয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি টালি ছাউনি কাঁচা মসজিদে।

ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে চোয়াল চোপরা বসা বুড়ো আব্দুর রহমান। তার দু-কানে বজ্রপাতের আওয়াজ কয়েক মুহূর্তে শ্রবণবন্ধা করে দিয়েছে। কাঁচা মসজিদের মটকা লক্ষ করে তাকায়। পাকা ঝুল-ঝুলে দাড়িতে দু-এক কণা বৃষ্টির ছাট। ডান হাতে দাড়ি মুচড়ে মনে মনে বলে, খোদা রক্ষা কর এ কেয়ামত থেকে…। তখন নিকটের হিন্দু গৃহস্থ বউ শাঁখ বাজায় নাভি কুণ্ডলি কুঁচকে। যতদূর পৌঁছে দিতে পারে শঙ্খের বাদ্য তারই আকুল চেষ্টা।

কপাল চওড়া হয়ে মাথার চুল ফাঁকা। দু-চোখে মোটা কাঁচের গোল চশমা। গলায় বাঁধা তুলসির মালা। বুড়ো ভীম প্রামাণিক আকাশের দিকে তাকিয়ে

বলে, হরি শ্রীহরি…ছেলে পুলে গরু বাছুর নিয়ে বাঁচতে দাও গো দয়াময়…

নিজের দাওয়ায় বনবিহারী। হাতে দশয়ের দুই ধারামতে দখলি নোটিশ। পাশে দাঁড়িয়ে বউ অমলা শাঁখ বাজায়। বাচ্চারা ঝলসানো আমগাছটা দেখে। পোড়া দেহ বৃষ্টি ধুয়ে দেয়। শঙ্খধ্বনি হতে থাকে। এক গৃহস্থ বাড়ি থেকে আর এক গৃহস্থ বাড়ি। তারই লগ্নতায় আর একটা গৃহস্থ বাজায় শঙ্খ। ক্রমে-ক্রমে ধ্বনি শিকল হয়ে বেঁধে ফেলে জনবসতটাকে। ধীরে ধীরে গিরিদের শিবদেউল, মসজিদ চালা। শঙ্খধ্বনি আর বৃষ্টির বাজনায় আবদ্ধ হয়ে নোনা মাটির উপর খড় টালি পাকা ইটের ঘরদোরে সংসারগুলো গাছপালার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ঝড় ঝঞ্ঝায় আহত, বিধ্বস্ত গাছপালা!

সরু ফালি দাওয়ায় বনবিহারী। তার হাতে জীর্ণ দখলি নোটিশটা। ডান হাতের পাঁচ আঙুলে কাগজটা আঁকড়ে রাখার সতর্কতা, মমতা!

(২)

দু-ফুট বাই দু-ফুট চার কোণা উঁচু তুলসি মঞ্চের গাঁথনি বেয়ে বৃষ্টি গড়াচ্ছে। মঞ্চের মধ্যভাগে ফাঁপা রেখে মাটি ভরতি। মঞ্চে পোঁতা তুলসি চারাটা জল পেয়ে ডগমগিয়ে দোলে। মিন্টু দাসের বুড়িমা দাওয়ায় বসে সাদা প্লাস্টারের উপরে কিঞ্চিৎ কার্নিশ ঝুলনো অংশে হলুদ রঙের বর্ডারটা দেখে। স্বামী কৃষ্ণদাসের স্মৃতি মঞ্চ। মঞ্চের গায়ের পলেস্তারা খোঁদল করে "ওঁ" লেখাটা একদম ভেজে না। হলুদ রঙটা রসকলির মতো জ্বল-জ্বল করে।

টানা বারান্দায় লম্বা ঘর। কৃষ্ণদাসের আমলে তৈরি কাঠামোয় টালি ছাউনি। পাশেই কেনা জায়গায় মাটি ফেলে ভরাট। ইট বালি গুছিয়ে রাখা। বড় করে পাকা বাড়ি গাঁথবার আয়োজন মিন্টু দাসের।

টানা বারান্দার মাঝখানে মুলি বাঁশের চাঁচাড়ি লাগিয়ে পার্টিশান। ওপাশে বড় ছেলের সংসার। এই পার্টিশানই তো কৃষ্ণদাসকে ওপার বাঙলা থেকে এপার বাঙলায় টেনে আনল! আছড়ে ফেলল অক্ষয়নগরের এই পল্লীতে। চট্টগ্রামের সেই বাঁশখালি, কুতুবদিয়া দ্বীপ মহিষখালি কক্সবাজার যে এখন কোথায়! মেঘনার জলধারা…ব্রহ্মপুত্রের সেই স্রোত…! মাছ মিলত…ডিঙি বাইতো জোয়ান শ্বশুর-কুল…, ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়ায় বুড়ি মা।

কলিকাতা টু নামখানা পিচ ঢালাই সড়ক। বাসন্তী ময়দানের পাশ দিয়ে ডিলাক্স বাস ধীর গতিতে সড়ক উজোয়, বৃষ্টির ধারায় খোয়ার গোড়া আলগা। টায়ারের চাপে দু-একটা পাথর ভাঙা খোয়া ঠিকরয়। চাকার চাপে ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁস শব্দ তোলে। জমা জল ছিটকয়। সার্ভিস-বাসকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় স্টেট বাস। অল্প প্যাসেঞ্জারে প্রায় ফাঁকা।

বাসন্তী ময়দান ডাইনে রেখে এক ছাতায় দুই বুড়ো। চিড়বিড় শব্দে বৃষ্টি পড়ে ছাতার কাপড়ে। হাওয়ার ছাট। মানুষ দুটো গায়ে-গায়ে জুড়ে যায়। দমকা হাওয়ায় গায়ে পিঠে প্রহার লাগে। তখন ঠাণ্ডা কাটাতে কথা জোড়ে,

বড্ড জাড় লাগস্যে গো ধীরু বাবু—

—বুড়া হইসো তো ?

—আর তুমি ? ঝুবক ?

কাঁচা পাকা দাড়ি। কপালময় ভাঁজ। কনুই থেকে হাতের চামড়ায় কুঞ্চন। কবজির কাছে দড়ি-দড়ি শিরা যুগল দাসের। এক ছাতায় কুলোয় না। শিক বেয়ে টপটপ জল পড়ে পিঠের গেঞ্জিতে। ঠাণ্ডা লাগলেও বলতে পারে না। গায়ের চামড়ায় শীতলতা···বয়েসের ভারে রক্তের সে তাপ আর তেমন নেই। তবুও কথার মধ্যে ভুলে থাকতে নতুন কথা হাতড়ায়। কী দিয়ে শুরু করা যায় !

ইট বিছানো রাস্তাটার মাঝে-মাঝে খানা খন্দ। জল জমেছে। গাছের ডালপালা ঝুঁকে আছে রাস্তায়। হঠাৎ হাওয়ায় পাতা টপে জল ছাতার ভিতরেও। হাত দিয়ে গেঞ্জির শুকনো অংশ ঝেড়ে যুগল দাস বলে, শুনছি তো···মিণ্টু বালিস্থানে গত সিজিনে এগার লক্ষ টাকা লাভ করিসে।

—তাই···! অবাক হয় ধীরু দাস।

—তবু যদি একটা টাহা মজুরি বাড়াই তো···। বলতে-বলতে চুপ যুগল।

বাঁয়ে টিন চাপিয়ে বড়-বড় কামরায় চার চালা ঘর। ছোট্ট পুকুর। বাঁশ বাঁখারি বেঁধে বেড়া। বেড়ার গায়ে মোটা নাইলন সুতোর বাতিল জাল দিয়ে ঘেরা। ছোট-ছোট ছাগল ছানাও ঢুকতে পারে না বাগানে। ভেতরে ঢেড়স বেগুন চারা। আর একটু এগোতেই ডাইনে গ্রিল ঘেরা সুন্দর বাড়ি নিমাই দাসের। বারান্দায় নতুন জালের ডাঁই। পাতলা পলি পেপার চাপিয়ে বৃষ্টির অযথা ছাট থেকে ঢাকা। বাড়িটার ছাদে অ্যাণ্টেনায় একটা ভিজে শালিখ পথ হারিয়ে বাসা খোঁজে। পাশের নারকেল গাছটা হাওয়ায় দোলে। অ্যাণ্টেনার গায়ে নারকেল পাতার ডগ পাখিটার ডানায় মৃদু লাগতেই উড়ে ঠাঁই বদলায়। বন তুলসির ঝাড় বাঁখারি জাপটে হরিশ্চন্দ্র দাসের বাস্তুর বেড়া। পথ চলতে-চলতে যুগল দাস থমকে দাঁড়ায়। হরিশ্চন্দ্রের পুকুরে নতুন শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটের কাছে সিমেণ্টের ছাতা। প্রতি ভাঁজে চোখে ধরার মতো রঙ। একটু দাঁড়িয়ে শ্বাস ফেলে, পর-পর দুবছর লছ খেয়ে গত বার বর্ষায় তিন ট্রলার ইলিশে একেবারে লালে লাল। দেনা মিটিয়ে চার পাঁচ লাখ টাকা লাভ ! মা গঙ্গা দুই মুণ্টি ভরে দিছে···।

গুম-গুম করে মেঘ ডাকে। ইট রাস্তা ঘেঁষে দোকানটা সরু ফালি। যেহেতু ঝির-ঝিরে বৃষ্টি, দোকানে টিনের ঝাঁপতলায় মাটির উনুনটা নিভে আছে। বিস্কুট মুড়ি সিগারেট ভিতরে। দু-চার জন ছেলে-ছোকরা বেঞ্চ দখল করে বসে।

দোকানের পাশ কাটিয়ে মেটে রাস্তায় পাঁক কাদা। যুগল আর ধীরুবাবু এক ছাতায় বিব্রত। যুগলের ডান পা কাদায় গুঁতে যায় তো ধীরুবাবুর বাঁ-পা গেঁথে থাকে। ছাতা হাতে একজন এগিয়ে যায়, আর এক মানুষ পড়ে থাকে পিছনে।

মূল বসত ঘর থেকে খানিক ছাড় দিয়ে হোগলা তেরপলিন চাপিয়ে ঘন আড়কাঠে দোচালা ঘর। আড়কাঠের উপর বিছনো বড়-বড় পাউয়ে ফাঁপা মোটা-মোটা বাঁশ। বেঁউতি জাল খাটানোর ফাং বাঁশ। লোহার ফাঁপা নল চার ছ'ফুটের দৈর্ঘ্যে, সেগুলো সাজানো। পলিথিনের গোলাকার চাকতি বস্তা বোঝাই করে গোছানো। জালের সাইড দড়িতে বেঁধে জলে ভাসিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় উপকরণ।

লাল রঙের টেপ'য়ে ক্যাসেট চালিয়ে বোতামে চাপ দেয় ছোকরা জলধর। ফরসা মুখে একেবারে জুলফি অব্দি কামানো গাল। মাটির মেঝেয় ইটের পাশে ইট বিছিয়ে ঢকপকে। একখানা দামি সিঙ্গল খাট। ছত্রি থেকে মশারি ঝুলে। আড়কাঠের বাঁশে একশ পাওয়ার বাল্বটা জ্বলে। হিসেব-নিকেশ খাতা-পত্তর রক্ষা করার ম্যানেজার বা মাস্টার জলধর। শুয়ে-শুয়ে বেলা কাটায়।

দোচালার এক পার্টিশান কামরায় জলধর, মধ্যিখানের পার্টিশানে এক গাদা ছাঁদি বেঁউতি জাল, তারপরের পার্টিশান কামরায় মমতা দাস দুটো আট ন'-বছুরে মেয়ে নিয়ে দিন কাটায়, রাত কাটায়। বড় মেয়ে রুমা বই খুলে অ আ পড়ে, ছোট মেয়ে সুমা শ্লেটে আঁক কষে। খোলা দরজায় হাওয়া ঢুকে রাধাকৃষ্ণর ক্যালেণ্ডার দোলায়। মুলি বাঁশের চাঁচড়ি দেওয়ালে লটপট শব্দ হয়।

মমতা দাস দোরগোড়ায় বসে। বাবা কৃষ্ণদাসের তুলসি মঞ্চের দিকে মুখ। মঞ্চটা মুখোমুখি থাকলেও নজর তুলসি মঞ্চ ডিঙিয়ে আরও দূরে। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির কণা কপালে। চুলের গোড়ায়। কপালে সিঁদুর নেই পাঁচ ছ'বছর। হাতে শাঁখা নেই, সিঁথি ফাঁকা, শুধু রঙিন ছাপা শাড়িতে নিজেকে জড়িয়ে ঢেকে রাখে। দমকা বাতাসে সামনের ডাব গাছ আম জামের মগ ডাল ঘুলিয়ে বন্ধ ঝড় তোলে। ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সমুদ্রস্রোতে হঠাৎ পাক মেরে জলোচ্ছ্বাসের মতো! চমকে ওঠে মমতা! বুকের গোপন কন্দরে তরাস। গাঙ সমুদ্র থেকে অনেকটা দূরে…তবুও বুক কাঁপে। মমতা এখানে বসে ফিরে যায় কত বছর পার হওয়া অতীতে। ভাই, দাদা, পিসতুতো দাদাদের মুখের কথায়-কথায় জুড়ে গেঁথে নিজের সামনে দৃশ্যটা গুছিয়ে তোলে। গুছিয়ে তুলতে ব্যথা। তবুও একদা অস্তিত্ব জেগে ওঠে বুকের কোষে…চোখের মণিরেখায়।… লম্বাটে কালো মানুষটা। ঠোঁট জোড়ার মধ্য পাড়ে আচমকা লালাভ মাংসল পিণ্ড। কোঁচকানো চুলে সরু নাক। রেগে কথা বললেই, কপালের জমিতে শিরা ফুলে-ফুলে উঠত। বস্তু জল চিনত, বলত, এইখানে জাল ফেলাও গো মাঝি—

চাল ডাল আনাজ খরচ বাদ দিয়ে মোট সংগৃহীত ইলিশ মাছের বিক্রি থেকে আরও পাঁচ ভাগ। ট্রলার পরিচালক মাঝির অংশ বাদে, ভাগে যা থাকে তার ষাট ভাগ মালিকানা অংশ বাকিটা তো ট্রলার ডিঙি মেছুড়ে লেবারদের। ট্রলার মাঝি ভরসা পেয়ে বলত, তাই। জামাই যখন কইসে, নোঙর দাও, জোয়ার যায়। সমুদ্র ফুলে ওঠে। ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলিশ মিঠেন জলের টান খেতে মোহনামুখী। এমন আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণের গাঙ…গাঙ তো নয়, গাঙ স্রোত হারিয়ে সাগরে একাকার। বিস্তারিত জলভাগে শুধু ঢেউ। আকাশ ডেকে দুম করে ঘন কালো।

ভয়ঙ্কর জল কলরোল। ডিঙি উথাল পাথাল। জাল বিছিয়ে জল।

মাঝি বলেছিল, জামাই…এইবার…

কোঁকড়ানো চুলে বড়-বড় ফোঁটার বৃষ্টি। গায়ে পিঠে ঢিল পাথরের মতো আঘাত। জামাই নিশানাথ বলে, ভয় নাই। শিগ্‌গির জাল তুইলা ফেলাও।

ইলিশের ঝাঁক জালের ফাঁসে। হুড়োহুড়িতে টানে সকলে। বে-খেয়ালে নিশানাথ পা ফসকে জলে। অসীম নোনা জলে। অসংখ্য উন্মত্ত ঢেউ। শুধু ফণা তুলে গর্জমান ঢেউ। তলিয়ে যায় সমস্ত তাগদ। কৌশল ভেঙেচুরে জলতলে নিশানাথ দাস।

…সেই গাঙ মোহনা এখান থেকে কত দূর…। সেই সন তারিখ নেই। সন তারিখের অনন্ত প্রবাহ যে মহাবিশ্বে, সেই মহাবিশ্বের ছত্রছায়ায় অতীত সংলগ্নতায় চলিষ্ণু বর্তমান। প্রায় সেই বর্ষণ, ঘন মেঘ, হাওয়ার দমক… অনুষঙ্গক্রমে নিশানাথ! আজ চোখের সামনে…গায়ের পাশে…মাঝে মধ্যে একলা বিছানায় মমতা বুকে বালিশ জাপটে খোঁজে নিজ পুরুষের হৃত ওম! শূন্য মনে বাসনা স্রোত হয়ে ভরাট চায়, আর কেউ…কাউকে পামু না…! দাদারা কেউ তো একলা নই গো…! বউদিদিদের বুকে যান মন নাই…!

হাঁটু অব্দি পাঁক মাড়িয়ে এক ছাতায় বুড়ো ধীরুবাবু পাশে যুগল দাস। বাখারি আর নারকেল ডাগলার বেড়া দিয়ে বাস্তুর চারপাশ ঘেরা। প্রবেশ পথটা বাখারি পেরেকে কাঠ বেড়া। বেড়া ঠেলে হাঁক দেয় যুগল দাস, মিন্টুবাবু— আছেন নাকি গো? এমন বর্ষায় আচমকা পুরুষ মানুষ নিজের কামরার দরজা গোড়ায়। ফলে দ্রুত হাঁটু চাপা দেয়, আঁচল টেনে গা বুক ঢাকে। উঠোনময় জল। চারদিকের ধারানি ঘোলাটে জল বন্ধ হয়ে থৈ-থৈ। যুগল দাস পাশে তাকিয়ে বলে, মমতা বুঝি?

—হুঁ গো পিসামহায়।

—মিন্টু আছে? নাই— ?

—মেঝদা? হয়। বারিতে যাহেন—।

দুই মানুষে উঠোনে পা ফেলে-ফেলে হাঁটে। পায়ের চাপে জমা জল উপচয়। মৃদু ধাক্কায় জল চলকায়। কুঁচো-কুঁচো ঢেউ ওঠে। জল থৈ-থৈ উঠোনে নিচু দাওয়ার কানা টিপ-টিপ জেগে থাকে। যতই মিন্টুর গৃহের নিকটবর্তী হয়, ঢেউ ভাঙে। উঠোনের জল সমুদ্র হয়ে যায়। জীবিকার সমুদ্র।

(৩)

রোদ ঝলমল করে ইরিগেশন বাংলোর জানালায়। হাওয়ায় কাঁপে রোগা লম্বাটে নারকেল গাছটার চেরা পাতা।

বাঁধ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে সীতাকান্ত বেরা থমকে যায়। ক'দিনের বর্ষায় বাঁধের গায়ে ইট সিমেন্টের ব্লক পিচিং ধোয়াধুয়ি হয়ে একদম পরিষ্কার। পাশেই সমুদ্রের নোনাজল টেনে আনা গাঙ। আগল ছেঁড়া বাতাসে উন্মত্ত নোনা ঢেউ

আছড়ে খামছে দিয়েছে বাঁধের গাঙ ধার বরাবর ইটের গা-পিঠ। তীব্র নোনায় খরখরে ইটের গা পিঠে সকালের রোদ পড়ে রক্ত ঝুঁঝোনো লালচে। বাঁধটাকে দেখতে-দেখতে সীতাকান্ত চমকে ওঠে! বিরাট ধস নিয়ে বাঁধানো ইট খসে গেছে। বড়সড় গর্ত। ইট ফসকে বাঁধের নোনা মাটির মাংস। সীতাকান্ত মাস্টার তখনই সঙ্গী ভূপতি জানাকে কাছে ডাকে, দ্যাখবে আইসো—

—কী গা মাস্টারবাবু? জানতে চায় ভূপতি।

—যা কই আমি তোমানকে সব সময়…

ভূপতির পায়ে বর্ষার জুতো। বগলে স্টিল ডাঁপের ছাতা। সুতরাং ছাতা জাপটে মুখ ঝুঁকিয়ে বাঁধের গায়ে ফাটলটা দেখে। চোখে মুখে বিপদের আতঙ্ক আবার বাঁধের ক্ষতস্থানটা বুঝবার বাসনা। বাঁধের গোড়া বেয়ে নোনা বালি কাদার চর। গাঙ বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের শব্দ। ঢেউয়ের ফণা।

সব দেখে বুঝে পিছনে ফেরে। গাঙের ওপারে জঙ্গল…জঙ্গলের দেহ ঘিরে আবার সমুদ্রের নোনা জল। জলের উপর মেঘলা ভাঙা রোদ। বিস্তারিত জলরাশিতে সূর্য ঝলকায়। সীতাকান্তবাবু তাকিয়ে নোনা জলরাশির দিকে।

ভূপতি বলে, সীতাবাবু—

—কও গো ভূপতি।

উত্তর দেবার আগে মনে ভাসে বিঘে পনের পরিমাণ মাছের ভেড়িটা! নোনা জল তুলে বাগদা ভেটকির চাষ। সেটা তো একদম বাঁধের গা লাগোয়া। বড় হিউম পাইপের গলা দিয়ে চৈত্রের কোটালে ভেটকি বাগদার মীন তোলা। মাঝ মাঠে একলপ্তে বিঘে দশেকের ধান জমি। এই ইট বাঁধানো বাউন্ডারি বাঁধটাই তো গোটা গ্রাম, মৌজা, পাঁচ সাত হাজার মানুষের বসবাস পুকুরঘাট ঘরদোর আগলে রেখেছে! আগলে রেখেছে ভূপতির বাস্তু সংসার বিষয় সম্পত্তি। তাই বিপন্ন গলায় বলে, এমন ফাটল ফাটলে আমরা কত দিন এই দ্বীপে বাঁচব!

—সে ভাবনা তো আমারও গো ভূপতি। বলতে-বলতে হাঁটে সীতাবাবু।

চলতি বাঁধটাকে গ্রামের ভিতর ঢুকিয়ে একদম ইংরেজি 'ইউ' শেপড। মধ্যিখানের পরিসরে গাঙের জল রাখার রিজারভার। তারপর ইট বাঁধানো মোটা-মোটা দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে বড়-বড় লোহার পাল্লায় দরজা। দরজা চারখানার গায়ে নোনা জলের কষ। বাঁধানো সিমেন্টের উপরে হুইল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে পাল্লা খোলার লক সিস্টেম। লোহার পাল্লায় এখনও সাঁ-সাঁ জলস্রোত। জল পাক খেয়ে লক্ষ বিন্দুতে পাল্লার ফাঁক গলে ঝির-ঝির শব্দ। জলবিন্দুর মাথায় কুঁচো-কুঁচো সাদাটে ফেনা অসংখ্য। রোদ্দুরের গুঁড়ো ধারণ করে ভাসমান মণিমুক্তো।

লক গেটের ব্যবস্থাটুকুর জন্যে বাঁধটা যেহেতু "ইউ" আকার, সীতাকান্ত মাস্টার আর ভূপতি দু-জন পাশাপাশি হাঁটে। বহুকালের পুরনো বাংলো গত শীতে কলি টেনে দরজা জানালায় রঙ কষে মনোরম। হাঁটতে-হাঁটতে আবার দু-জনের ডান দিকে পড়ে বাংলোটা। সীতাকান্ত হঠাৎ বলে, এত রঙ যখন কোনো বড় ইঞ্জিনিয়ার অফিসার আসবে মনে হয়?

ভূপতি ধমকায়, দুস মাস্টার। এই বর্ষাকালে সাহেব অফিসার আসতিছে? এত দরদ এই গাঙ পাড়ের মানুষের জন্যে! সমুদ্দুর কেমন লাফাইতেছে দ্যাখছ? বাবুদের শরীরের দাম নাই— ?

কথা চালাতে-চালাতে এগোয় দু-জন।

সীতাকান্তবাবু বলে, তা হইলে এত আয়োজন?

—আসছিল তো কটা বাবু। সকালবেলায় বুড়ি-বুড়ি বউরা খুকিদের মতো ফ্রক জামা পরে হাওয়া খাইতেছিল। বাচ্চারা কী লাফাই ঝাপাই যে করছিল না…

—ধুস্! তখন তো গাঙ বাঁধ ফাটেনি ধসেনি। অখন আইলে অফিসারদের চোখে দেখাইতুম ফাটলগুলা। কবে আইল, একবার খবর দিতে পারিতে ভূপতি? কাজ হইত তো…

সীতাকান্ত মাস্টারের অনুযোগে যুক্তি আছে। বেশ মুখ বুকওয়ালা লোক সীতাকান্ত। জজ ম্যাজিস্ট্রেট দারোগা এস-পি-কে বুঝিয়ে মন জয় করতে পারে। খড় টালি ছাউনির বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সীতাকান্ত। তখন তো ভূপতি একদম ছোকরা। সেদিন ডেকে ডুকে নিয়ে বলেছিল সীতাবাবু, ভূপতি শ'দুয়েক বাচ্চা-কাচ্চা বুড়োবুড়ি বউ ঝি লিয়ে চলু নতুন পাকা রাস্তায়।

অবাক হয়ে ভূপতি জানতে চেয়েছিল, কেনি গো মাস্টারদা?

—আরে চলু না। আজ সকলে গাড়ির তলায় চাপা হইব—

কথার ধাঁধায় ঘুলিয়ে গেছিল ভূপতি। চোখের সামনে কাজের লোককে দেখতে পেয়ে সীতাকান্ত হুকুম করে, ও লগেন—

—আজ্ঞে বাউয়ু,

—একটা সরু বাঁশের ডগালি কাটত অক্ষুনি।

পাশে তাকিয়ে সীতাবাবু দেখে, ভূপতি তখনও কাদার তাল হয়ে অনড়। গর্জে ওঠে সীতাকান্তবাবু, আরে যাবি তো—বেলা হইছে। তা না হইলে যে সব ফেলিয়্যর। পুরানা ইস্কুলের বুড়া হেডমাস্টারটা ঠিক কায়দা করতে পারছে নি।

ভূপতি ধরতে না পারলেও বুঝতে পারে একটা কাজ…কাজ উদ্ধার করবে সীতাকান্তবাবু। দাবড়ানি খেয়ে ভূপতি এঘর ওঘর যায় আর বলে, তোমরা কাপড়-চোপড় পরি অক্ষুনি বারাও।

—কেনি গো বাউয়ু?

—সীতাকান্তবাবু দল লিয়া নতুন পাকা রাস্তায় যাইবে—

দেশ গাঁয়ের জনে-জনে জানতে চেয়েছিল, তারপর?

ছোকরা ভূপতি তখন নিজেই খানিক জুড়ে গেঁথে বাক্য বানিয়েছিল, বোধহয় এই দেশের একটা কাজ…দশজনের উপকারে যেটা লাগিবে সেটা কাজ বাগাইবে সীতাবাবু। দেশের মানুষের জন্য কাজ তাই দেশের মানুষকে সঙ্গে লিতে হইবে নি?

—হুঁ। ঠিক, বলেছিল বিশ ত্রিশজন মানুষ একসঙ্গে।

জলাবাদা ধানি জমিতে মাটি ফেলে-ফেলে রাস্তা। ইট বিছিয়ে স্টোন চিপস্ পেতে ক'মাস ধরে আট টন ভারী বড় বড় লোহার চাকায় রোলার গুটি-গুটি বেয়ে গেছে নির্মীয়মান সড়কে। একেবারে নামখানার গাঙ পাড় থেকে বকখালি। সদ্য নতুন রাস্তার উদ্বোধন করতে অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পুলিশ এস-পি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হাজির।

সরু বাঁশ ডগালিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা। পতাকা ধরে আগে আগে ভূপতি। পাশে কাগজ দরখাস্ত নিয়ে পুরনো জুনিয়র হাই ইস্কুলের বৃদ্ধ হেড-মাস্টার মশাই। জবা কলকে ফুলের সঙ্গে গাঁদা ফুল গেঁথে-গেঁথে মালা। মালাটা নিয়ে সীতাকান্ত বেরা। রোগা, চোয়াল উঁচু কুতকুতে চোখে মানুষটা। বুক পকেটে ফাউন্টেন পেন। পকেটের গর্তে ছোট্ট গোলাকার পকেট ঘড়ি। কালো কার দিয়ে বোতাম ঘরে বাঁধা। রীতিমত লেখাপড়া জানা একজন গ্রামবাসী। সঙ্গে দেড় দুশ মানুষ।

ডিঙি গাদা বোটে পার করে আনা জিপ মোটর কার পাইলট ভ্যান। ভোঁ বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি এগোয়। নতুন পাকা রাস্তার বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় ভূপতি। পাশে সীতাবাবু, ডান দিকে কাগজ দরখাস্ত হাতে বৃদ্ধ হেডমাস্টার মশাই।

এপার-ওপার জুড়ে মানুষজন।

মালা হাতে সীতাকান্ত সাহস দেয়, ভূপতি পুলিশের গাড়ি যতই গায়ে পড়ুক একদম পালাইবি নি—

দূর থেকে এগিয়ে আসা পুলিশের জিপ তার পিছনে মোটরকার ট্যাক্সি।

দেখতে-দেখতে কম্পিত গলায় ভূপতি বলে, হুঁ।

সীতাকান্ত বলে, এউ সো জায়গা কমনিস্টরা তে-ভাগা লিয়া সন্ত্রাস করছিল। গজেন মালি বিজয় মণ্ডলরা গুলি বন্দুক চালাইতো। তাদের সাহস থাকতে পারে, আর আমাদের নাই?

ভূপতি একবার সীতাকান্তকে দেখে। আশ্বস্ত করতে পাশের বৃদ্ধ হেড-মাস্টারকে বলে, মাস্টারমশাই একদম নড়াচড়া করবেননি কিন্তু—

—না হয় ছাত্রছাত্রীদের জন্যে দেশবাসীর জন্যে এই মাটিতে মরলাম একবার, বলে ঘাড় ঘুরিয়ে আশপাশের মানুষজনকে দেখেন হেডমাস্টার মশাই। বুকে বল পায়। মানুষের বলেই তো মানুষ বল সংগ্রহ করে, এই চরম অনুভবটুকু উপলব্ধিতে আসে বৃদ্ধ হেডমাস্টারের।

ভূপতির হাতে বাঁশ ডগালিতে পতাকাটা অবাধ হাওয়ায় পতপত ওড়ে। চাষি মজুরদের ফসল ভাগের আন্দোলন দমিত। নেতা কর্মীরা জেলে তালা বন্দী। ফলত মাঠ ঘাট দেশ গা ফাঁকা। আরও অবাধ হাওয়া বাতাস। পতাকা পত পত ওড়ে।

পুলিশের ভোঁ বাজানো জিপ স্বাধীন ভারতের পতাকা, মানুষজনের জটলা দেখে থমকে যায়। পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি, আরও গাড়ি। মালা হাতে সীতাকান্ত এগিয়ে যায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবু—প্রফুল্ল সেন মশায়কে

এই দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাইতে চাই—

তখন গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন গোল গাল ফরসা মুখে চশমা আঁটা সুবেশা নারী এম-এল-এ। ফিক করে একবার হেসে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, সীতাবাবু ক্ষেপেছে।

—ডাকো ওকে।

খবর কানে যাওয়া মাত্র সীতাকান্তবাবু মাটির উপর শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে বলে, আমাদের বন জঙ্গলের দেশ আপনার চরণ স্পর্শে ধন্য হইল।

মুখ্যমন্ত্রীর ফরসা মুখ, চশমা ভেদ করে তীক্ষ্ন চোখ, প্রশ্রয়ের হাসি ঢেলে বলেন, আমাদের কাজে যেতে দাও।

—হ। নিশ্চয় যাইবেন, বলে মালাটা এগিয়ে ধরে।

মুখ্যমন্ত্রী দু-হাতে নিয়ে বলেন, কেমন আছ? দেশের গাঁয়ের খবর ভালো?

—আজ্ঞে না।

—কেন? কি হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রীর ফরসা মুখে উদ্বিগ্নতা।

সীতাবাবু ফট করে ডাক দেয়, মাস্টারমশাই।

বৃদ্ধ হেডমাস্টার দু-হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলেন, সুপ্রভাত। রাজদর্শন হলো।

মুখ্যমন্ত্রী আসল কথা জানতে না পেরে বিরক্ত। সীতাবাবু বলে, আমাদের এইখানকার জুনিয়ার হাই ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। চার বছর হইল ইনসপেক্‌শনের পরও হাই ইস্কুলের স্যাংশন পাইছে নি—দেশের লোক আপনার কাছে আইছে নিবেদন লিয়া—

মুখ্যমন্ত্রী সব শুনে বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ঠিক-ঠিক আছে তো?

—আজ্ঞে সার। সব ঠিক আছে! এলাকায় তো আর হাই ইস্কুল নাই—। লিখাপড়া হইবে নি তা হইলে ছেলে মেয়েদের। সব গরিব দুঃখি কৃষক মজুরের সন্তান সন্ততি…

প্রধান শিক্ষকের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেখি একটা কাগজ। স্কুলের প্যাড আছে?

—আছে, বলেই প্রধান শিক্ষক ব্যাগ থেকে বের করেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিতে গিয়ে কবজি কাঁপে।

গাড়িতে বসে খস-খস করে লিখে দিয়ে বলেন, এডুকেশন সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে এটা দেবেন। আর সীতাকান্ত কলকাতায় গেলে, আমার কাছে স্লিপ দিও—।

যেন অন্য বিষয়ে মন দিচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে সমস্ত শরীর অভিনিবেশ নিয়োগ করলেন গাড়ির ভিতরের সিট, ব্যাটারি ফ্যান, গাড়ির সম্মুখের কাঁচে ওয়াইপার কাঠিটায়।

পুলিশ ভ্যান এগোয়। পিছনের গাড়িগুলো গতি পায়। একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে মানুষগুলো, মুখ্যমন্ত্রী কি? জয়। স্বাধীন ভারত কি? জয়। নতুন পিচ খোয়া বিছনো সোজা রাস্তায় যতক্ষণ গাড়ি দেখা যায়, মানুষগুলো চেঁচায়।

রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে যেখানে গাড়িগুলো···পিছনের শেষ গাড়িটা দৃষ্টি থেকে গাছপালা জনপদের আওতায় আড়াল হতেই ভূপতি চেঁচায়, সীতাকান্তবাবু কি ? উপস্থিত মানুষগুলো সমস্বরে চেঁচায়, জয়—য়—

হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিল সীতাকান্ত। ভূপতির দিকে খুশির চোখে বলেছিল, হইল কাজটা ? সাতদিনের মধ্যে হাইস্কুল করিয়ে তবে ছাড়বো—আপনাদের সকলের সামনে কথা দিলাম।

দেশবাসী—এতগুলো মানুষের সামনে সীতাকান্তবাবু যেন চকিতে ক্ষমতাবান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যায়। সকলে প্রণাম জানায় সীতাকান্তকে। পতাকাধারী মানুষটার কাঁধে হাত রাখতে ডেকেছিল সীতাকান্ত,—ও ভূপতি।

'ইউ' শেপড্ রিজারভারের বাঁধানো ইটের উপর হাঁটতে-হাঁটতে সীতাকান্ত ভাবে, ফরেস্ট অফিসে তো ব্যাপারটা অন্য ভাবে বোঝাতে হবে। সেখানে ভূপতি তড়-বড় করে যদি বাজে কথা—বেফাঁস কিছু বলে ফেলে! তাই ডাক দিয়ে বলে, ও ভূপতি ?

—আজ্ঞা ?

—তুমি বাবু আবোল-তাবোল কিছু কইবেনি ফরেস্টারকে।

লজ্জা নয় বরং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে ভূপতি আগ্রহী, আপনি থাকতে আমি কইবো কেনি গো ? সৌবার প্রফুল্ল সেনের গাড়ি আটকে ইশকুল স্যাংশান করাইছিলেন, আমি কিছু কইছিলুম ? না, কিছু গড়বড় করেছিলুম ?

সীতাকান্তর পথ চলা থমকে যায়। ভূপতিকে বড় স্নেহে কাছে ডেকে বলে, সৌ কথা মনে আছে··· !

—থাকবে নি ?

—সৌ দিন কাল তো নাই গো···, বলে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে সীতাকান্ত। ভাবে, গরমেন্ট বদলে গেছে···পঞ্চায়েত ক্ষমতা পাইছে। আমাদের ভাগচাষি মজুরদের ছেলেপুলেরা ভোটে জিতে পঞ্চায়েত সদস্য। দু-এক শ্রেণী লিখাপড়া শিখে অখন ফটর-ফটর কয়, বিশ্বব্যাঙ্ক গ্যাট্ ডাঙ্কেল কত কী যে···!

হাঁটতে-হাঁটতে ইট বাঁধানো 'ইউ' শেপ শেষ হয়ে ডান দিকে পঞ্চায়েতের মাটি ফেলা বাঁধ। বাঁধ বরাবর রাস্তা চলে গেছে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিলখালির ফরেস্ট অফিস। মাটির বাঁধে পা ফেলে ভূপতি তাকায় বাঁ দিকে। সরু মেটে রাস্তার পর মাটি বাঁধিয়ে উঁচু ঢিপি। ঢিপির বাইন গাছটা বর্ষা মেখে ফল ফলে পাতায় সবুজ। তারপর তো সাদা বালির চর। চরের পর সমুদ্র শাখায় গাঙ। হু হু শব্দে বাতাস।

ভূপতি থমকে দাঁড়িয়ে বাইন গাছটা নজর করে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে গড় জানায়। গাছের গোড়ায় কতকালের নুড়ি পাথর। গা ফেটে ফেটে চকলা ওঠা স্তর। পাথরখণ্ডটার কাছে লাঠি পুঁতে একখানা সোলার চাঁদমালা। হাওয়ায় ফর-ফর ওড়ে। চাঁদমালার রাংতায় রোদ চিকমিকোয়।

সীতাকান্ত মাস্টার খানিক এগিয়ে খেয়াল করে সঙ্গী ভূপতি পাশে নেই। তাকায় পিছনে। ভূপতিকে দেখে সম্বিত ফেরে। একেবারে গাছটায় সোজাসুজি

দাঁড়িয়ে দু হাত জোড় করে প্রণাম জানায়। পথের নোনা ধুলো এক চিমটি তুলে জিভে দিয়ে বলে, মা। বড্ড জাগ্রত মা গো ভূপতি—

—হুঁ। বুড়ির ঝি কালী কবে থিকে যে জাবড়ি মেরে বসে আছে…।

মেটে বাঁধের পথ ধরে হাঁটে। দু-পাশে পঞ্চায়েতের বন সৃজন প্রকল্পের বাবলা খেলকদম সোনাঝুরির গাছ লাইন দিয়ে। ছায়া পড়ে মেটে পথে। ছায়া মাড়িয়ে হাঁটে দুই মানুষ।

(৪)

বালি অংশ মাটিতে ক'দিনের জল হাওয়ায় এক দেড় ফুটের ঝাউ চারাগুলো যেন দু আড়াই ফুট।

খাকি হাফ প্যান্ট আর খাকি হাফ শার্ট গায়ে ফরেস্টের কর্মচারী ধরণী ঝাউচারাগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে। মাথার উপরে সকালের রোদ। পিছনে সমুদ্র উপচনো জলের গাঙ। হাওয়া বয়। ঝাউচারাগুলো হিলমিলিয়ে দোলে। হাত আন্দাজে চার পাঁচ ফুট ফাঁক রেখে লাইন দিয়ে পোঁতা।

হাওয়ার দমক কমলেই গা ঘামে। ভেতরে গেঞ্জির উপর ফরেস্টারের পোশাক। বুকের কাছে পকেটের উপর লাল সুতো দিয়ে কটা ইংরেজি বর্ণ ফুটিয়ে লেখা সি. কে ফরেস্ট স্টেশন।

ঝাউচারা লিকলিকে ডালপালায় নড়েচড়ে। উৎকণ্ঠায় ধরণী একবার এদিক একবার ওদিক যায়। তবুও দেখতে পায় না কাউকে। পায় না বলেই ছটফট করে। নতুন স্টেশন অফিসারের মুখোমুখি হ'তে লজ্জা। মুখার্জি সাহেব বলেছিলেন, ধরণী—

—আজ্ঞে সার।

—তুমি পুরোনো লোক আছ। তিন জন লেবার ঠিক করে নতুন চারাগুলোর নার্সিং করার ব্যবস্থা নাও—।

নতুন স্টেশন অফিসারকে আশ্বাস দিয়েছিল ধরণী, আপনি অর্ডার করলেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাজে লেগে যাচ্ছি সার।

—ঠিক আছে। কাজ সেরে আমাকে রিপোর্ট দেবে। আমি স্পটে দেখে আসব।

কথাগুলো একলা চরে মনে হতেই ছোকরা তিনজনের উপর জ্বলে ওঠে। আকাশে রোদ ছড়িয়ে যায়। গায়ে জ্বালা। সুতরাং খাকি হাফ শার্টটা খুলে রাগ কমায়। চামড়ায় হাওয়া লাগে ব্রহ্মতালু খানিক জুড়োয়। তখন উপায় খোঁজে ধরণী।

সরু-সরু নোনা ঘাস বালির চর থেকে গ্রাম ঘেঁষা উচ্চতায়। বালি অংশ মাটিতে হাওয়াই চটি পরে হাঁটে ধরণী। কল-তলাটা একলা ফাঁকা পড়ে। পাশেই মালবাবুর খড় তেরপলিন ছাউনিতে মেছো আড়ত। নির্জন বালিচরে আর একটা মানুষের অনুমানে এগোয়। যত এগোয় অবাধ হাওয়া টিউকলটার

হ্যাণ্ডেল পিস্টনে চিরে কেটে সোঁ সোঁ শব্দ। শুটকি মাছের খটিদাররা চাঁদার পয়সায় তৈরি করে দিয়ে গেছে। চর···চরের কিনারে শুধু নোনা জল। চর থেকে গ্রাম বসত তো অনেক দূর! সুতরাং তৃষ্ণা মেটাবার একটু মিঠে জল। ফলত টিউকলটার কাছে মালবাবুর সম্বচ্ছুরে মেছো আড়ত। নোনা মাটি নোনাজলের পরিমণ্ডলে পানীয় জলের নিশ্চিন্তি!

চারদিক ঘিরে ঘারে শুধু ঢোকার মতো দরজা ফাঁক। ভেতরে মাচা বেঁধে শোওয়া বসা। টিনের ছোট্ট সুটকেসে ক্যাশবাক্স। ছোট বড় দু খানা ঝড়া চাকন, একটা কাঠের বাক্সে কাঠের গুঁড়ো বিছিয়ে এক কোয়ার্টার বরফের চাঁই। কাঠের গুঁড়ো, ভুষি চেপে ঠেসে বরফের গলন প্রবণতাকে রুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা।

মাচায় বসে দরজা ফাঁক থেকে গাঙ···গাঙে বেয়ে আসা জেলে ডিঙি···গাঙ মুখ প্রসারিত হয়ে সমুদ্র শরীর সব দেখতে পায় মালবাবু। থির হয়ে বসে থাকলেও শরীর সীমায় উথাল-পাথাল ঢেউ। বার বার নজর যায় বরফের বাক্সে। গুঁড়ো ভুষিগুলো একটু-একটু করে ভিজে যায়। ভাবে, গাঙ ঝাঁপিয়ে ডিঙি লৌকো আসে কাই? পাঁচ দশখানা বাগদাও যদি জাল খামচিয়ে ধরি আনে তাহলে পলিথিন বাক্সে বরফ মেরে বাস রাস্তার আড়তে চালান দিই। দুশ পঁচিশ ত্রিশ কেজি···তবু কিছু খরচ উঠে চর পাহ্যরার! তখন সদ্য কেনা পলিথিন বাক্সটা চোখে পড়ে। মন ছোট হয়ে যায়। খেদ বিছিয়ে দেয় সামনের সাদা বালির চরে। মটকার বাঁশ থেকে ছোট্ট কাঁটা পাল্লার 'এস' আংটার কাটাটা ঝোলে। মাঝারি শিকলে থালার মতো পাল্লা দুটো মেঝের বালিতে বসানো। দরজার ফাঁক পেয়ে বাতাসের স্রোত। স্রোতে মানুষের গন্ধ। চকিতে দরজা জুড়ে মানুষ! মালবাবু চমকে শুধোয়, কে গো বাবু!

—আমি ধরণী।

—আমাদের ফরিস্টের?

—হ্যাঁ। কে বলে, মনে হয়?

—তা হউক। ভিতরে আইসে বুসো। বিড়ি খাও—

—বিড়ি! এখন আমার মাথায় বজ্রাঘাত!

—দূর বাবু, বলে মালবাবুর কণ্ঠে স্নেহের ধমক! ফাঁকা গাঙ রুষ্ট হইতে আর আকাশ ফাটতে কতক্ষণ? অমন কথা কয়?

চারদিকে ভীষণ ফাঁকা। গাঁ বসত তো দূরে। মালবাবুর কথায় বিপন্নতা জেগে ওঠে। নিজেই বোঝে ধরণী, কথাটা বলা উচিত হয়নি। সেবার তো খবর এলো অফিসে, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া উঠেছিল মাত্র। মেঘের কোথায় কী! হঠাৎ আকাশ চিক্কির মেরে বজ্রপাত। পড়বি তো পড় গাঙের মাঝে ডিঙি···ডিঙির মাস্তুল বেয়ে হাল বগলে মাঝির গায়ে! একেবারে পুড়ে ঝলসে মাঝিটা শেষ! আর লোকেরা জ্যান্ত ফিরলো ঘরে দোরে···! সুতরাং ভয় বাসা বাঁধে। ধরণী বিব্রত হয়ে বলে, এত বেলা উঠে গেল···তারা আসে কই?

—কারা গো?

—দেব প্রবাসের বিনয় আড্ডি। বিজয়বাটির সুরেন আর হায়দার আলি?

—হুঁ। কাল তো আসছিলো তিনটে গাধায়। বিড়ি মাঙলো—

লাফিয়ে ওঠে ধরণী, তাই? কিন্তু এখন রোদ তেতে গেছে। কাজটা হবে কখন? ধরণী প্রশাসনিক উদ্বিগ্নতার অংশীদার হয়ে যায়।

—হুঁ। তারা তো কাল বিকালায় বার-বার কইছিলো, খুড়া তোমানকে এইবার চর থেকে উচ্ছেদ করিব। যত কই—আরে কী টা? কীসের জন্যি? কিচ্ছু কইলো নি। খালি বলে, বিড়ি খাবাও—খাইলো তিনজনে ছ'খানা বিড়ি।

—কাল কেন? আজ তো এখন আরও ছ'খানা খেতে আসতে পারতো—। বেলা উঠে গেলে কাজ হয়?

মালবাবুর খড় তেরপলিন ছাউনি তলার মাচায় বসে কথা বলে দু-জন। বিড়ি টানে। বিড়ির ডগায় আগুন। আগুনের আঁচে সময় পোড়ে। ছাই হয়।

সিলভারের টিফিন কৌটয় পানতা। পকেটে কাগজ মোড়া এক থাবা নুন দুটো কাঁচা লঙ্কা। টিফিন কৌটর সরু হাতল ধরে সাবধানে উঁচু করে হাঁক দেয় তিনটে গলা, খুড়া—খাবারের তিনটে পাত্র রেখে দুবো গো?

গলার আওয়াজে টের পায় মালবাবু। ধরণীকে চাপা গলায় বলে, পশুগুলো আইছে। পরে চড়ায় তুলে বলে, খাবারগুলা খায়ে লুবো পাত্রগুলা থাকলে হবে তো?

বিনয় একদম দরজা ফাঁকে ঢুকে বলে, তোমরা হইলে মাছ মাংস খাবা আড়তদার। ওই খাদ্যে পেট ভরবে? কথার জের কাটতেই বিনয়ের নজরে ধরণী। কাঁধে ফরেস্ট অফিসারের খাকি পোশাক! বিনয় চমকে ওঠে! পিছনে এসে দাঁড়ায় হায়দার আলি। তার পিছনে সুরেন হাঁক মারে, কিরে্য? তোরা কি বালির চরে ডুবে গেলু?

ধরণী ধমক দেয়, ও বিনয়—আমি তো এক বেলা বসে আছি। তোদের কি কাজের ইচ্ছা নেই?

—হাঁ, কাজের জন্যেই আসছি, বিনয় নত মুখে কথাগুলো বলে।

—কোদাল? জানতে চায় ধরণী।

—সুরেনের হাতে, বলেই পরামর্শ দেয়, এই সুরেন, দাদাকে দেখা তো জিনিসগুলা।

—কোদালের ডাং ঠিক ঠাক লাগিয়ে এনেছিস তো? না কি সেবারের মতো আদ্ধেক মাটি খুঁড়ে বলবি, কোদাল যে গড়বড়। থামো একটা ডাল কেটে কোদালে লাগাই, তারপর কাজ।

তিনজনেই সমস্বরে কথা বলে আশ্বাস দেয়, না না। সেই সব সাইজ সোজা করে আনতেই তো দেরি—

বেরিয়ে আসে ধরণী। পেছন পেছন মালবাবু। চারদিকে ফাঁকা বালি চর। সমুদ্র বেয়ে এসে গাঙ ডিঙোনো হাওয়ায় সাঁ সাঁ শব্দ। এই নির্জনতায় পাঁচ মানুষ রাগতে পারে না। ধরণী শুধু বলে, এত বেলায় কাজে লাগলে তোরা পারবি ডেলি চারশ গাছ সাইজ করতে?

—কেন পারবো নি? বেলা চারটে অব্দি টেনে দুবো। মাঝখানে শুধু আধ

ঘণ্টা টিফিন—ওই পানতা কটা খাইতে আর কতক্ষণ ?

কাজটা বন বিভাগের। তবুও মালবাবু কথার মধ্যে ঢোকে, বিনয়—

—আজ্ঞা খুড়া ?

—তোরা আর বেলা বাড়াইতে দিসনি। কাজে লাগু।

ধরণী সহমত জানিয়ে বলে, ঠিক বলেছেন। তোরা—, বলেই ধরণী হাত দিয়ে দিশা দেখায়। ছোকরা তিনজন গায়ের কাছে দাঁড়ায়। ছুঁতে বা গা ঘেঁষে দাঁড়াতে সংকোচ! একেবারে গরমেণ্টের মাইনে করা লোক!

ধরণী নিজের হাতের ডাইনে বাঁয়ে তিনজনকে দেখে উদ্দিষ্ট স্থানটাকে বোঝায়, ওই যে হেঁতাল বগড়ার ঝোপ—

হায়দার বলে, হাঁ—

—এই বরাবর ঝাউ চারার গোড়ায় পাশের মাটি আট দশ কোদাল করে সাইজ করে দিবি।

—জল ? জানতে চায় সুরেন।

—সেটা আজ নয়, বলে ধরণী। পকেট থেকে ছক কাটা কাগজটা বের করে সিরিয়াল নম্বরের ঘরে লেখে, একয়ে বিনয় আড়্যি, দুইয়ে সুরেন লিখে ধরণী জানতে চায়, ও সুরেন তোর টাইটেল কিরে ? বেশ ক'খানা ঝাউচারার সবুজে সেঁধিয়ে গেছে। কথাটা শুনে পেছনে ফিরে বলে, শাসমল—

—কি ? শাসমহল ?

—না না, শাসমল—,

—অ। এবার হায়দার—, বলেই ধরণী স্মৃতি হাতড়ে পেয়ে যায় নামের শেষাংশ 'আলী'।

রোদ বাড়ে। কোদালের ধারাল অংশের তীক্ষ্নতায় ঝিলিক-মিলিক রুপো। গা ঘামে ভিজে যায়। ভসভসিয়ে বালি মাটির চাবড়া কাটে। ধীরে-ধীরে গাছ-গুলোর গোড়ায় পা দিয়ে চেপে চেপে ঢিবি করে দেয়। লিকলিকে ঝাউ চারা-গুলো গোড়ায় মাটি পেয়ে নিরাপদ। মালবাবু মুড়ি চিবোতে-চিবোতে বলে, ও ধরণীবাবু একটু কাঁচা পিঁয়াজ লও—

—নোবো। আর বেশি খাবো না। একবার দেখে আসি ছোকরাগুলো কেমন কাজ তুলছে ?

মালবাবু আশ্বাস দেয়, ওরা লাগছে যখন কাজ ঠিক করবে। আর বাবু তুমি যখন সরজমিনে হাজির ওরা ফাঁকি দিতে সাহস পাবে নি—

বাইরে চড়া রোদ। চরের সাদা বালি তেতে গেছে। আড়ত থেকে মুখ বাড়ালে কাজের ছেলেগুলোকে দেখা যায়। তবুও কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নজর-দারির তো মূল্য আছে। স্টেশন অফিসার মুখার্জি'রা স্পটে এসে দেখতে চেয়েছেন। সুতরাং ধরণীর মধ্যে অধীনস্থ কর্মচারীসুলভ দায় ও দংশন ভেতরে ভেতরে পীড়া দেয়। মালবাবুর আড়তের ছাউনি ছায়ায় থাকতে বাধে। বেরিয়ে পড়ে আড়তের ভেতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আসে মালবাবু। পাকা উনুনের হলকার মতো রোদ ছড়িয়ে সূর্যটা মাথার উপর লালে-লাল। এক দমকায় চোখ

মুখ ঝলসে যায় দুই মানুষের। ধরণী নিজের চোখমুখে হাত বুলিয়ে হঠাৎ তাপের দমক সামলায়। মুখ ফুটে কিছু বলে না, তখন দেখতে পায় একটু তফাতে বিনয় সুরেনরা মাটি কাটছে কোদাল কুপিয়ে। কালো-কালো চেহারায় উদোম পিঠ যেন ঘামে বৃষ্টি ভেজা। পাশাপাশি যেতে-যেতে মালবাবু বলে, ও ধরণীবাবু—বড্ড রোদ যে, ছাতা লিবেন ?

—ধুর বাবু। এটা একটা রোদ নাকি ? বোশেখ মাসের রোদে বীরভূমের মাটিতে জঙ্গল তৈরি করে এলুম। একদিনও ছাতা নিইনি—

মালবাবু আতিথেয়তার হতাশা ঢাকতে মৃদু হাসিতে মুখ চোখের রঙ বদলায়। বলে, তা আপনি বাবু নদীয়ার লোক। আমাদের গৌরাঙ্গ রোদে তাতে অমন খালি গায়ে তো নাম সংকীর্তন করে বেড়াইতো—

খর রোদ। চরাচরে বাতাস প্রায় নেই। ফলত চরের গা-লাগোয়া গাঙ সমুদ্র হঠাৎ দামাল শিশুর ক্লান্তির মতো নিথর। পাশে যেতে-যেতে মালবাবু আবার বলে, ধরণীবাবু—

—আজ্ঞে ?

—আমার এই আড়তটুকু পাকাপোক্ত ভাবে ঘর করে চালাইতে পারি সেই ব্যবস্থা ফরেস্টারকে বলে কয়ে করি দাও না গো—। বড় অনুরোধে কথাগুলো বলে মালবাবু।

গ্রাম পাড়া চর থেকে বেশ দূরে। ডাকলে হাঁকলে অনেক পরে সাড়া শব্দ মেলে। তবু মালবাবু মেছো ডিঙির আশায় চর মুনে বসে থাকে। একটু ছায়া···আশ্রয়···মানুষের আশ্বাস···! তাই পাশে তাকিয়ে ধীরে সুস্থে ধরণী বলে, একটা দরখাস্তে আপনার বক্তব্য লিখে ফরেস্ট অফিসে আসুন। আমি সাহেবকেও বলবো আপনি ভালো করে ধরবেন অফিসারকে—

—ধরিলে, হইবে মনে হয় ?

—সাহেব কিন্তু লোক ভালো, ধরণী আশা জাগায়।

বালি ভেঙে হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়ায় মালবাবু। পাশাপাশি চলন্ত মানুষের অভাবে তাকায় ধরণী। দেখে, মালবাবু গাঙ ছাড়িয়ে সমুদ্রমুখের জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। ধরণীও তাকায় মালবাবুর লক্ষ্যের দিকে। তখন দেখতে পায়, সমুদ্র-ছোঁয়া জলবিস্তারে একখানা পালের আভাস। ঢেউয়ের সঙ্গে টালুপ টুলুপ নাচছে ডিঙিটা। নিতান্ত দেশি দাঁড়টানা জেলে ডিঙি। মেসিনের ভট্ ভট্ শব্দ নেই।

মালবাবু চরে হাঁটা থামিয়ে ডিঙিটা দেখতে-দেখতে ভাবে, অউটা কি মাখম জেলের ডিঙি···! অনুমানটা সত্য হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় একবার বালিস্থানের কালী···চণ্ডীকে···এখান থেকে দাঁড়িয়ে গড় জানায়। সাফল্য প্রার্থনা করে। বাইন গাছতলার নুড়ি পাথরটা যেন ত্রাণকর্ত্রী।

ধরণী এগোয়। বালি অংশ মাটি আজকে রোদ পেয়ে আরও কঠিন হয়ে ওঠে। ফলত কোদালের কোপে শব্দ হয়। বাতাস কেটে বালি মাটি বেয়ে শব্দটা এখানেও টের পায় ধরণী। ছোকরা তিনটে কাজ করে। হঠাৎ বিনয় আড়ি

বলে, হায়দার—ধরলে হয়নি ধরণীদাকে ?

—কেনি ? কোদাল থামিয়ে জানতে চায় হায়দার।

—উ না হয় পাশ করা লোক। আমরাও তো ইস্কুল কলেজে পড়ছি, আমাদের অউ রকম ফরেস্ট অফিসে চাকরি বাকরি হয় না ?

সুরেন গাছটার গোড়ায় মাটির চাঁই পা দিয়ে চেপে-চেপে বসিয়ে বলে, জানতে হয়, ফরেস্টে নতুন লোক লিবে কি না ?

—জানবি কী করে ? হায়দার খোঁচায়।

—কেনি ? ধরণীদাকে জিগাস করবি ? বলে সুরেন।

—ধুস্। জানলেও ওরা বলবে নি। নিজেদের ভাই ভাইপোরা ঢুকবে—আর তোরা, বলে মুখটা ছোট হয়ে যায় হায়দারের। মনে মনে ভাবে, আমি তো মুছুলমান। আগে সুরেন বিনয়দের খেয়ে ছুঁড়ে যদি কিছু থাকে তো তারপর আমার…! আমরা বিদেশি লুণ্ঠনকারি…সেদিন দশ মাইলের বাজারে পদাফুল-ওলারা মিটিংয়ে যা কইলো…ভাবতে-ভাবতে মিইয়ে যায়। এতদিন এক সঙ্গে মাঠঘাটে খেলে ছুটে ইস্কুল পাঠশাল করে ঈদ হোলি চড়ক কালী পুজোয় এক সঙ্গে থেকেও যেন একা লাগে। দূর থেকে বুঝতে পারে ধরণী, কাজটার গতি ঝিমিয়ে গেছে। তাই হাঁক দেয়, ক'খানা গাছ হল বে—ও বিনয় ?

ছোকরা তিনজন ঝাঁকুনি খায়। কাজ শুরুর উদ্যোগ নিতে গিয়ে বলে, কাজ চলছে গো দাদা—

—হ্যাঁ চালাও ভাই। সাহেব যে স্পটে দেখতে আসবে—, খবরটা দিয়ে কাজের গতি বৃদ্ধি করতে চায়।

পোড় খেয়ে অভিজ্ঞ হায়দার তখনই বলে, কবে গো দাদা ?

—কাজটা একটু টেনে তুলি। চার পাঁচ দিনের মাথায় আসতে পারে সাহেব—

হায়দার তাকায় সকলের দিকে। ছোকরা তিনজন বিনা বাক্যে যেন গোপন পরামর্শটা ধরে ফেলেছে। বিনয় কোদাল হাতে দুপা এগিয়ে বলে, ও ধরণীদা—

—কি ?

—তোমার সাহেবকে আমাদের দরখাস্তগুলো দিলে কাজ পাওয়া যাইবে ?

—দরখাস্ত…! অবাক হয় ধরণী।

বিনয় তার কথার ভিত বানাতে বলে, সুরেন তো কলেজ পাশ করা ছেলে। হায়দার মাধ্যমিক—আমাদের যে কোনো একটা চাকরি হয় নি গো তোমাদের বিভাগে ?

কলেজ পাশ…মাধ্যমিক…, ভাবতে ভাবতে ধরণী বলে, আর তুমি ?

—কে ! বিনয় ? কথাটা ধরে নিয়ে হায়দার নিজের সংখ্যালঘুত্বের আফসোসে আর ক'দিন আগে দশ মাইলের বাজারে অমন জোরালো কণ্ঠে নিজের সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ…পাঁচ ছ'বছর দেশের ইস্কুলে পাশ করেও বাঁধা রোজগারহীন জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে গলা ফাটায়, বিনয় তো বি. এ. বি. টি. ?

চমকে যায় ধরণী! অতো লেখাপড়া জানার তথ্যে, নাকি হায়দারের আক্রোশ-

প্রূর্ণ চিৎকারের তীব্রতা, ঠিক বোঝা যায় না। মুহূর্তে ধরণী সমীহ ক্লিষ্ট ছোকরা ফরেস্ট গার্ড। ভাবে, এতো লেখাপড়া জানা ছোকরা এরা…। আমি তো সেভেন এইট পড়া গ্রুপ 'ডি'! পরক্ষণে ভাবে, মাস্টার রোলের ছক কাটা কাগজে এদের কাজের হিসেব। দিন গেলে আর কটা টাকা মজুরি? কিন্তু খাটিয়ে কাজ না তুলতে পারলে যে নতুন অফিসার মুখ শোনাবে।

সুতরাং বহুকষ্টে নিজের শিক্ষার দীনতা ঢাকতে আর নতুন সাহেবের তারিফের লোভে জোরে হুংকরে ওঠে ধরণী, ঠিক আছে। কাজ শুরু করো—বেলা চারটের মধ্যে চারশ গাছের নার্সিং চাই—। সাহেব রিপোর্ট চাইবে—।

ছোকরা তিনজনের মুখ রোদে পুড়ে ছোট্ট। মাত্র একবার তাকিয়ে ধরণীকে দেখে। তারপর বালি অংশের মাটির গায়ে কোদাল মারে। তিন জোড়া চোখের মণিপাতে ধরণী আহত হয়। আচমকা মনে হয়, এতো লেখাপড়া জানা ছোকরাদের অর্ডার করা দায়। তিনটে মুখ্যু সুক্যু ছোকরা নিলেই তো চলে…।

(৫)

সোজা সিধা পথটা উজিয়ে একেবারে মিঠে জলের দিঘির পাড়ে এসে দাঁড়ায় দুই মানুষে। পঞ্চায়েতের বাবলা গাছগুলো ডালপালা ছড়িয়ে সোজা কাণ্ড রেখে মাথায় ঝুপসি। ছাতার মতো ছায়া। ছায়ায় দাঁড়িয়ে সীতাকান্ত ডাকে, ভূপতি—?

—আজ্ঞা।

—দেখছো, মিঠারঞ্জনী খালের জল কেমন পরিষ্কার?

—হবে নি বাউয়ু? ফেজার সাহেব যখন ইঞ্জিন বুস করাইছিলো নোনা জল মিঠা করাইবার জন্য…সেই জল তো ভালো হইবেই।

সীতাকান্তের কথার প্রাণ টের পায়নি ভূপতি। পায়নি বলে আরও বলে, আমরা সো কত'শ বচ্ছর আগে করার ইঞ্জিনটা পড়ি থাকতে দেখছি। কাদা বালি লাগছে কিন্তুনি জং ধরে ক্ষত হয় নাই। সাহেবদের নিজ কাজের যন্ত্র তো তাই অতো দামী। নোনা জীর্ণ করতে পারে নি…। এখনকার হইলে জং ধরি চকলা ফাটতো—।

সীতাকান্ত রাগ করে বলে, ফাটুক। কিন্তু এই খাল ফিশারিটা তো বাঁধের গায়ে নাই…। নাই বলেই তো ফিশারিটা নষ্ট হইবে নি। কিন্তু তোমারটা?

আঁতে ঘা লাগে ভূপতির। বুকের মধ্যে ভয় জন্ম নেয়। পায়ের গতি থমকে যায়। ভূপতি বলে, সীতাবাবু—

—কও।

—যদি আমার অভিযোগটা জেরক্স করে থানা বি.ডি.ও., ডি.এফ.ও. কেও একটা একটা পাঠাই তা হইলে কি বাঁধ বাঁধা হইবে নি?

ভূপতির উৎকণ্ঠা সীতাকান্ত ভালো করে নজরে আনে। কেমন করে যে ফরেস্ট অফিসারকে বাগে আনা যায় তার আটঘাট মনের মধ্যে তৈরি করে।

ঝুলোনো কাঠের পুলের তলা দিয়ে খালটা বেয়ে দুই-মানুষের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে নতুন জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। তারপর তো গেঁয়ুয়া ঝোপ, বাইনের ঝাড়, হেঁতালের ঝুপসির মধ্যে দিয়ে ফিশপ্লটে।

বাঁয়ে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে "হোম টু দি হোমলেস" স্কিমে সরকারি সাহায্যে বাহান্ন ঘরে সংসার। তাদের ব্যবহার্য টিউকলে কটা বাচ্চা হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে-ঝুলে জল তোলে। পানীয় জল।

পিচ ঢালা পাকা পথটুকু পেরিয়ে কাঠের পুল। কাঠের রেলিংয়ে সাদা কালো রঙ। প্রচণ্ড হাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের গর্জন। পুলের রেলিং ধরে একটু জিরিয়ে নেয় দু-জনে। জিরোলেও সীতাকান্ত ভীষণ ব্যস্ত। নিজেরই অজ্ঞাতে পাশ পকেটে দু-ভাঁজ করা দরখাস্তটার আন্দাজ নেয়। আঙুলে কাগজের স্পর্শ পেতেই সাবধান হয় সীতাকান্ত। বাঁ-পকেটে নীলচে রঙের রুমালটা বের করে মুখ মোছে, ঘাড় মোছে, হাতের কনুই অব্দি মুছে নোনা ঘাম সাফ করে নেয়। যদিও দুই মানুষ নোনা দেশের, স্টেশন অফিসার তো আর নোনা দেশের মানুষ নয়।

পুল পার হতে ডাইনে ইট বাঁধানো পাড়'য়ে বালি বিছনো পুকুর। বন বিভাগের পরিভাষায়, টার্টল পণ্ড। যার সহজ নাম সামুদ্রিক কাঠা চাষের পুকুর। লোকে বলে, কাঠাপুকুর। কাঠাপুকুরের গা ধরে ইটের পাঁচিল। পাঁচিলের উপর লোহার অ্যাঙ্গেল খাটিয়ে বড় বড় ফাঁকে তারের জাল। সহজে কেউ ডিঙোতে পারবে না। চোখে পুকুরের সব দৃশ্যমান।

পুল পার হয়ে তারের জাল ঘেঁষে যেতে যেতে ভূপতি বলে, সীতাবাবু হাই দেখো জলে কাঁকড়া ভাসে—

—ধুস্। হাই যে পাড়ে বালি দ্যাখছো, অইখানে কাঠার ডিম রাখছিলো। রোদ তাত পেয়ে ডিম ফুটে কাঠার বাচ্চা বারাইছে—দেখো হাই জলের ধারে বাচ্চা বাইছে—

ভূপতি অবাক হয়। সীতাকান্ত বড় বোর্ডটা দেখে। সুন্দর করে লেখা, "প্রকৃতির প্রাণীকুল রক্ষা করুন। সামুদ্রিক কাঠা সংরক্ষণ প্রকৃতির ভারসাম্যের জন্যও প্রয়োজন।"

দুই মানুষে এগোয়। ফরেস্ট অফিসের বড় গেট। গেটের পাশে ঝারা খাল ধরে ডগমগে পাতায় মড গরানের ঝোপ। মোটা মোটা পাতায় রোদ। সরু ডাল গেরুয়া রোঁয়ায় ভীষণ চকচকে। এই সরু কাণ্ড লিকলিকে শাখা মোটাসোটা হয়ে একদা দামী কাঠ হবে।

কাঠের পুলের মাঝামাঝি এসে ভূপতি একবার পিছনে তাকায়। পুলের এ-মুড়ো ছুঁয়ে পাকা রাস্তা শেষ। রাস্তাটা চলে গেছে নামখানার ফেরিঘাট। এখন পুল ঘেঁষা পাকা রাস্তায় কেউ নেই। কাঠের পুলের উপর সীতাবাবুই একমাত্র সঙ্গী। ফলত নিরাপদ ভেবেই গোপন কথা কইতে ভূপতি বলে, সীতাবাবু—ফরেস্টার লোক কেমন ?

—চলু না, আমি তো আছি ?

সম্মুখে লোহার গেট, ভিতরে অ্যাজবেস্টার ছাউনি ক'খানা উঁচু টঙের উপর ঘর, জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ তার খাটানো ক'খানা বড়-বড় মোটা ঝাউ খুঁটি—সব মিলিয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন অফিস, প্রশাসন সৌধ বলে সমীহ জম্মায়! ভূপতি পা ফেলতে জোর পায় না। কোনো দিন বোট কাঠ জঙ্গলের কাজ নিয়ে তো আসেনি? তাই যেতে-যেতে বলে, পঞ্চায়েতের মেম্বর অমরেন্দ্র সে তো আমাদের কথা মানে গনে···তাকে লিআইলে হইত—

সীতাকান্ত ঘাড় ফেরায়। ভূপতির কথায় অপমানের ঝাপটা। সীতাকান্ত বিরক্ত হয়। জোরে-জোরে পা ফেলে। রোদে হেঁটে কপাল গণ্ড ঘামে ভিজে চকচকে। দুই মানুষে পাশাপাশি হাঁটার নৈকট্য মুছে দূরত্ব তৈরি হয়। তখন একলা ভেবে অসহায় ভূপতি চেঁচায়, সীতাবাবু—উ—।

সীতাকান্ত পিছনে তাকায়। শত হলেও ভূপতি তার সঙ্গী। দেশ গ্রাম বদলে গেছে। অনেক সঙ্গীজন অন্যত্র ঠাঁই পেতেছে। তবু তো ভূপতি এখনও ডাকতে হাঁকতে কাছের লোক। তাই একটু দাঁড়ায়। ভূপতি কাছাকাছি হয়, তখন সীতাকান্ত বলে, কত ডি. এম. মন্ত্রী এস. পি'র সঙ্গে বৈঠক করা লোক আমরা। আমি পারবোনি নোনা জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে কথা কইতে? যত পারবে সেী মেম্বার অমরেন্দ্র? বেশ ধমকের সুরে আরও সংযোজন করে, জানু ভূপতি—সেী অমরেন্দ্র অখনও নাম লেখতে গেলে তিনবার কাগজ ছিঁড়ে? কলম ভাঙে?

ভূপতি পাশাপাশি হাঁটা থামিয়ে দেখে, সীতাবাবুর মুখ চোখে রাগ, ঘৃণা, নাকি ক্ষোভ···কী যে ফুটে ওঠে। তৎক্ষণাৎ সায় দেয়, হুঁ। দ্যাখছি সেীদিন হাট কমিটির মিটিংয়ে। ঠিক কথা কইছেন, বলে আচমকা নিজের কাছে ধাক্কা খায়, আমি···আমিও তো কিছু লেখতে পড়তে জানি নি! তাহলে সীতাবাবু আমাকে অমন ঘৃণা করে মনে মনে···? ভাবনাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতেই ভূপতি ঝিমিয়ে যায়। পিছিয়ে পড়ে ভূপতি।

পাশে একবার তাকিয়ে না দেখতে পেয়ে হাত বাড়ায় সীতাবাবু। ভূপতিকে কাছে টেনে বলে, চলু তাড়াতাড়ি। যত বেলা হইবে ততো বেশি লোকের ভিড় হইবে। আসল পরামর্শ করা যাইবে নি—

স্টিল ডাঁটের ছাতাটা বগলে নিয়ে ভূপতি। বেঁটেখাটো চেহারায় বেশ গম্ভীর। সামনে লোহার গরাদ জুড়ে-জুড়ে দু-পাল্লা গেট। রোদ বৃষ্টি আর নোনা হাওয়া পেয়ে লোহার জোড় মুখের গাঁটে-গাঁটে জং। দু-পাল্লার মিলন মুখে মোটা শিকল দিয়ে তালা বন্ধ। খানিক ঠেললে এক জন করে মানুষ সহজে ভিতরে ঢুকতে কিংবা বেরুতে পারবে।

লোহার গেটের মধ্যে ঢুকে সীতাবাবু বলে, ভূপতি সাবধান। জামা-কাপড় যেন ছিঁড়ে নি—

—না ছিঁড়বে নি। চলুন গো—।

এত ধমক-ধামকের পরও বেশ বিনয়ী ভূপতিটা। ভালো লাগে সীতাকান্ত বেরার।

ইট বিছনো রাস্তা ফরেস্টের চৌহদ্দির মধ্যে। প্রায় গোটা গোটা ঝাউ গাছ শুকনো পড়ে আছে। কবে কোন চোরাই বোট জঙ্গল কেটে পালাচ্ছিল, আর্দালি ফরেস্ট অফিসাররা হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে। তাই গাছগুলো শুকিয়ে ক্ষত হয়ে যাচ্ছে। কাঠকুঠো পাশ কাটিয়ে এগোতে, বুড়োর দোকান। তক্তাপোশের চারখানা পায়া বাড়িয়ে টিন ছাউনি গুমটি। গুমটিতে ভাঙা কড়ায় উনুন বানিয়ে তোবড়ানো কেটলি আর ক'খানা কাঁচের গেলাস। অফিস খুব জমলে চা-দোকান দেয় বুড়ো। রাতে টর্চ জ্বালিয়ে পাহারা দেয় পুকুরঘাট গেস্ট হাউস। সীতাবাবু বুড়োর কাছে গিয়ে বলে, হ্যাঁ গো—সাহেব আছে?

—বড় সাহেব? নাকি বড় বাবু?

—বড় সাহেব—স্টেশন অফিসার? জানবার জন্যে আরও বোঝায় সীতাবাবু।

—আছে তো। যাও ওই বাংলায়—, বলে বুড়োটা দিশা দেখায়। পুকুর-পাড়ের উত্তর দিকে কটা নারকেল গাছ মাথা ঝাড়া দিয়েছে। উঁচু-উঁচু শাল খুঁটির উপর কাঠ বিছিয়ে, কাঠের দেওয়াল বানিয়ে অ্যাজবেস্টারের ছাউনি। সরু-সরু কাঠের রেলিং ঘিরে বারান্দা। বারান্দায় চেয়ার পেতে টেবিল লাগিয়ে অফিসের জরুরি ফাইল, দরখাস্ত পড়ার জায়গা। আরও ধার ঘেঁষে সাহেবের রান্নাঘর।

যেহেতু নারকেল গাছগুলো কাঠের ঘরটার সামনে, লম্বা লম্বা পাতার আড়ালে বোঝা যায় না কাঠের ঘরের মানুষটিকে। সংশয়! দ্বিধা! তাই সীতাবাবু আবার খোঁচায় গুমটি ঘরের বুড়োটাকে। বলে, হাঁ ভাই?

—কি? কইয়ে ফেলাও—, বলতে-বলতে খালি গায়ে বুড়োটা ছোট্ট সিলভার হাঁড়ির মধ্যে বড় বড় দু খানা দাঁড়ায় আটখানা সরু সরু পায়ে প্রাণীটাকে দেখে। হাঁড়ির গহ্বরে প্রাণীটা খড়-খড় শব্দে বেয়ে ওঠে। আবার নাড়া দিয়ে নামায়। নোনা পাঁক কাদা ধুয়ে প্রাণীটার গা-পিঠে মেটে মেটে লালচে রঙ। মোটা দাঁড়ায় সাঁড়াশিতে দু-একখানা গেঁমুয়া পাতা গুঁজে দিয়েও প্রাণীটার খড়খড়ানি থামাতে পারছে না। পারছে না বলেই বুড়োর গলায় বিরক্তি।

বেশ ভালোবাসার সুরে বলে সীতাবাবু, সাহেব ঘুম থিকে উঠছ্যে?

সীতাবাবুর গলায় যেন জঙ্গলে খলসে ফুলের মিষ্টি মধু! হাঁড়ির মধ্যে দু-দাঁড়ায় আটখানা সরু সরু পায়ে কাঁকড়াটা দু'শ গ্রামের উপর ওজন। ক'পা হেঁটে আড়তে বিকোতে পারলে তিন'শ টাকা কিলো। সুতরাং চাপা আনন্দে বিরক্তি খসে যায়। তখন বুড়োটা হাঁড়ির মুখে কলাই চটা ডিশ চাপা দিয়ে বলে, যাও না। সোজা হাঁটলেই সাহেবকে পাবে—। হয়তো চা-টা খাইতেছে?

এগোয়। বাঁয়ে অফিস ঘরে ওয়ারলেসের যন্ত্রপাতির বোঁ বোঁ শব্দ, ডাইনে গাছপালার ছায়ায় পুকুরের পাড় থেকে মোটা মোটা তক্তা খোঁটা মেরে সুন্দর ঘাট। চারদিকে নোনা মাটি নোনা জল। মজবুত করে পুকুর বেঁধে মিঠেন জলের স্থায়ী আধার। স্নান কাপড় কাচা আর ঝাউ ইউক্যালিপটাসের দানা ছড়িয়ে তৈরি মাটিতে নিয়মিত মিঠেন জলের সেচ। বাঁধাই পলি প্যাকেটে বৃক্ষ

শিশুদের গায়ে মিষ্টি জলের ঝারা দিতে পাকা বন্দোবস্ত। এখন মাথার উপর নারকেল গাছের ছায়া। গায়ে মিঠেন জল বেয়ে আসা বাতাস।

এবার কাঠের ঘরের বারান্দা পরিষ্কার দেখতে পায় সীতাবাবু। ভূপতি স্টিল ডাঁটের ছাতাটা শক্ত করে ধরে। কোঁচার কাপড় বাঁ-হাতে বাগিয়ে নেয়। কাঠের বাংলোয় উঠবার জন্যে তক্তা পেতে-পেতে পৈঠে। আগে-আগে হাঁটে সীতাবাবু। ভূপতি বড় আশা নিয়ে তাকায়, কেউ…কোনো কর্মচারী অন্তত সীতাবাবুকে দেখতে পেলেই সম্ভাষণে এগিয়ে আসবে, আরে! কাঁই যাবেন গো বাবু? ঘাস মাড়ায়। পাশে দু-খানা চৌবাচ্চায় একটায় বড়-বড় ব্যাঙের সাইজে ক মাসে কাঠা বাচ্চা অল্প জলে কিলবিল খেলা করে। পাশেরটায় এক বছরের কাঠা যেন পুকুরের কচ্ছপ। মুখ বাড়াতেই ভূপতি দেখে, ধাসাধাসিতে একটা কাঠা পিঠ উলটে মরা কোলা ব্যাঙের মতো ঠ্যাং চিতিয়ে পড়ে আছে। চৌবাচ্চা দুটো পার হয়ে কাঠের পৈঠে মুখো আর একটু এগোয় সীতাবাবু। কেউ কোথা থেকেও ডাকে না, হাঁকে না। ভূপতির মনে হল, আমাদের রয়ালগঞ্জের এত নামী দামি লোক… তানকে কেউ চিনে নি এইখানে গো! দুস্! এইজন্যে কইছিলুম পঞ্চায়েতের অমরেন্দ্রকে লি আইলে ভালো হইত…। বাবু শুনলে নি।

কাঠের ঘরের বারান্দায় বড়-বড় বরফি ফাঁকের তারের জাল ঘিরে পরদা ফেলা। এখন পরদা সরিয়ে দিতেই টেবিলে দিনের আলো। কদিনের খাতাপত্তর এগিয়ে ধরে ফরেস্ট গার্ড সঞ্জয় বেরা স্টেশন অফিসারের সামনে। সঞ্জয় বেরা বলে, এগুলা ফুয়েল চার্জের টাকাটা—সার।

—কতজন লোক? জানতে চান স্টেশন অফিসার।

—তা হইলে রসিদ বইটা আনতে হয়। আনতে যাই সার?

—যান। বইটা একবার দেখবো, বলে এক্সারসাইজ গেঞ্জির উপর দিয়ে দাবনার কাছে চুলকে নেয় মুখার্জিবাবু। ফরসা মুখে থুতনিতে অল্পস্বল্প দাড়ি। তামাটে রঙ ফরসা চেহারায় বিদেশি মানুষ বলে মনে হয়। বারান্দার শেষ প্রান্তে স্টোভ জেলে চা বসিয়েছে কাজের বউটা। প্লেটের সিদ্ধ ডিমে লবণ দিতে গিয়ে থমকে যায়। ভাবে, মরিচগুঁড়ো দুবো, নাকি লবণ? সঙ্কট কাটাতে মুখার্জির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে বলে, মরিচ গুঁড়ো দিই?

কালো চেহারায় যুবতী বউ। কপালে সিঁদুর লাগিয়ে টকটকে। মুখার্জি-বাবুর পছন্দ মতো রঙিন ছাপা শাড়ি। মাথায় হালকা গন্ধ তেল। রমণীহীন কাঠের বাংলোয় যুবতী বউয়ের চলাফেরা। কাজের মেয়ে বা রাঁধুনি বলেই মনে হয় না। সঞ্জয়বাবু রসিদ বই খুঁজতে গেছে অফিস ঘরে। সুতরাং বাংলো বারান্দা ফাঁকা। মুখার্জিবাবুর ফরসা পিঠে হাত রাখতে সুখ। লেখাপড়া জানা অফিসার পুরুষ মানুষে রোমাঞ্চ কালো যুবতীর দেহে। মনে ভাবে, নিজের পুরুষ মানুষ তো হাল কোদাল চালানো চাষা মজুর। তার আবার দেমাক…আরও দু-হাজার টাকা বরপণ দিতে হইবে। না হইলে ঘর থিকে অক্ষুণি বারাও—। নিজেকে ঢাকতে, মুখার্জিবাবুর ফরসা গায়ের মাংসে ছোঁয়া পেতে স্বপক্ষে যুক্তি খোঁজে, অফিসারবাবু স্নেহ করে বলেই তো আমার যত্ন

মানি লেয়। তা না হইলে তো বাবুর ঘরে কত রূপসী বউ আছে···আমি কি ছার···। প্রশ্রয়ে ছুঁয়ে থাকে যুবতী বউটা মুখার্জি'র দাবনা পিঠ। স্টেশন অফিসার ধীরে-ধীরে ঘাড় ফেরায়। তখন নিজের পিঠ দাবনা যুবতী বউটার উরু জংঘার উপরিস্থ কাপড়ের দেওয়ালে বাধা। ঘাড় বেঁকিয়ে যুবতীর চোখ জোড়ার সরলরেখায় নিজের পুরুষালি দৃষ্টি। বলে, কমলা—তোমার যেটা ইচ্ছা।

অফিসারবাবুর এমন সমর্পণে কমলা পরিপূর্ণ রমণী হয়ে বুকের মধ্যে ছটফট করে। ভাবে, এই বাবু বাবু পুরুষ মানুষগুলো কত নরম মনের যে গো! আমাদের নিজের লোকগুলো? চামড়ি ঢাকা পোড়া কাঠ···!

কাঠের পৈঠে বেয়ে নামতে ধপ্-ধপ্ শব্দ। সঞ্জয় বেরা এক হাতে লুঙির খুঁট ধরে খানিক সাবধানে নামে।

পায়ের শব্দে সীতাবাবু আর ভূপতি কাছাকাছি হয়। সঞ্জয় বেরা সোজা তাকিয়ে বলে, কী চাই আপনাদের?

সীতাকান্ত দু হাত জোড় করে বলে, গুড মর্নিং! বাঙালি কায়দায় জোড় হস্তে ইংরেজিতে এমন শুভেচ্ছা বিনিময়ে সঞ্জয়ের হাত থেকে লুঙির খুঁট খসে যায়। সীতাকান্তবাবু যে লেখাপড়া জানা মান্যগণ্য শিক্ষক, নোনা দেশে চাষি মজুর নয় সেটা বুঝিয়ে অতিরিক্ত সমীহ আদায় করতে বলে, স্টেশন অফিসার এনগেজড্? না কি, ফাঁকা আছেন?

—কেন? সঞ্জয় বেরা জানতে চায়।

—এলাকা, আমাদের ভিলেজ নিয়ে ডিসকাসন্ করবো—

চিলখালি ফরেস্ট অফিসের সিনিয়র ফরেস্ট গার্ড। কাজকর্ম হিসাব নিকাশ রক্ষে করে গোটা অফিসটার দায়িত্বে তো বটে সঞ্জয় বেরা। একটু থমকে দাঁড়িয়ে সীতাকান্তবাবুর মুখ চোখ থেকে জামাকাপড় অব্দি পড়ে ফেলে। পিছনের মানুষ ভূপতিকেও নজরে এনে বলে, ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান সাহেবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি—। তারপর বড় বড় পা ফেলে ওয়ারলেস যন্ত্রপাতির পাশে প্রশস্ত কাঠের কামরায় ঢোকে। র‍্যাক, হোয়াট নট ভরতি ফাইল, কাগজপত্তর। স্টিলের আলমারি, কাচ পাতা টেবিল, বড় চেহারার পাঁচখানা প্লাসটিক কর্ড বোনা চেয়ার, কলিংবেল, সিগারেটের ছাই ফেলা পোড়া মাটির এ্যাশট্রে নিয়ে অফিস ঘর।

বড়বাবু সঞ্জয় বেরা খাতায় ওয়াশিল দেওয়া রসিদ বইয়ের বান্ডিল খোঁজে। খোলা দরজা। নোনা সমুদ্র পেরিয়ে এক ঝলক হাওয়া ফাঁকা অফিস ঘরে ঢোকে। কাঠের দেওয়ালে টাঙানো পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র। মানচিত্রের নিম্ন ভূ-ভাগে সমুদ্র নদী নালায় সবুজ ছোপ-ছাপে জঙ্গল কেঁপে ওঠে। রসিদের বান্ডিল হাতে ধরে একবার তাকায় সঞ্জয় বেরা। ঘাড়টা বাড়িয়ে টেবিলের কাচ দেখে সংশয়ে ভাবে, হাইরে, সাহেবের কাগজপত্তর উড়ে গেল নাকি?

স্টেশন অফিসারের বাংলোর কাছাকাছি এসেও দাঁড়িয়ে আছে দুই মানুষে। এগোতেও পারছে না। আবার নিরুপায়ভাবে এক ঠে। সময় কাটাতে সীতাকান্ত

তাকায় পাশে। অফিসঘরের পিছন থেকে মাটি কুপিয়ে ঝাউ ইউক্যালিপটাসের দানা ছড়ানো হাফর মাটি। রোজ বিকালে জল পায়, এখন শুকোচ্ছে। মাটির ওমে ভ্রূণগুলো অঙ্কুরিত হয়ে পৃথিবী দেখবে। পাশেই বাঁখারি কাঠামোয় পলিথিন শিটের ছাউনি তলায় এক দেড় ইঞ্চি বৃক্ষ শিশু। রোদের দহন থেকে কচি প্রাণগুলো আওতা পাচ্ছে।

কটা ফ্রক পরা মেয়ে হাঁটু বাঁচিয়ে জামা কোলের কাছে পোঁটলা। চারা উপড়োয়। কচি-কচি চারা। স্নায়ুতন্তুর মতো শিকড়। নরম মাটি চাপটে শিকড় ঢাকে। তারপর ছোট্ট পলিপ্যাকেটে চারা ভরে ঝুরো মাটি গোবর দেয়।

—ভূপতি দেখু। কত চারা…, বিস্ময়ে বলে সীতাবাবু।

—হাঁ। শুধু ঝাউ…, ভূপতি সায় দেয়।

ফ্রক পরা মেয়েদের একজন বলে, না গো বাবু জারুল গর্জনও আছে—

—দারুণ সুন্দর হইছে চারাগুলান, সোজা দাঁড়িয়ে প্রশংসা করে সীতাবাবু।

ধাঁ করে কানে পৌঁছয় কল্পনার। চওড়া কপাল ফোলা ফোলা ভারী মুখ মেয়েটার। কালো কপালে কাঁচের টিপ। রোদের আঁচে ঘাম মুখময়। কল্পনা তাকায় সীতাবাবুর দিকে। ফট করে বলে, এমনি হয় নাই, গো? চারাগুলার সঙ্গে কম খাটতে হইতেছে আমানকে?

পাশেই খুরপি হাতে কর্মরত বউটা কাপড় টেনে মাথা ঢেকে বলে, অ কল্পি? তুই না বড্ড মুখ ফট্‌কা মেয়েছেলে—

সীতাকান্তবাবু নরম গলায় বলে, না গো মা। তোমরা তো মেয়েছেলে? মায়ের জাত। তোমরা না হইলে কচি শিশু মানুষ করবে কে? সে মানুষের হউক আর গাছের হউক—

ছাউনি তলায় মেয়েরা একসঙ্গে খিল খিল হেসে ওঠে। বউটা হাসি দমিয়ে বলে, হাই দেখো—বুড়াবাবু কীসের সঙ্গে কী কথার বেশ মিল খাবাইলে।

তখনই পিছনে হাজির রসিদের বাণ্ডিল হাতে সঞ্জয় বেরা। নজর কাড়তে বলে, কই যাবেন তো সাহেবের কাছে?

—হুঁ। নিশ্চয়ই, বলে দুই মানুষে সঞ্জয়বাবুকে বনের গাছপালার মতো ঘিরে ধরে।

—তবে আসুন আমার সঙ্গে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সঞ্জয় বেরা। পিছু নেয় সীতাবাবু। তার পিছনে ভূপতি।

এখান থেকে কাঠের পৈঠে অব্দি পায়ে পায়ে ঘাস মরে শুকনো পথ। দ্রুত পায়ে পথটুকু হাঁটতেই কাঠের সিঁড়িতে খটমট শব্দ। সঞ্জয় বেরা তরতর উঠে যায়। অতি সাবধানে সীতাবাবু পা ফেলে কাঠের উপর। তবুও শব্দ হয়।

স্টেশন অফিসারের জাল ঘেরা ছোট্ট অফিসঘরের সামনে পরদা। বার বার হাত আর মাথার তেল লেগে হলুদ ডোরা কাটা পরদায় বোঁটকা গন্ধ। ছোপ ছোপ দাগ। পরদার এপারে দাঁড়িয়ে সীতাবাবুরা। সঞ্জয়বাবু অফিসারের টেবিলে রসিদ বইটা রেখে বলে, সার। এইবার প্রতি পাতার সঙ্গে টাকা টালি করবে—

কমলার দেওয়া ডিম খেয়ে শেষ। দু চারখানা মরিচের গুঁড়ো প্লেটে। প্লেটটা সরিয়ে রেখে স্টেশন অফিসার বলেন, ওরা কারা? চায়ের কাপে আর বার কয়েক চুমুক দিলেও সেটা খালি হয়ে যাবে।

সঞ্জয় বেরা তারের জাল থেকে বাইরের দিকে তাকায়। সমঝে নিতে চায়, সীতাবাবুরা ছাড়াও আবার কেউ নতুন লোকজন এসেছে কি না? পুকুরের ওপারে কাঠের তৈরি গেস্ট হাউস। গেস্ট হাউসের পাটাতনের তলায় ভাত কাঁটাকুটো খাওয়া কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ডাকে। সঞ্জয় উঁকি দিয়েও বিপন্ন! লোক কোথায়! নতুন লোক! সব তো ফাঁকা!

—উঁ হুঁ। যারা আপনার সঙ্গে-সঙ্গে এলো? স্টেশন অফিসার ধরতাই দেয়।

—ও। আমি ভাবছি কুকুর ঘেঘোচ্ছে, আবার কারা?

—না না। আপনার সঙ্গে যারা—

—ওরা কথা বলবে আপনার সঙ্গে।

—কী ব্যাপারে? জঙ্গলে কাঠ কাটতে পারমিট?

—আজ্ঞে না। নিজেদের এলাকা নিয়ে কথা বলবে—

চিড়িক করে মাথার মধ্যে খেলে যায় স্টেশন অফিসারের।

বাঁ হাতের আঙুলগুলো মাথার বাসি চুলে একবার চালিয়ে তারের জাল ফুঁড়ে আসা হাওয়ায় আরাম পায়। বলে, এলাকা…? পঞ্চায়েতের কেউ কী?

—ঠিক চিনলাম না, বলে অফিসারের উদ্বিগ্নতা কমায়।

—ওদের ডাকুন—। থাক—আমিই যাচ্ছি, বলে নিজের ফোল্ডিং চেয়ারটা টেনে নিয়ে যান বাঙলোর বারান্দায়।

বাধ্য হয়ে ছোট ছোট টুল দুটোও নিয়ে আসে সঞ্জয়বাবু। মোটা মোটা শাল খুঁটি পুঁতে তার উপর ফরেস্ট বাংলো। খুঁটির গা-ধরে তিন ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি ঘনত্বে চারখানা কাঠের লম্বা রেলিং। ফলত অবাধ হাওয়া। হাওয়ায় স্টেশন অফিসার বলেন, নিন, আপনারা বসুন।

প্রথমে সীতাবাবু নমস্কার জানায় স্টেশন অফিসারকে পরে ভূপতি দু-হাত জোড় করে নমস্কার জানায় স্টেশন অফিসারকে, এত কাছ থেকে, লুঙি গেঞ্জির ঘরোয়া পরিবেশে। অফিসারকে, পরে সীতাবাবুকে দেখে মনে মনে প্রীত ভূপতি।

—বলুন। কত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন—আপনাদের কথা এবার শুনি। ফরসা মুখে থুতনিময় লালচে অল্প অল্প দাড়ি। হাওয়ায় মৃদু কাঁপে।

সীতাবাবু আরম্ভ করে, সার। আমরা আসছি একটা আপত্তি লিয়া—

'আপত্তি!' চমকে ওঠে স্টেশন অফিসার মুখার্জি! ভাবে, আপত্তি…মানে অবজেকশান্! মানুষ দুটোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে তাকায় সঞ্জয় বেরার দিকে। মুখার্জিবাবু তো এক বছরও হয়নি এই ফরেস্ট অফিসের দায়িত্বভার নিয়েছেন। সে তুলনায় সঞ্জয় বেরা এই অফিসে বেশ পুরাতন কর্মী। সুতরাং ব্যাপারটা বুঝতে মুখার্জিবাবু আবার তাকায় সঞ্জয় বেরার মুখের দিকে।

সীতাকান্তবাবু সাহেবের এমন উৎকণ্ঠিত অন্যমনস্কতায় ছটফট করে।

ভাবে, শুরুতে তেমন কিছু গোলমাল হয়ে গেল নাকি ?

নতুন সাহেবের চোখমুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারে সঞ্জয় বেরা। সেজন্যেই নিজে গলা বাড়িয়ে বলে, আপনাদের আপত্তি বা আবেদন, আপিল টাপিল কী আছে খোলসা করে বলুন সাহেবকে—

ধীরে ধীরে সাহেবের মুখের রঙ ফেরে। সামনে উপবিষ্ট মানুষ দুজনের প্রতি পুনরায় অভিনিবেশ দেয় মুখার্জি সাহেব।

সীতাকান্তবাবু বলে, সার—আমাদের উপাশে রয়ালগঞ্জের সুইলিশ গেটের কাছ বরাবর বাউণ্ডারি বাঁধের অবস্থাটা দেখেছেন ?

—বাউণ্ডারি বাঁধ !

—হাঁ সার। বড় বড় ধস লিছে। ফাট্ ধরিছে—বড় জোয়ার হইলে নোনাজল ঢুকে একদম ফ্লাড্, বন্যা করি দিবে—, নিজের গলায় খুব আশঙ্কা ফুটিয়ে তোলে সীতাবাবু।

—তাহলে তো যে কোনো সময় বিপদ হয়ে যেতে পারে…!

—বিপদ বলে, সার ? সমুদ্রের নোনাজলের দাঁতে যা কামড়—একবার ধস্ ফাট পাইলেই হু-হু করে জল ঢুকিবে। বাস্তুভিটা জমিন পুকুর সব এক মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হইবে—, বলে আরও বোঝাতে চায় সীতাবাবু। ভূপতি মুখ বাড়ায়ে নিজের ফিশারি বাস্তুর কথা মনে করে।

একটু একটু করে সুর ধরতে পারেন মুখার্জি সাহেব। সীতাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, ওই সব স্লুইশ বাঁধ বাউণ্ডারি তো ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ?

—তা জানি সার। কিন্তু আপনি না নজর দিলে সুইলিশ থাকবে নি। গাঙ যা ভাঙতিছে—কিছু গাছ পুঁতে দিন সার, বলেই দু হাত জোড় করে আবেদন রাখে।

স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেব তখন ধীরে ধীরে হাঁটেন। বালিস্থানের সাদা বালির চর, চর ঘেঁষে বেঁকে মেটে বাঁধ। বাঁধের দু-পাশে পঞ্চায়েতের হাতে পোঁতা গাছপালার ছায়া। বালিস্থানের কালী বাইন গাছের তলায় এক খণ্ড পাথরের গায়ে সিঁদুর মেখে জাগ্রত দেবী। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ইঁটের ব্লক বাঁধের গায়ে জড়িয়ে রিজারভার। হু হু জলস্রোতে চারপাল্লার স্লুইশ গেট। গেট পেরোলেই ভয়ংকর রয়ালগঞ্জ। সমুদ্র জল পাঠাচ্ছে এখানকার চওড়া গাঙে। ফাঁকা গাঙে উম্মাদ হাওয়া। হাওয়া অবাধ কাঠের রেলিং ঘেরা বারান্দায়। পকেটের কাগজ সীতাবাবুর হাতে ফরফর ওড়ে। শব্দটা মুখার্জি সাহেবের কানে লাগে। তখন তাকায় সীতাবাবুর দিকে। সাহেব বলেন, কী দিচ্ছেন ওটা আমাকে ?

সীতাবাবু মুখার্জি সাহেবের সুমেজাজটা ধরতে আঁকুড় পাকুড়, বলে, সার আমি আর এই ভূপতি তো ফাটল ফাটা বাঁধের উপাশ গাঁয়ের বাসিন্দা।

—তাই !

—সোজন্যি তো রাতে ঘুম নাই। দিনে শুধু ছটফটর এইখানে সেইখানে দৌড়াই।

অনেক দিনের পুরনো শিক্ষক সীতাবাবু। দক্ষ হাতে পাকা দরখাস্ত গোটা-গোটা লেখায় বক্তব্যের বাঁধুনি আছে। সব খুঁটিয়ে পড়ে মুখার্জি সাহেব জানতে চান, সীতাবাবু কে ?

—আজ্ঞে ? আমি—, বলে সীতাবাবু টান টান বসে। দরখাস্তে মুসাবিদার তারিফ শুনতে আগ্রহী। ক'ত ডি. এম. রাইটার্স বিল্ডিং এই হাতের লেখায় ডেকে কথা কইতে, নাহলে চিঠি দিয়ে সাক্ষাতের তারিখ টাইম জানাতে বাধ্য হয়েছে। বন জঙ্গলের অফিসার তো ছোকরা মানুষ, কথাগুলো ভেবে নিজেকে গরম করে সীতাবাবু।

দরখাস্তের বয়ান থেকে মুখ তুলে মুখার্জি সাহেব সীতাবাবুর পাশের মানুষটিকে বলেন, আপনি তাহলে ভূপতি জানা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শিশুকালে ইস্কুল পাঠশালের, স্বল্প দিন হলেও, অভ্যাসটা চাড়া দেয়। শিক্ষক, গুরুজন মাননীয়কে সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ায়।

—ঠিক আছে। বসুন—বসে কথা বলুন।

—সার। আপনি বাঁধটা রক্ষা করুন সার, ভূপতি এতক্ষণে ক'টি কথা বলে। সাহস পায়। নিজের উপর আস্থা জন্মায়।

মানুষ দু জনকে দেখতে দেখতে দরখাস্তের মধ্যে ক্রমে মনোনিবেশ করে। হঠাৎ বলেন মুখার্জি সাহেব, সমস্যাটা তো এলাকার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সীতাবাবু উত্তর দিয়ে স্টেশন অফিসারের দিকে নজর রাখে। মুখার্জি সাহেব একটু দাঁতে চেপে চেপে কথাগুলো বলবার জন্যে নিজের মধ্যে বাক্য সাজায়। এবং ভাবে, কোন পঞ্চায়েত···বা কোন রাজনীতির সমর্থক ! নিজেই দ্বিধায় পড়ে একটু সময় পার করে। বাতাস বয় এলোমেলো। সীতাবাবু এত বিলম্বে ধৈর্য হারায়। বলে, সার আপনি না হলে···

—শুনুন, বেশ ধীর গলায় বলেন মুখার্জি সাহেব।

—হাঁ সার।

—শুধু দু জন নয়। একই বয়ানে অন্তত একশ দু'শ জনের সই স্বাক্ষর করিয়ে আনুন। সাত আট দিনের মধ্যে ?

—সাত আটদিন কী সার ? দু তিন দিনের মধ্যে আমি মাস পিটিশান লিয়া হাজির হইতেছি।

—শুধু আপনার গ্রাম নয়। স্লুইশ গেটের ডাইনে বাঁয়ে গ্রাম আছে তো ?

—আছে।

—তাদেরও নাম ঠিকানা দিয়ে সই করাতে পারলে আরও ভালো হয়···, পরামর্শটা দিয়েও যেন সংশয় জন্ম নেয় স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেবের কণ্ঠে।

—ও কিছু নয় সার। ভূপতি—, জোরে ডেকে ফেলে সীতাবাবু। পরক্ষণে বলে, শুনলে তো ? এবার কাজ বুঝে লও।

সীতাবাবু ফেরত পাওয়া দরখাস্তটা দু তিন ভাঁজে মুড়ে ছোট করে নেয়। সঞ্জয় বেরা সীতাবাবুর এমন কথাবার্তা আর বিনয়ে বিস্মিত। ভাবে, নতুন

সাহেব এতক্ষণ ধরে বকবক করল।

কাঠের সিঁড়িতে খট্‌খট্‌ শব্দ। পিছন পিছন নামে ভূপতি। মাটিতে পা ফেলে সীতাকান্ত বলে, সার আসি-ই।

—আচ্ছা। আসুন, মুখার্জি সাহেবের দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করে।

সঞ্জয় ফাঁকা টুলে বসে একবার পিছনে তাকায়। মানুষ দু জন চিলখালি ফরেস্ট অফিসের ঘাস মাড়িয়ে বিছনো ইটে পা ফেলে ফেলে অনেক দূর।

সঞ্জয় বেরা বলে, সার সুইলিশ অব্দি বন সৃজন হবে?

—নিশ্চয়ই হবে।

—তাহলে, শীতের সিজিনটা?

—আমি ভাববো। হুট করে বলে মুখার্জিবাবুর কানেই দম্ভের মতো শোনায়। তখনই শুধরে নেয়, আপনিও ভাবুন।

সঞ্জয় বেরা সাহেবের দিকে তাকায়। মুখার্জি সাহেবের চোখে ভাসে ডি এফ ও সাহেবের মুখ। একটা কৃতিত্বের সবুজ স্বপ্নাভাস। অসংখ্য সবুজের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন তিনি। হিলমিলে সবুজ।

সঞ্জয় বেরা হঠাৎ বলে, সার—সিজিনের লোকগুলো যে দরখাস্ত দিয়ে গেছিল?

—তাই নাকি! একটু থেমে সামলে নেয়, দেখাবেন তো?

(৬)

রোপণ করা জঙ্গল। গরান বাইনের গোড়ায় মাটি দিতে দিতে, কাটা মাটির সরু নালা ক্রমশ গা চওড়া হয়ে অনেক দূর। ক্রমবর্ধমান গাছপালার ছায়ায় হেঁতাল ঝুপসির চেরা পাতার ডগ নেমে গেছে নালার জলে। হাওয়ায় গেঁমুয়া বাইন দোলে। গাঙ ঘেঁষে ঝাউ গাছ লাইন ধরে। সাদা বালি হাওয়ায় ওড়ে। বড় কোটালে নোনা জল বাগদা ভেট্‌কি কাঁকড়ার বাচ্চা নিয়ে ঢুকে পড়ে জঙ্গলের ঝারা খালে। নিচু চর দিয়ে নোনা জল ঢেউ দিতে দিতে সেঁধোয় জঙ্গলটায়। জল জমে কাটা নালায় বা রূলে।, ছোট বড় ডোবা খানায়। কুঁচো কুঁচো মীন তিন চার মাসে মানুষের উপাদেয় খাদ্য ভোজ্য হয়ে, ওঠে। বাগদার ঝাঁক ভেট্‌কি মোচা চিংড়ির দাঁড়ায় নোনা শ্যাওলা লেগে সবুজ।

হাতে একখানা কাঠের ডাঁটের ছাতা। গাছপালার ধারি বাঁধা মাটি মাড়িয়ে সাবধানে হাঁটে বনবিহারী। বনবিহারী নায়েক। চ্যাপটা গাল, সরু থুতনি। কপাল ফাঁকা হয়ে মাথায় ফরফরে চুল। একটু সোজা দাঁড়াতেই গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে কাঠের উঁচু মাচায় কাঠের দেওয়ালে অ্যাজবেস্টার ছাউনি চেক —অফিস ঘর। দিনে রাতে প্রহরার ব্যবস্থা। আবার পা ফেলতেই কাপড়ের এক খুঁট হেঁতাল ঝোপের কাঁটায় লেগে যায়। এগোতে বাধা। ফলত কাঁটা আর পদক্ষেপের দীর্ঘতা একই সরল রেখায় নিয়ে আসে। কাঠের ডাঁটের ছাতাটা বগলে রেখে বনবিহারী মাথা নিচু করে হেঁতাল ঝোপের গোড়ায় রাঙি কাটার

ডগা থেকে ধুতির সরু পাড়টা ছাড়ায়। পরম যত্নে। বিশেষ মনোনিবেশে। একটু বেকায়দা হলেই তো ছিঁড়ে বরবাদ! পথে ঘাটে বেরোনর ক'খানা কাপড়ের মধ্যে এটাই আপাতত অক্ষত। সেটার উপর এমন আঘাত!

কাপড়ের পাড়টা ছাড়িয়ে কোমর সোজা করে বনবিহারী। ছাতাটা মাটির উপর লম্বাভাবে রেখে নিজের শরীরের ভার ছেড়ে দেয়। এতক্ষণের উৎকণ্ঠা খানিক কমে। গেঁমুয়া বাইনের ছায়া। ঝাউ ইউক্যালিপটাসের শাখায় পাখির ডাক। ক'খানা কালো ছিটে বক রলের জলে কুঁচো মাছের লোভে রোগা ঠ্যাংয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের একটা বিরক্ত হয়ে জলের পাঁক কাদা ছেড়ে উড়ে যায়। ডানা গুটিয়ে থপ করে বসে নোনা মাটির ঢিপিতে। বনবিহারী দেখে। সমস্ত স্মৃতি মেধা দিয়ে নজর করে। হাতের আঙুলের গাঁট গুনতে-গুনতে বনবিহারী হিসেব করে, অষ্টআশি, উননব্বই, নব্বই···। অষ্টআশিতে···। তখনও তো আমি পঞ্চায়েত মেম্বার। সেই সময়ের স্টেশন অফিসার বলেছিল, বনবিহারীবাবু—

—আজ্ঞে?

—আপনার সংসারের অবস্থা যখন এইরকম! উপার্জনের পথ ভাবুন—

—কী সার? একটু বলে সাহায্য করুন, খুব মিনতি জানিয়েছিল বনবিহারী।

—হাজার দশেক টাকা আছে?

—হাজারটা পয়সা বললে বার করতে পারবোনি, সদস্য হিসেবে সততা জাহির করেছিল।

—তাহলে আর কী উপকার করতে পারবো আমি···। স্টেশন অফিসারের মুখে নিরুৎসাহীর ছায়া।

মনে লেগেছিল বনবিহারীর। তৎক্ষণাৎ সানুনয় প্রস্তাব রেখেছিল, সার—ধার দেনা করে যদি দশ হাজ্যর টাকা যোগাড় করতে পারি?

মৃদু হেসে স্টেশন অফিসার মজুমদার সাহেব আশ্বাস দিয়েছিল, যোগাড় করুন। তখন বলবো—

···তারপর তো স্টেশন অফিসারের সঙ্গে এই জঙ্গলে আসা। বনবিভাগ থেকে মাটি কেটে লম্বা লম্বা ড্রেন। ড্রেনের দু পাশে উঁচু মাটিতে ঝাউ গরান বাইন পুঁতে পুঁতে জঙ্গলের বাইরে জঙ্গল সৃজন। সামাজিক বন সৃজন। একই জঙ্গলে পাশাপাশি বিশ পঞ্চাশ একশ দেড়শ ড্রেন। জল চলাচল। নোনা জলের বাগদা ভেট্‌কির অবাধ বিচরণ ড্রেন বা রলের জলে। প্রচণ্ড রোদ্দুরে অল্প জলে ঝাউ বাইনের ছায়া। এক নম্বর ফিশ প্লট আশি বিঘের মত জঙ্গল অংশ, দুনম্বর ফিশ প্লট একশ বিঘের মতো গাছপালা মাটি অংশ। তার পাশেরটা একশ ত্রিশ বিঘে জল মাটি। মাছ চলাচল, মাছ চাষের ক্ষেত্র। বঙ্গোপসাগরের নোনা জল সোনার মতো কুঁচো কুঁচো মীন বাগদা নিয়ে ফাল্গুন চৈত্রের কোটালে নিচু চর চড়া দিয়ে ঢোকে। জঙ্গলের গাছপালার গোড়া মাথা ছ'আট ঘণ্টা ডুবিয়ে আবার ফিরে যায়। তখন নালা, ড্রেন, খানা খন্দে ছাড়া সে জল নেই, নেই সগর্জন জলোচ্ছ্বাস। গাছপালাগুলো জলে ডুবে, জল খেয়ে রোদ বাতাসে কলকলিয়ে বেড়ে ওঠে।

কালো ছিটে বকটা তখনও নোনা মাটির ঢিবিতে বসে। বকটার দিকে তাকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে আশি বিঘের ফিশলটটায় চোখ বুলোয় বনবিহারী। পাশাপাশি 'ফিশলট'গুলো ষাট সত্তর হাজার টাকায় এক বছরের লিজ হলেও, দরদী মজুমদারবাবু আলিপুর ডি. এফ. ও. সাহেবকে ধরে মাত্র দশ হাজারে এক বছরের জন্যে লিজের ব্যবস্থা তো করে দিয়েছিল। লিজ বন্দোবস্তের দিন নগদ পাঁচ হাজার টাকা জমা দিয়ে আলিপুরের বড় সাহেবের কাছে আবেদন পত্রে আর্জি ছিল, "এখন পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া দিন। বাকি পাঁচ হাজার টাকা আমি 'ফিশলট' মৎস্যচাষের যোগ্য করিয়া আগামী তিন মাসের মধ্যে আমার স্থানীয় ফরেস্ট অফিসে জমা দিতে বাধ্য থাকিব। নতুবা সরকার আমাকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করিবেন। কোনো রকম আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।"

আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন আলিপুরের বড় অফিসার। মনে জোর পেয়ে বনবিহারী তখন কর্মী মানুষ। ঠাকুরদার আমলের সুপ্ত গৌরবধারা শরীরে জেগে ওঠে। চৈত্রের কোটালে সমুদ্রের নোনা জল সেঁধোচ্ছে সাদা বালির চর ডুবিয়ে বগড়া খাল নালা দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে। জল ঢুকছে ভ্রেন বা রলে। নানা প্রজাতির কাঁচ কাঁচ মীন। কোদাল ঝড়া হাতে লোক জন পাশে দাঁড়িয়ে। মাটি ফেলে ভ্রেন মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। সে রাতে জ্যোৎস্না। ছোট বড় গাছপালায় জঙ্গল! সদ্য নোনা জলে ভেজা মাটি, গাছপালার গোড়া। জ্যোৎস্না লেগে থাকে জল চপচপে ঘাস মাটিতে। ঝুপসি পাতায়। হাওয়া ভ্রেন ভরতি জলে সরু ডালপালার মতো ঢেউ তিরতির নাচে। ভ্রেনের জলে জ্যোৎস্না চলকায়। লোক-জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে বনবিহারী নতুন তৈরি মোনানী চালার উঠোনে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল, এক সিজিনের মাছ বেচে…গরমেণ্টের ঘরে দেনা, লোকজনের মজুরি, নতুন চালার বাঁশ বাঁখারি টালি খরচ পুষিয়ে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লাভ করতে পারবো নি! দ্বিধায় তখন নিজের লিজ বন্ধ ভ্রেন ক'খানা দেখে বনবিহারী। পাশাপাশি পাঁচ ছ'খানা জল ভরতি লম্বা-লম্বা ভ্রেন। হাতের টর্চ মেরে দেখে, হাওয়ায় জল জ্যোৎস্না কাঁপছে। কাঁপছে বনবিহারীর ভেতরটা। তাই 'ফিশলট'য়ের কাজে সব সময়ের সঙ্গী ছোকরাকে শুধোয়, হ্যাঁরা! তোর কি মনে হয়?

—কী?

—মাছ টাছ হবে?

—দেখো না তুমি। ফরেস্টারের কাটা নতুন ভ্রেন, পাশেই গাছের পাতা পোকামাকড়—মাছেরা খাদ্য পাবে। হাওয়া বাতাসও ভালো এদিকটায়—মাছ খেলবে বাড়বে।

—কত খরচ! দেনা আমার মাথায়…

জঙ্গলের গাছপালার ছায়াচ্ছন্নতায় সবে রাত নেমেছে চরাচরে। বেশ জোরে আশ্বাস দিয়েছিল নিশিকান্ত ও বনবিহারীদা—দেখো এই ফিশলটয়ের মাছ বেচে ফিরে সিজিনে আর একটা ফিশলট ডাকতে পারবে—

—থাম। এই একটাই সামলাতে আমার জিভটাকরা শুকিয়ে যাচ্ছে। আরও

একটা— ?

—আরে এখেনকার বাগদা শেয়ালে খাওয়া ক্যাঙড়া যে লণ্ডন আম্রিকার সাহেব মেমরা খেতে শিখছে। স্বাদ বুঝেছে—। তোমার লাভ হবেই।

বাণিজ্যের স্বপ্ন দেখায় নিশিকান্ত। বনবিহারী দুটো বিড়ি আর দেশলাই বের করে। জঙ্গলের গাছপালার ছত্রছায়ায় দেশলাই কাঠিটা জ্বালে। এক ঝলকে অনেক দূর আলোময়। বিড়ি টানতে টানতে নিশিকান্ত শুধোয়, বনবিহারীদা—

—বল।

—তোমার দেশবাড়ি হাওড়া জেলায়, পয়সাওলা আত্মীয় কুটুম্ব নেই ?

— থাকলে ?

—তাদের এই কারবারে লাগিয়ে দাও না। কী হবে তোমার ওই পঞ্চায়েতে সদস্য থেকে ? ও ছেড়ে দাও। শুধু লোকের মুখ শোনা ?

কথাটায় খানিক চোট লাগে বনবিহারীর। ভাবে, সত্যিই তো গরিবের কী আর উপকার করতে পারি ? রেশান কার্ডের জন্যে দরখাস্তে সই আর ধামাকুলো তৈরি করার যৎসামান্য লোনের সুপারিশ। তারপর কে জল ছেঁচা ম্যাসিন কিনবে, হাই ইয়েল্ডিং ধান চাষ করবে—কি এলাকায় রেশান ডিলার হবে, কি একখানা মুদিখানা দোকান দেবে—সে সব পুরনো বড়লোকদের ছেলেপুলেরাই আসে সই করাতে। গরিবের তো ওসব দরখাস্ত নেই। শুধু জানতে চায় গরিব মানুষগুলো, আর নতুন রাস্তা হবে নি ? মাটি কাটার লেবার লাগবে নি ? গম দিবে নি ? ক'বছরে সদস্য থেকে ছক কেটে মাস্টাররোল তৈরি করে বনবিহারীর প্রতীতি জন্মায়, তার চেয়ে এই ফিশলটটা যদি লাভের হয় সেটাই সংসারে বেশি উপকারের। সলিড ইনকাম। গাছপালার ছায়ায় বিড়ি টানতে-টানতে বনবিহারী কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে ভেবে পাশের সঙ্গী নিশিকান্তকে বলে, এবার আর ভোটে দাঁড়াবো নি।

—সেই ভালো। নিশিকান্ত সায় দিয়ে একটু খটকায় পড়েছিল, দাঁড়ালেই কি জিততে পারবে ? একই পানতা পেঁয়াজে রোজ রোজ জলখাবার ভালো লাগে ? হোক না সে চাষামজুর ? কথাগুলো সংশয়ে পাক খেয়েছিল নিশিকান্তর মনে। মুখ ফুটে বলেনি তখন। শুধু বিড়ি টানছিল নিজের মতো।

নোনা জল মাছে ভরতি ছ'খানা ভ্রেন। আশি বিঘে ফিশলটটায় চোখ চলে যায় বনবিহারীর। জঙ্গলাংশ মাটির মাছ বেচতে পারলে উপার্জন। এই জল-মাটির উপর ক্রমে ক্রমে আশ্রয়, নির্ভরতা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। সংসার আর চারপাশের পৃথিবীকে নতুনভাবে দেখে। টালির ছাউনিতে মোনানী চালা। চালার ভিতর থেকে টর্চ এনে নিশিকান্ত বলেছিল, বনোদা—রাত হয়েছে। ঘরে যাবেনি ? ফট করে সুইচ টিপতেই তিন ব্যাটারি টর্চের আলো গেঁমুয়া বাইন হেঁতাল বগড়ার জঙ্গলে। পায়ে পায়ে এগিয়ে দিয়েছিল নিশিকান্ত।···সে আজ কত দিন···। সে চালাটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নিশিকান্ত আর কাজ করে না। ফিশলট তো সে বছর বর্ষায় গাঙ সমুদ্র হয়ে গেছিল। আঠারো মিটার জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রে। বাঁধ ভেড়ি ভেঙে তছনছ। এখন

হাইকোর্টের আশ্রয়। আবেদন, "অনেক খরচ খরচা করে মাটি ফেলে বাঁধ বেঁধে ফিশলটে আমি মাছ চাষ করি। জলোচ্ছ্বাসের দরুন আমার সমুদয় ক্ষতি। সুতরাং ফরেস্ট অফিস আর এক বছর আমাকে মৎস্য চাষের সুযোগ দিক। গত সনের বকেয়া টাকা শোধ দেব। আমাকে উচ্ছেদ করলেও নতুন লোককে লিজ দিলে অমানবিক ও বেআইনি কার্য হবে। আমি একজন গরিব। পাঁচ ছ'জন পোষ্য নিয়ে সংসার করি।" হাইকোর্ট শুধু নোটিশ করেছে দপ্তরকে। এখনও শুনানি হয় নি। বিচার বের হয় নি। ফলত ফিশলট এখনও বনবিহারীর। সেই ক্ষীণ যুক্তি···আর স্বপ্নময় বাণিজ্য সম্ভাবনায় একবার ফিশলটটার চারদিকে ঘোরে। দু চোখ মেলে দেখে। আশি বিঘের মধ্যে কতখানি মাটি, গাছপালা··· নতুন করে মাছচাষের ব্যবস্থা—এসব হাত ছাড়া করতেও বুকে লাগে। যদিও সব কিছু গরমেণ্টের। রাষ্ট্রের। তবুও তো কাগজ কলমে অধিকার কিছুদিনের জন্যে বর্তেছিল! তাই হাইকোর্টের মাধ্যমে বন্দোবস্ত পদ্ধতিটা জিইয়ে রাখতে যে টাকার দরকার, সেই ভাবনায় নিজের মধ্যে উত্তাপ। পরক্ষণে অবসাদ।

হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসে ফিশলটের ড্রেনের ধস মাটির খানা খন্দ ডিঙিয়ে। তারপর তো ফরেস্টের চেক অফিসের রাস্তাটা ছুঁয়েছে পঞ্চায়েতের মেটে রাস্তায়। বনবিহারী কাঠের ডাঁটের ছাতাটা বগলে গোঁজে। প্রচুর হাওয়া। মৌসুনি দ্বীপের চারপাশের নোনা সমুদ্র অবাধে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে ছাতা খুলতে যে অসুবিধে। এত হাওয়ায় রোদ মালুম হয় না। হাঁটে। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই বলে হাঁটে।

পাকা ছাদ দেওয়াল ঘিরে প্রমাণ সাইজের জানালা দরজায় বড় সড় ঘর। কো-অপারেটিভের গো-ডাউন। হলুদ রঙের পলিপ্যাকেট ভরতি মিশ্রসার মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পর পর তিনজন। লোক তিনটের গলা বুকে ঘাম। বনবিহারী পাশ কাটিয়ে মোড় মুখো। ডাইনে বাঁয়ে চার পাঁচ খানা মেছো আড়ত। গরান কঞ্চির গায়ে মাটি লেপে ছিটে বেড়া। খান দুই চা পান বিড়ির দোকান। দেওয়ালের গায়ে এখনও লেখা, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি. সি. আই (এম) প্রার্থী ১. মনোরঞ্জন বেরা, ২. আরতি চাউলে পঞ্চায়েত সমিতিতে মহঃ ইয়াকুব আলি ও জিলা পরিষদে অনিল দাসকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করুন। তলায় এক-খানা কাস্তে হাতুড়ি তারা লাল রঙ দিয়ে আঁকা। পাশের দেওয়ালে পাঁচ আঙুল ফুটিয়ে কব্জি অব্দি হাত। হাতটার ডাইনে বাঁয়ে লেখা, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন। বামফ্রন্টকে পরাস্ত করুন।

গ্রাম পঞ্চায়েতে ১। নিকুঞ্জ দলপতি ২। কমলা মাইতি
পঞ্চায়েত সমিতিতে বীরেন্দ্র প্রামাণিক
জিলা পরিষদে নওসের শেখ।

আর একটু এগোতে ডাইনে চা-দোকানের দেওয়ালে বড় করে একখানা সাইকেল কলি চুনে আঁকা। গোটা গোটা বর্ণে লেখা, ঐতিহ্যময় সংগ্রামী এলাকার স্বার্থে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী করুন এস. ইউ. সি. (আই) প্রার্থীদের।

গ্রাম পঞ্চায়েতে ১। অধীর মিস্ত্রী ২। খয়নুর বিবি
পঞ্চায়েত সমিতিতে আব্দুল করিম
জিলা পরিষদে অনঙ্গ বাগানি।

যতই দোকান ঘর, মেছো আড়তের দেওযাল দেখে বনবিহারী, বুকের ভিতরে কুঁকড়ে হৃৎপিণ্ডটা ছোট হয়ে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট। পা ফেলে মোড়ের পাকা রাস্তায় পৌঁছতে যে কত দূরত্ব! আড়ত থেকে দু এক জন মানুষকে ঢুকতে কিংবা বেরুতে দেখলেই বুক কাঁপে। কম্পন সামলে শীত বর্ষার সাদা প্লাসটিক জুতো খটমটিয়ে হাঁটে। খট্মট্ শব্দটাই জানিয়ে দেয় বনবিহারীর উপস্থিতি। বড় তক্তাপোশের উপর মাদুর বিছিয়ে গদি। এক কোণে কাঠের ক্যাশবাক্স। বাক্সের গায়ে পিতলের হাতল থেকে শিকল টানা দিয়ে তক্তাপোশের পায়ায় বাঁধা। লম্বা মোটা সাইজের খতেন খাতায় হিসেব লিখতে লিখতে একবার তাকায় প্রদীপ জানা। ধবধবে টেরিকটনের পায়জামার উপর হাফ হাতা পাঞ্জাবি। গলায় সোনার সরু চেন। পাকা মেঝেয় ছিটে বেড়ার দেওয়াল ঘেঁষে চল্লিশ কেজি আশি কেজি খোলের বড় বড় ঝড়া উপর উপর সাজানো। কাঠের বাক্সে বরফগুলো ভুঁষি দিয়ে চাপা। কাঁচা মাছের আঁশটে গন্ধ হাওয়ার ঝলকে। খটমট শব্দে শুধু নজর করেছিল প্রদীপ জানা। খেয়াল হতেই হাঁক মারে, ওই-ও বিমল ডাক দে তো ওই ভদ্রলোককে—

লুঙি পরে কটা ঝড়ায় দড়ির জাঁক দিচ্ছিল বিমল, ছুটে গিয়ে বলে, আপনাকে ডাকে আমার বাবু—

খতেন খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একেবারে কার্ড মলাটের পরপৃষ্ঠা এসে যায়। গোলা সিঁদুরে চুবনো একখানা কাঁচা টাকার ছাপ মারা। তলায় লাল কালিতে লেখা শ্রীশ্রী গন্ধেশ্বরী মাতার কৃপায় এই কারবার স্থাপনপূর্বক.. '

—কি গো জানা বাবু, ডাক দিলেন? বনবিহারী গলা ছেড়ে জানতে চায়।

—আমাদের সম্মুখ হয়ে যাবেন···ডাকবোনি মানে? বসুন—বসুন, বলে গদির তক্তাপোশ চাপড়ে দেখায়।

পথশ্রান্ত বনবিহারী মোটা করে খড় ছাউনি আড়তের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে। বগলের ছাতা পাশে রেখে ছায়ায় খানিক আরাম। বাইরে পৃথিবী এখন রোদ্দুরে তাতছে। নোনাধুলো গরম শুষে নিজেই তপ্ত। ফলে ধুলো মাটির সংলগ্নতায় উষ্ণ ভাপ। ছায়াশ্রয়ে বসে বড় করে দম ফেলে।

প্রদীপ জানা বিড়িব ডিবে আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বলে, এবার কত ভোটে জিতলেন?

রোদে তাতে পুড়ে এসে এই প্রশ্নের মুখোমুখি। চোখে মুখে বিস্ময়। পরক্ষণে সংশয় বনবিহারীর নিজের মনে। বিড়ির ডিবেয় হাত থাকে, ঢাকনা খোলে না। বেশ অবজ্ঞায় উত্তর দেয়, ভোটে প্রার্থী হইই নি। আবার জেতা?

ছোকরা আড়তদার দ্রুত দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে মৎস্যব্যবসায়ে। বনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে বুঝে ফেলে, শুরুটা জুতসই হয়নি। তাই ঝটপট সামাল দেয়, ভালোই করেছেন। কী হবে ঘরের খেয়ে মাঠের মোষ

তাড়িয়ে ? ওর থেকে সংসার দেখা বরং ভালো।

প্রদীপের কথায় সংশোধন টের পেয়ে বনবিহারীর গরম কমে। তখন পুরু করে খড় ছাউনি আড়তটাকে ছায়াময় মনে হয়। বিড়ির ডিবের উপর বাঁ হাতের তালুটা চেপে। প্রদীপের নজরে লাগতেই সানুনয়ে বলে, কই বিড়ি খাবেন নি ?

ডিবের ঢাকনি খোলে, দেশলাইয়ের খোলটা ঠেলে ভালো বারুদের কাঠিটা ঠুকতেই ফস করে এক ঝলক আগুন। বিড়ির ডগা পুড়ে লাল।

পঞ্চায়েত ভোটে বনবিহারীর অনাগ্রহে প্রদীপ খুশি। বলে, সদস্য থাকায় ফিশলটটা তবু করেছিলেন ? খানিক ঘনিষ্ঠ হয়ে শুধোয়, এবারে ফিশলটয়ে কাজ শুরু হবে ?

রুষ্ট হতে গিয়েও চকিতে মনে হয় বনবিহারীর, পয়সাওলা আড়তদার ছোকরাটা আমাকে ফিশলটয়ের মালিক হিসেবে তো মূল্য দিচ্ছে ? পঞ্চায়েতে সদস্য নেই ফিশলটটা তার আশ্রয়। খালি পকেট প্রায় নিঃস্ব। বিড়িটায় মন দিয়ে দম মারে পর পর। একদম মুখোমুখি থেকেও আড়াল প্রায় মাত্র এক চিলতে শুখো মশলা আর তামাক পাতায়।

শীত বর্ষায় সাদা প্লাসটিকে পা ঢাকা নিউকাট জুতো। সাবধানে খুলে তক্তাপোশের উপর আরামে বসে। পরে বলে, ভাবছি কাজ চালু করবো।

—তাহলে এ সিজিনের বাগদা মোচা চিংড়িগুলো, আমি পাবো ?

বুকের মধ্যে সুযোগের ঢেউ ধাক্কা মারে। ব্যবসার কথা···অ্যাডভানসড্ এগ্রিমেণ্ট···কিন্তু আশি বিঘের ফিশলট যে কলকাতা বিধান সভার ওপাশে চারখানা সুঁচলো মিনারের সর্বোচ্চতায় টাঙানো স্বাধীন ভারতের পতাকাওলা লাল ঘরটায়। জ্ঞানগুণী ভারী ভারী চেহারার বিচারকদের বিবেচনায়। সেই বিবেচনা বের করে আনতে যে কত কালো গাউন মুহুরি ল'ক্লার্কদের স্তর কাটিয়ে বড় বড় নোট খরচ করতে হয়। ফাঁকা পকেট অথচ বাণিজ্যের কথা··· অর্থাগমের খাল কাটা। তাই একেবারে বোকাসোকা না হয়ে বনবিহারী বলে, সাত মাইলের আড়তদার গিরিবাবুও বলছিল বাগদার কথা—

প্রদীপ সওদা বিপন্নতার আশঙ্কায় চমকে ওঠে। হঠাৎ চেঁচায়, সে কি, এটা তো দশ মাইলের বাজার ?

—হাঁ। উত্তর দেয় বনবিহারী।

—এইখানকার ফিশলট। আর বাগদা যাবে আমার সম্মুখের রাস্তা দিয়ে ? আমি পাবো না, মানে ? আপনি কি আমার কাছে নগদ দাম পাবেন নি ? নাকি, আমার পয়সা বাজারে বিকোয় না ?

কথার সুরে খানিক শাসানি আবার বিনয়। বনবিহারী রসিয়ে রসিয়ে বিড়ি টানে। ফাঁকা পকেট, কোর্টবন্ধ ফিশলট। অত বড় আড়তদার প্রদীপ কেমন অনুগত হয়ে যাচ্ছে। বনবিহারী ভাবে, কিছু নগদ টাকা অগ্রিম চাইলে হয়—? আবার ভাবে, কোর্ট থেকে ফিশলট বের করে আনতে তো ছ'মাস কি ন'মাস—তার কিছু ঠিক নেই। বড্ড খেলো হয়ে যাবার ভয়। এই রাস্তায় দরকারে অদরকারে যাতায়াত করতেই হবে। না করাটা কি ভাল হবে। অনেক

ভেবে চিন্তে বনবিহারী পাকা ভেড়ি মালিকের মতো বলে, ঠিক আছে। আবার তো আসবো ? পরে কথা হবে—

প্রদীপ বলে, কথা তো হ'ল। আবার কেন গো বাবু ?

বনবিহারী হাসে, হাসে প্রদীপও। বনবিহারীর কাছে হাসিটা আড়াল, প্রদীপের হাসিতে প্রতিষ্ঠা।

(৭)

দুই বুড়োয় বিড়ি টানতে টানতে বেড়া ঘেরা গেটের ওপারে। মমতা দাওয়ায় বসে খুঁটির গায়ে ঝুলনো জালটাকে পায়ের আঙুলে চেপে রাখে। নাইলন সুতোয় নতুন জাল। কাঁচের চুড়ি দু-গাছি মাঝে মাঝে বাজনা তোলে। হাতের ফলতে ঘুরিয়ে এক আঙুল পরিমাণ ছোট ফাঁসের জাল বোনে। পেছনে পলি-পেপার বিছিয়ে আট ন বছরের মেয়ে রুমা সুমা শ্লেট পেতে অ আ, এক'য়ে চন্দ্র দুই'য়ে পক্ষ লেখে। গেটের বেড়া ঠেলে ঢুকতেই শব্দ। বাচ্চা মেয়ে দুটো পড়া থামিয়ে প্রবেশকারিকে দেখে। মমতা একবার নজর করে আবার ফলতে ঘুরিয়ে ছোট সাইজের ফাঁস বুনে যায়। মোটাসোটা যুগল দাস ঠোঁটের বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে বেশ হাঁক ডাকেই বলে, মমতা কত ভোরে উঠস্যে গো। কামে লাগ্‌ছে। অর দাদা আঙ্গাবে আর কামে রাইখ তো নো ?

মমতা রঙিন কাপড়ে ব্লাউজ ঢাকে। মৃদু হাসিতে রমণী হয়ে যায়। দুঃখী মুখে বলে, পিসা মহায়—আপনাগো হাত কত সূক্ষ্ম পিসামশাই—

যুগল দাস ভারী শরীরে পা থপথপিয়ে হাঁটে। মমতার উদ্দেশে বলে,—মিন্টু—? পরক্ষণে জানতে চায়, তোমাগো চা খাওয়া হইস্যে—

—হুঁ। খাইবেন আপনে ?

—না। কাম ধরুম। বেলা হইস্যে—

কথাটা কানে যেতেই মমতা দাওয়ায় খুঁটির পাশ দিয়ে গাছপালার মধ্যে আকাশ দেখে। আকাশের মেঘ নয়। রঙ কারুকার্য নয়। সূর্যের কিরণে মেঘ গাছপালা ছিঁড়ে যতটা রোদ্দুর চোখে পড়ে। রোগা ফরসা মুখে দু চোখ ক্রমশ শাণিত হয়। দাদা মিন্টু দাসের সংসারে থেকে দাদার উপকারে লাগতে দ্রুত ফাঁস বোনে। সারাদিনে এই সুতোগুলো কাজে লাগিয়ে জালটা বুনে একটা যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সদ্য ব্যস্ত ছটফটে দাদা একবার যদি জালে হাত দিয়ে ফাঁসগুলো টেনেটুনে দেখে বলে, মমতা দেহি—। খুশি হয়ে চেঁচাবে, মা—উকে সিনিমা দেহার পয়হা দিবে তো—।

ধীরু দাস দাঁড়িয়ে। যুগল বলে, কোন্ গুলা সারাইতে হইবে ?

মিন্টু যুগল দাসের দিকে তাকায়। এগিয়ে যায় চাঁচের বেড়ার পার্টিশানের দিকে। ওপাশে দাদার ছেলেমেয়ে নিয়ে বসবাস। বেড়ার গায়ে সানমাইকা বসানো ছ'সিটের একখানা বড়সড় ডাইনিং টেবিল। টেবিলের উপর এক বোঝা ছাদি জাল। খয়েরি রঙের সুতো। নিজেই টানতে গিয়ে মিন্টু দাস একবার

রোজ মজুরিতে সারাইওলা লোক ধীরু দাসের দিকে তাকায়। মিন্টু দাস কারবারি। মালিক। মালিক নিজেই বোঝাটা টানছে আর কর্মচারী মজুরটা শুধু দেখছে? মিন্টু দাসের মেজাজ গরম হয়ে যায় সকালবেলায়। তখন ট্রলারের ম্যাসিনম্যান সারেঙ ছোকরা ফুলপ্যান্টের উপর লাল খয়েরি জমকালো প্রিন্ট করা ফুল হাতা চাইনিজ শার্ট পরে হাজির। ছোকরা ছেলে। কালোর উপর রোগা চেহারা। মাস গেলে এগার'শ টাকা মাহিনা। কাজ থাক আর না থাক।

—মেঝদা আছেন? বলতে বলতে মমতার সামনে দিয়ে ঘরের দাওয়ায় ওঠে।

—কিরে? কী খবর? মিন্টু দাস ডাইনিং টেবিলের উপর জালের স্তূপটা টানা হ্যাঁচড়া করতে করতে বলে।

পিসেমশায় যুগল দাস বুড়ো শরীরে এগিয়ে যায়। বলে, ছারো। আমি দেহি—ওগো সঙ্গে কথা কইয়্যা লও।

মিন্টু দাস জাল ছেড়ে দিয়ে মেসিনম্যান নন্দর কাছে যায়। বলে, কি?

—পাইপটার ফুটা সারাই হইস্যে। পঞ্চাশটা টিয়া দ্যান—

পঞ্চাশটা টিয়া। মানে পাঁচটা দশটাকার নোট কিংবা দশখানা পাঁচ টাকার নোট। মাত্র একটুখানি ফুটোর জন্যে। ভাবতে ভাবতে এই সকালবেলায় চেঁচিয়ে ওঠে, সারাইওলাকে আমার কথা বল গই। বিয়ালে দেহা করুম। হেতারে কোবি পাইপটা দিয়া দিতে। আর দুফারে ট্রলারে থাকবা। পোলা-পানেরা পাটস্ চুরি করে লই যায়—

ধীরু দাস ঘাড়ে করে জালের স্তূপটা নিয়ে বেরোয়।

ইট বিছনো রাস্তার পাশে যতীন দাসের নতুন খরিদা জমি। পুকুর কেটে মাটি ফেলে জায়গাটা উঁচু। আগামী সনে নতুন বাস্তুর ভিত পুজো হবে। যেহেতু প্লটটা এখনও ফাকা, আট দশ ঘর কারবারি জেলের জাল সারাই চলে। এখন তো চারদিকে ধান চাষ। তা না'হলে চলাচলের রাস্তাটাই যা ফাঁকা। বাস্তু পুকুর গাছপালা নিয়ে জমজমাট জেলে পল্লী। যার উঠোন একটু ফাঁকা সেখানেও জাল চলে। বোনা চলে।

আস্তে আস্তে জালের বোঝাটা ঘাড়ে বয়ে দাওয়া পেরোয় ধীরু দাস। ঘরের আড় কাঠে গোছানো জাল বোনে। সেটাকে বাঁচিয়ে উঠোনে পা রাখে। যুগল দাস বলে, মিন্টু—

—কয়েন গো পিসা মহায়?

—নতুন লাইলন সুতা? জোড়াতালির কাম তো—

মিন্টু দাস হুটপাট করে ওপাশের দাওয়ায় যায়। প্রায় দেড়'শ গ্রামের মতো সরু নাইলন সুতো আর ফলতে দু খানা যুগল দাসের হাতে ধরিয়ে বলে, এই নিয়েন—এই সব।

মাত্র একখানা মুলি বাঁশের বেড়ায় দাওয়া ঘিরে দু ভাগ। ও ভাগে বড়দা সুষ্টি দাস। একটু লম্বা, গায়ে মাংসে ফরসা মানুষ। মাথার চুল খানিক পাতলা। সুষ্টি দাসের বাচ্চারা ফালি বারান্দার মাটিতে চাটাই পেতে পড়তে

বসে। বাচ্চারা বই শ্লেট খ্বলে চেঁচায়, মা ক্ষ্বদা লাগছে। আঙ্গারে খাইতে দাও—

মিন্ট্ব দাস শ্বনে থমকে যায়। এই ক্ষ্বদার জন্যেই তো নোয়াখালি চট্টগ্রাম ছেড়ে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের নিম্নভূমিতে। সেখানে ব্রহ্মপ্বত্র এখানে বঙ্গোপসাগব। ম্বজিব ডাক দিল স্বাধীন বাংলাদেশ···ইয়া-ইয়া খান আর টিক্কা খানের শাসন দমন···সে-দেশের মাটিতে জন্মে সে দেশ ছেড়ে তো অন্নের জন্যে···নিজেদের পোলাপানকে বাঁচাবার জন্যে এই ভিন দেশ···পরদেশ···। কোনো পাহাড় পর্বত নয়···বড় নদীনালা নয়। শ্বধ্ব কাগজের উপর আঁক কেটে দেশ ভাগ। জীবন ভাগ···জীবিকা ভাগ···।

বাচ্চারা আবার বলে, খাইতে দিবা না ?

মা বলে, দেহি, খাওনের কী আছে বাড়িতে ? ফরসা ম্বখে গোলগাল চেহারায় বউদির কণ্ঠ শ্বনতে পায় মিন্ট্ব দাস। পরপর দ্ব তিন বছর লস খেয়ে বড্ড জব্দ দাদা স্বৃষ্টি দাস। কেমন নাদ্বস-নাদ্বস শান্ত ভোলানাথ চেহারা। বাচ্চা-কাচ্চাদের মা হয়েও তো বউদি। বাড়ির প্রথম পরনারী। তার হাতেই কৈশোরের অনেক দায়। থালা বাটিতে খাদ্য খাবার সাজিয়ে গোটা সংসার পরিচর্যা করতো ওই সদ্য কিশোরী বউটি। বয়েস বেড়েছে দাদার, বয়েস পেয়েছে বউদি। দাদাটা চন্দননগরের মহাজনদের কাছে ঋণ বন্ধ। ট্রলারটা সারাই করে কাজের যোগ্য··· ব্যবসার যোগ্য করে তুলতেও অক্ষম। শ্বধ্ব ভাবে, বসে বসে ভাবে দাদাটা··· বিভ্রান্তগ্বলো ক্রমে ক্রমে মিন্ট্বর মমতায় সংলগ্নতা পেয়ে দ্ব তিন বছরের ধারাবাহিক হয়ে ওঠে।

বাচ্চাদের মা বাটি ভরতি পানতা সাজিয়ে পেঁয়াজের খোসা ছাড়ায় তখন বই শেলট ফেলে রেখে রান্নাঘরের উদ্দেশে দৌড়ায়। বাচ্চাদের কচি পায়ের ধাক্কায় একই ঘর দাওয়ার মাটি মেঝে দাপে। বারান্দার কোণে তক্তাপোশে ক্লাস সিক্সে পড়া নিজের বড় ছেলেটা খাতা বইপত্তর নিয়ে বসে গেছে। লেখাপড়া জানা কারবারি ছোকরা নির্মল দাস বলে, আমরা তপশিলি শ্রেণী···গরিব বড়লোক সব রকম আছি। অন্তত বাড়ি পিছ্ব একটা ছেলেকে যদি শিক্ষিত করতে পারি তাহলে একশ ঘরে একশ ছেলে শিক্ষা পাবে ? বড় ছেলেটাকে দেখে আর নির্মল দাসের কথাগ্বলো মনের মধ্যে ভাঁজে ভাঁজে নাইলন জালের লাট খোলার মতো খোলে মিন্ট্ব দাস।

দাওয়ায় মোড়া পেতে বসে ম্বড়ি তেল পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কায় সকালের টিফিন সারে মিন্ট্ব দাস। মাছের কারবারে খাতা লেখা হিসাব রাখার ছোকরা জলধর, মাস্টার নামেই পরিচিত। কামানো গালে কানের উপর থেকে জ্বলফি চেঁচে গোঁফ অব্দি ম্বড়নো। ফরসা চেহারায় ট্বসকনো গাল গণ্ড। চেক ল্বঙির উপর কলার দেওয়া ঝলমলে গেঞ্জি। দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে ম্বখের ফেনা ফেলে গেটের বেড়ার ধারে। মমতা জাল বোনা ফলতে থামিয়ে জলধরকে দেখে। ফরসা ঘাড় পাট করে আঁচড়ানো চুল, গেঞ্জির হাতা পার হয়ে প্বর্বালি য্ববক। শক্ত দ্ব বাহ্ব। নরম হৃৎপিণ্ডের চওড়া ব্বক। মমতা প্বর্ষ হারিয়ে পরপ্বর্ষ দেখে

গোপন চাহনিতে। দাদার সংসারে ভাত জোটে…একলা দেহের জন্যে আর একটা আহ্লাদের দেহ জোটে না। মেয়ে দুটোকে নিয়ে যত্ন আদর করেও যে নিজের জন্যে পেতে ইচ্ছে করে…। মমতার ফাঁস বুনতে দেরি হয়। হাত চালাতে ইচ্ছে হয় না। অতখানি রাত একলা কাটিয়ে যুবক জলধরকে দেখে দেখে কাটাতে ভালো লাগে। সকালটুকু দিয়ে রাতের একলা দীর্ঘতা ঢাকতে বাসনা হয়।

জলধর ব্রাশ ঘষতে ঘষতে মিন্টু দাসের কাছাকাছি। তখন উঠোনে কৃষ্ণ দাসের সমাধি তুলসি-মঞ্চে খান দুয়েক চড়াই কিচির মিচির বিবাদ করে। ভাদ্র শেষের আকাশে হঠাৎ মেঘ। রোদ মুছে পুবে কালো মেঘ ভাসে।

—ও জলধর শুনো।

জলধর দাওয়ার বাইরে ছাঁচ রেখায় দাঁড়ায়।

—বিধানবাবুর আড়তে কাল গেসিলা?

—হ্যাঁ।

—ইলিশের বিল মিটাইস্যে।

—না। এহনও একশ দশ কেজির দাম বাকি।

—বিধানবাবু আছে? সরকার বাবু—?

—দুই জনাই ছিল।

—বিলের টাহা দিবা না তারা?

—কইস্যে আজ দিবে।

মিন্টু দাস মুড়ির শেষ গালটা মুখে পুরে চিবিয়ে নেয়। দু হনু জেগে ওঠে, গালটা খানিক চাপা, চোখ দুটো চকচকে। গালের মুড়ি পেঁয়াজ বাগে এনে বলে, ইসাবের ছিলিপ খান দাও। অন বিধানবাবুর আড়তে যামু—।

হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। গাছপালা দুলে ওঠে। দাওয়া থেকে বেরিয়ে আসে মিন্টু দাস। উঠোনে দাঁড়িয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখে। গুম গুম শব্দ। মেঘ ডাকে। মিন্টু দাস বাস্তুর মাটিতে দাঁড়িয়ে চলে যায় গঙ্গাসাগর মোহনায়। জল কলরোলে ভীষণ বিস্তার। নোনা জলে ইলিশের জাল বিছিয়ে নৌকো ভাসছে। ট্রলার দাঁড়িয়ে। মাছ উঠলেই জাল ছাড়িয়ে ট্রলারের আইস বক্সে ঢালবে। মেসিন স্টার্ট দিয়ে দ্রুত গতিতে সমুদ্র গাঙ পেরিয়ে ঘাটে আসবে। তারপর তো ম্যাটাডোর, তিন চাকা ভ্যান রিকশা হয়ে আড়ত। শেষে লরি ভরতি হয়ে কলকাতা শেয়ালদায় চালান। মেঘ ডাকে। বুকের ভেতর কাঁপে মিন্টু দাসের। ট্রলার নৌকো জাল লোকজন যে গাঙ মোহনায়, বেশি ঝড় জল হলে তো সব বরবাদ…। যতদিন না শীতের সিজিন আসে, এইভাবে কিছু ইলিশ মেরে তো সংসার খরচ? ট্রলারটাকে কাজে লাগানো? শেষ ভাদ্রের সকালে ঠাণ্ডা হাওয়া। বৃষ্টির তোড়-জোড়। গুম গুম মেঘের ডাক। বিপন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে মিন্টু দাস। জলধর সাদা কাগজের উপর "রাধা গোবিন্দ ফিশ ট্রেডারস্" ছাপা চালানটা মেলে ধরে। নিজের স্বল্প বর্ণবোধ দিয়ে হিসেবটা দেখে ঃ

ওঁ মা

রাধা গোবিন্দ ফিশ ট্রেডার

সাং— কালীনগর, কাকদ্বীপ

প্রো ঃ— মিহিরকুমার দাস

চালানকারির নাম— শ্রী মিন্টু দাস

ক্রমিক নং ৩১৫

তাং— ১০/৮/৫৩

মাছ	কেজি গ্রাম	দর	টাকা	পঃ
ইলিশ	১২০ কুইন্ট	২৫ কেজি	৩০০,০০০	০০
৺বৃত্তি—				˙১২
হিসাব আনা—				˙২০
দান—				˙৫০
কমিশন—				১৫,০০০˙০০
মুটে—				৬৭৫˙০০
মাছ ঘাট জমা—				১২৩˙০০
কয়ালি—				˙২৫
				১৫৭৯৯˙০৭

মোট ওজন—	১২০ কুই
ফেরত কমিশন	
খোরাকি মাছ—	১৫
বরফ—	৬০
পাতা	×
নগদ—	×
মোট—	৭৫
মোট দাম—	৩০০,০০০˙০০
বাদ খরচ—	১৫৭৯৯˙০৭
	২,৮৪২০০˙৯৩
বাদ—	৭৫˙৯৩
পাওনা—	

স্বাক্ষরকারি—বিষ্ণুপদ সরকার

রাধাগোবিন্দ ফিশ ট্রেডার্স-এর ফর্দটা একবার দেখে নিয়ে দু ভাঁজ করে পকেটে রাখে। চামড়ার চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে ঝকমকে লুঙির উপর ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট চাপিয়েছে। পকেটে একখানা চিরুনি আর ডট পেন। ভেতর

পকেটে ক'খানা পঞ্চাশ টাকার নোট আর খুচরো চার পাঁচ টাকা।

গেটের দিকে পা বাড়ায় মিন্টু দাস। মমতা জোরে জোরে ফলতে চালায়। ভেতরের কাঠিতে জমানো নাইলন সুতো পাক দিয়ে গিঁট মারে। বরফি আকারে ফাঁস। ইলিশের জাল তৈরি হয়। বাঁ হাঁটু মাটিতে পেতে ডান হাঁটু খাড়াই। রাঙন শাড়িতে মোড়া পা গা বুক ভাঁজ খেয়ে বুনন মুদ্রা।

সামনেই নিরঞ্জন দাসের টালি ছাউনি ফুঁড়ে টিভির অ্যান্টেনা। বড় বড় বাঁশের মাচায় ছাউনি করে ছাঁদি বেঁউতি জাল গুছানো। মোটা মোটা ফাঁপা বাঁশ জল রোদ থেকে বাঁচাতে ছাউনি তলায় সাজানো। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। মাটি ফেলে চওড়া রাস্তা। বাঁ দিকে বাঁক দিতেই আম ডালিমের তলা দিয়ে প্রবেশ পথ। আকাশ কালচে। রোদ মুছে ঠান্ডা ঠান্ডা। টানা পাকা দেওয়াল, পাকা ছাদের দালান। প্লাসটার হয় নি ভিতর বাহির। দাওয়ায় চওড়া তক্তাপোশ। উঠোন থেকে তিন ধাপে সিঁড়ি। দাওয়ায় উঠে হাঁকে, নির্মলদা আছো?

—হাঁ।

—যাবা?

—কই যাবা?

—বাজারে? আরতে?

খরচ খরচার হিসেব করছিল নির্মল। লম্বা চেহারা। লম্বাটে ভরাট মুখ। কপাল চওড়া হয়ে কালো মুখে যৌবনশ্রী। অল্পসংখ্যক চুল খসে ব্রহ্মতালু ফাঁকা। মোটাসোটা চেহারায় শক্তিমান পুরুষের আদল। ট্রাউজারের দড়ি জম্পেশ করে বাঁধতে বাঁধতে চেয়ার সরিয়ে বাইরে আসে। বলে, এ্যাহন?

পাশের ঘরে টিভি চালিয়ে আনাজ কাটে বউ। রঙিন টিভি। মেয়েগুলো বঙচঙে ওড়না চুড়িদার পরে বুক ঝুঁকিয়ে নাচে! কোমর পাছা প্রকট করে দোলায়। সঙ্গী পুরুষটা উদ্ধত বুক বাঁচিয়ে মেয়েটার গলার নলিতে চুম্বন করে। শরীর পেঁচিয়ে মনোরম ঘনিষ্ঠতায় উপভোগ্য দৃশ্য।

—বইয়ো বইয়ো, বলেই ঘরের ভিতর ঢোকে নির্মল। সাদা ট্রাউজার পরে খালি গায়ে ডাকাত গুন্ডার ছাঁচ।

পাশের ঘরে নজর পড়তেই মিন্টু দাস এগিয়ে যায়। বলে, বউদি—কিয়া রাঁধবেন গো?

বউদির হাতে আনাজ কোটা থেমে গেছে দৃশ্যের মোহে। মগ্নতায় হঠাৎ আঁচড়। মনে হল কেউ ডাকছে। ঘাড় ফেরায় বউদি। বলে, ও আপনে? কখন আয়ছেন?

গায়ে হাফ হাতা পাঞ্জাবি গলাতে গলাতে নির্মল দাস বলে, মিস্টুবাবু কাল যে ফরেস্টারের সঙ্গে দেয়া হইছিল।

মিন্টু সাগ্রহে জানতে চায়, কোন্ আনে দেয়া হইছিল? ফরেস্ট অফিসে গেছেন নি?

—দুর অ। কাকদ্বীপে ডিলাক্স স্ট্যান্ডে ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে দেয়া হইছিল। কথা কইল না।

তিন ধাপের সিঁড়ি ভেঙে উঠোনে নামে মিন্টু দাস আর নির্মলবাবু। উঠোন পাড়িয়ে আম ডালিমের ছায়াতলা দিয়ে ইট বিছনো রাস্তায় পা ফেলে দুজন। রাস্তাটা এঁকে বেঁকে সোজা বাস রাস্তা মুখো। যেতে যেতে মিন্টু দাস ভীষণ উৎকণ্ঠায় শুধোয় নির্মলকে, জিজ্ঞান নো আমরা দরখাস্ত করছি যে গত সনে ?

—কথাই কইল না···, বেশ ব্যথিত গলায় বলে নির্মল।

নির্মল দাস অমন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান মানুষ। তার গলার স্বরে কুণ্ঠা, চোখে মুখে অপমান যাতনা। সব কাজের সঙ্গী বিশ্বাসী। মিন্টু দাস নির্মলেব মনোকষ্ট কমাতে বলে, ফরেস্টারটা ধুরন্দর। বেশি লেহা হড়া জানে তো ? বেশি পাজি—।

(৮)

সিমেন্টের চাতাল করে বটগাছের গোড়া বাঁধানো। শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে ঝুপসি ছায়া বটতলায় এই সকালেও। বনবিহারী থমকে দাঁড়ায় বটের ছায়ায়। সারা রাত হিম পড়েছে একটু একটু। ভাদ্র পার হয়ে আশ্বিনের রাত। ফলে পায়ে পাড়ানো ঘাসের ডগাও ভিজে ভিজে। সস্তা হাওয়াই চটির তলা ভিজে ধুলো ঘাসে ভারী। বনবিহারী হাওয়াই চটির তলা হালকা করতে ঘন ঘাসে চেপে চেপে ঘষে। সামনে জল চলাচলের জন্যে বড় হিউম পাইপ। পঞ্চায়েত পেতে দিয়েছিল আড়াআড়ি। মাথা ঝাড়ানো এক গুচ্ছ ধান চারা হাওয়ায় মাঝে মাঝে ডগ দোলায় হিউমের বড় গোলাকার প্রান্তে। রাতের হিম মাখা ডগ হিউমের গায়ে ভিজে রেখা আঁকে।

জুতোর তলা সাফ করতে করতে বনবিহারীর চোখে পড়ে চারা গুচ্ছের নাকানি চোবানি। হিউম পাইপটায় ভিজে রেখা মনের মধ্যে আঁচড় কাটে, এই হিউম পাইপটা যোগাড় করতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে কতবার যে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছিল। সেই থেকে তো পশ্চিম পাড়ার সদস্যর সঙ্গে খটাখটি ?

কথাগুলো স্তরে স্তরে জেগে ওঠে। একলা মনে করতেও একটা মর্যাদা বুকের মধ্যে টলমল ভাসে। চকিতে সেটা টুপুস করে তলিয়ে যায় এবার পঞ্চায়েতে তো আর প্রার্থী করে নি ? যত দোষ শুধু শুধু ফিশলটটার। সেই ফিশলট তো নোনাজলের ধাক্কায় জীর্ণ···কোর্ট কাছারির দড়ি শিকলে বাঁধা। কী হল ফিশলট করে ? একুল-ওকুল গেল। গেল বলেই তো হাত শুকনো। শুকনো হাতে জীবন চালানো যে দায় ? তাই রাম প্রামাণিকের দোরে ছোটা। এক সময় বোটের কারবারি। সত্তর আশিখানা ছোট বড় বোট ডিঙি। ধান চাল বইতো, জঙ্গলের কাঠ বইতো, এপার-ওপার ফেরি টানতো, হিজলি রসলপুর হাওড়ায় প্যাসেঞ্জার নিয়ে যেত। তখন বাস ম্যাটাডর কোথায় এইসব নদী নালার দেশে··· ?

চারখানা পাপড়ি ঘনবন্ধ হয়ে বড়-বড় হলুদ ফুলে গাছটার শাখা প্রশাখা ভরতি। গোড়া মোটা হয়ে মাঝারি সাইজের ক'খানা ডালপালা। পানপাতার মতো মোটা মোটা পাতা। হাওয়ায় সড়সড় শব্দ। চেরাই করলে এই হাবলি গাছের কাঠ টকটকে লাল। ভারী আর ভীষণ শক্ত। ঘুণ আসে না। হলুদ ফুলগুলো রোদ পেয়ে পুজোবাড়ির হলুদ কাগজ মোড়া বাল্বের মতো জ্বলে। গাছ লাগোয়া খড় ছাউনি বিশালাক্ষী থান, ফুলের আভায় ঝিলমিল করে।

বাঁখারি বাতার গায়ে পেরেক মেরে বড় বড় ফাঁকের দরজা। ভেতরে ঘুমন্ত শিবের বুকে পা রেখে দু হাতে কালী। লোল জিহ্বা নয়। নিখুঁত শান্ত মূর্তি। পাশে গাধার পিঠে শীতলা ও পাশে হাঁসের পিঠে বসে মনসা। মেটে দাওয়া মেঝেয় বিশালাক্ষী থান। হাওয়ায় দু একখানা বাসি হাবলি ফুল খসে পড়ে খড়ের ছাউনিতে।

বনবিহারী হাঁটিতে হাঁটতে পঞ্চায়েতের বিছনো ইটের রাস্তাটুকু শেষ করে। তারপর তো তলস্ত মাটির পর শিরদাঁড়ার মতো ছুঁয়েছে বাঁধটা। ক্রমশ ঢালু হয়ে উঁচু। হঠাৎ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস রুখতে যেন মাটির পাঁচিল।

অতি সাবধানে হাওয়াই চটি সামলে বাঁধে উঠে ডানদিকে তাকায়। বাঁধ ধরে বরাবর গেলে তো রাম প্রামাণিকের বাড়ি। এক সময়ের বোট ব্যবসায়ী। বাঁধ ঘেঁষে হেঁতাল বাইন গরান গেঁমুয়ার ঝোপ। মাঝে মাটি কেটে নোনা জলের নালা। দু'শ কুড়ি বিঘের ফিশলট। পঞ্চাশ হাজার টাকায় লিজ নেওয়া ফরেস্টার থেকে রামবাবুর। বাঁয়ে তাকাতেই বালিস্থানের কালী। একটু চোখ চালাতেই মালবাবুর আড়ত, টিউকল বালির উপর। ক'জন লোক লম্বা লম্বা ঝাউ চারা মাথায় নিয়ে হাঁটে। অভ্যাস মতো মনে ভাবে, কেউ বোধহয় চুরি করে জঙ্গলের ডালপালা নিয়ে যাচ্ছে। জ্বালানি করবে। কিন্তু···কোদাল হাতে দুজন, জলের কলসি, চারা গাছের ঝোপ···ফুলপ্যান্ট গায়ে গেঞ্জি আর রোদ বাঁচাতে কপাল আটকানো টুপি। বিব্রত নিজের কাছে। কী যে করা উচিত। ভেবে পায় না বলেই একবার ডাইনে খানিক হেঁটে রামবাবুর বাড়ি মুখো। খানিকপথ হেঁটেই ফিরে আসে। দেখে···নিখুঁতভাবে নজর করে, লোকগুলোর কাণ্ড কারখানা···। সংশয় দানা বাঁধে। চার পাঁচ জন লোক। মালবাবুও দু'একবার পাক খায়। লোক ক'জন চারা গাছ নিয়ে বালি ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে বালিস্থানের নুড়ি পাথরের কালীর সোজাসুজি। আঁৎকে ওঠে নিজে। পায়ের চটি খুলে রাম প্রামাণিকের ফিশলটে কাটানো ড্রেনের ধারি বেয়ে হাঁটে। জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটে।

বাইন গাছতলায় বড় পাথরের গায়ে সিঁদুর লেপা কালী। সোজাসুজি সাদা বালিচর। কচ্ছপের পিঠের মতো ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে ধবধবে সাদা মিহি বালি। সাধারণ জোয়ার কিংবা সাঁড়াসাঁড়িতে ডোবে না। দ্রুত হেঁটে বনবিহারী পৌঁছয়। দেখে দেড় দু ফুট ঝাউ চারার বোঝাটা রোদ মাখা বালিচরে পড়ে। পিছনে তাকায় একবার, দেখে, আড়াই তিন ফুট করে উঁচু ঝাউগাছ মালবাবুর কলতলার পাশ দিয়ে সোজা চিলখালির ফরেস্ট অফিস। লোক ক'জন দাঁড়

ফেলে লাইন তৈরি করে। কোদাল মেরে গর্ত তৈরিতে উদ্যোগী—তখনই বনাবহারী বলে, আপনারা কারা ?

ফুলপ্যাল্ট কলার দেওয়া গেঞ্জি গায়ে ধরণী বলে, আমরা ফরেস্ট অফিসের লোক—

বনবিহারী শুনে বলে, চরে গর্ত খুঁড়ছেন কেন ?

—গাছ পোতা হবে।

—থামুন। একটা গাছও বসবে না এখানে—, ধমকের স্বর।

—মানে। রেঞ্জার সাহেবের অর্ডার…

—হোক অর্ডার। চরের এই পনের ষোল বিঘে প্রাইভেট ল্যান্ড।

—কার ? কে মালিক ? গ্রুপ ডি ফরেস্ট গার্ড ধরণীও গলা চড়ায়। সে তো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম হলেও প্রত্যক্ষ অঙ্গ।

—মালিক ওয়ারিশান সূত্রে আমি।

—কাগজপত্র আছে ?

—নিশ্চয়ই। না থাকলে আপনাদের বাধা দিতে পারি ? দশের দুই ধারার মতে নোটিশ করেছিল মহকুমা আধিকারিক। দেখবেন ? নিয়ে আসব ?

ধরণী চুপসে যায়। দশের দুই ধারা জিনিসটা যে কী তাই ভেবেচিন্তে বলে, ঠিক আছে। আপনারা কাগজপত্তর নিয়ে ফরেস্ট অফিসে যাবেন। রেঞ্জার সাহেব…স্টেশন অফিসার আছেন তাঁরা কী বলেন দেখুন ?

উপরে রোদ নিচে বালি তেতে গরম। বোঝা বাঁধা ঝাউ চারাগুলো রোদ পেয়ে নেতিয়ে যায়। বাঁয়ে দেখে, ডাইনে তাকায়…আড়াই তিন ফুট করে রোগা রোগা ঝাউগাছ বেড়ে উঠেছে। মালবাবুর আড়তের গা ছুঁয়ে সারি সারি দু তিন প্রস্থ। মধ্যিখানে একটা করে গাছ পুঁতে আনুভূমিক 'ভি' বর্ণ। ডালপালা ছড়াচ্ছে ঝাউ ছায়াগুলো। গোড়ায় পাশের মাটি লাগিয়ে এনে উঁচু করে জমানো। রীতিমতো পরিচর্যা। বাঁধ থেকে ফিশলটের বাইন গেঁয়োর ঝোপ ঝাপ কেমন আড়াল করে রেখেছিল সদ্য রোপিত ঝাউ চারাকে। হাওয়ায় দোলে লাইন বন্ধ চারাগুলো। আরও ক'মাস জল বাতাস পেলে শিকড় চারিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। এই সম্ভাবনা হঠাৎ বনবিহারীর মস্তিষ্কে ধাক্কা মারে। ভাবে, ক্রমশ উঁচু চর…চরের বালি অংশ মাটিতে তো শীতে আড়ত বসে…শুটকি মাছের সাবাড়। খটি। প্রায় বিশ বাইশটা আড়ত বা খটি ? নিজের খেয়ালে হাতের আঙুলে গাট গোনে, শীত আসতে আর ক'মাস বাকি ? তখনই মাথার মধ্যে ঘূর্ণি। বনবিহারীর মধ্যে জেগে ওঠে নতুন জলোচ্ছ্বাস। ভাবে, শুটকি মাছের আড়তদাররা তো বেশ বড়লোক কারবারি ? তবে কেন শুধু শুধু রাম প্রামাণিকের কাছে গিয়ে হাত পাতা ? তার চেয়ে তো…এই বালি চর খুঁড়লে পয়সা ? রোজগার।

ঝাউচারার বোঝাটা রোদে ঝলসে যায়। একেবারে নবীন চারা, জলমাটি মা-হারা শিশু। ফরেস্টের লোকগুলো ফিরে যায়। বনবিহারী সাদা বালিচরে একলা দাঁড়িয়ে দেখে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর লাট থেকে বন্দোবস্ত

মূলে ঠাকুর্দার আমলের এই সমুদ্র ঘেঁষা জায়গাটা···সাদা বালি চর অংশ ওপাশে খানিক হাঁটলে সরু সুঁতি খাল···তারপর তো রয়ালগঞ্জের লক গেট। একটু পেছনে তাকাতেই বনবিহারী আন্দাজ পায়, লকগেট ঘেঁষে ইটের পাইলিং করা নোনা বাঁধ। বাঁধের ইটে রোদ পড়ে চকমকে লালচে ঝলক।

ঝলক নিজেরও মধ্যে বনবিহারীর, পুরনো তোবড়ানো চামড়ার ব্যাগটার মধ্যে কত বচ্ছর আগেকার সরকারি নোটিশগুলো মনে পড়ে। কত বচ্ছর পার হয়ে সাদা কাগজে ছাপা দশ এর দুই ধারা নোটিশগুলো হলদেটে। হাতে নাড়াচাড়া করলে শুকনো পাতার মতো খসে মচকে ভেঙে যায়। ঝরে পড়ে। আচমকা আশ্রয় বনবিহারীর বুকের মধ্যে, নোটিশে লিখিত দাগ খতিয়ান সংলগ্ন ভূমি অংশ তো এই পনেরো ষোল বিঘের সাদা বালির চর। সমুদ্র খেয়ে নিয়েছিল। আবার উগরে দিয়েছে।

স্বস্তিতে নরম বালি চরে দু-পা মাড়িয়ে এক পাক হাঁটে বনবিহারী। বালিচরের মালিকাংশ হয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়, পারলে আজই বাসন্তী ময়দানে যাবো। যাওয়া উচিত।

(৯)

বাবলা গাছটার উপর সরু সরু দড়ির মতো নিষ্পত্র হলুদ লতানে ডগার ছেয়ে আছে। বাবলা গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে সীতাকান্ত বেরা কাঁধের ব্যাগ থেকে রোল করা দরখাস্ত বাড়তি সাদা কাগজে অনেক মানুষের সই ঠিকানা সহ কাগজকটা বের করে ফরেস্ট অফিসারকে বলে, সার—নিন আমাদের মাস পিটিশন।

—নেব। চলুন আমার সঙ্গে—একটা মিটিং সারবো সকলে? মুখার্জি সাহেব টোপ দেয় সীতাকান্তকে। সঙ্গে ভূপতি জানা নড়বড় করে হাঁটে। আর একজন উৎসাহী ছোকরা সাদা পাজামা কাচা পাঞ্জাবি পরে সীতাকান্তর সঙ্গী। নিকনো দাওয়া, ধারি দেওয়াল, বাঁশ কাঠের ফ্রেমে নতুন টালি চাপিয়ে ঝকঝকে ঘরদোর। সুরেন আড়ি হায়দাররা কুড়ি বাইশ জন লোক নিয়ে উঠোন দাওয়ায় বসে। ধরণী মুখার্জি বাবুকে দেখতে পেয়ে পঞ্চায়েত সদস্য প্রভাতকিরণ দাস আর নিকুঞ্জ মালিকে ডাকে, ওই যে সাহেব এসে গেছে—

নতুন সদস্য প্রভাতকিরণ ইস্তিরি করা কাপড় শার্ট পরে এসেছে। নিকুঞ্জ মালি শুধু ধোওয়া জামা কাপড়ে দেশীয় মানুষ। চেয়েচিন্তে আনা একটি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসে সুরেন আর হায়দার। যা হোক মাস্টার রোলে তো কাজের দিন কিছু টাকা ফরেস্ট অফিস থেকে পায়। তাই সে অফিসারের সাহেব হাজির তাঁকে আতিথেয়তা জানাতে বোধটা আরও তীব্র হয়। চেয়ারটা উঠোনে বসিয়ে নিজের লুঙি দিয়ে ধুলো ঝাড়ে হায়দার। পরে বলে, সার বুসেন—

লোকজন চেয়ারটার সামনে খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে। ধরণী সাহেবের

প্রায় গায়ের কাছে।

মুখার্জি সাহেব শুরু করেন, বলুন আপনাদের বাঁধ—লক গেট বাঁচাবেন না ধ্বংস করবেন ?

হাজির লোকজন অবাক হয়ে শুধোয়, বাঁধ ধ্বংস হইলে আমরা বাঁচব ? বাংলা দেশের লোকদের না হয় পশ্চিম বাংলা আছে, পালিয়ে এসেছে। আমাদের জন্যে তো এমন কোনও দেশ নাই গো সাহেব ?

মুখার্জি সাহেব লোকগুলোর মনের গোপন কুঠরি দেখতে পায়। সেখানে আরও কিছু লুকনো আছে। মুখার্জি সাহেব বলেন, সেটা আপনারা ভাবুন। আমি অন্য জেলার লোক। সেখানে আমার বাড়িঘর বসবাস। আপনারা বাস করবেন এই জেলায়—এখনকার গাঙ ধারে বাঁধের পাশে। আপনারাই ঠিক করুন, কী করলে ভালো হয় ? পঞ্চায়েত আছে গ্রামবাসী আছেন—

অস্ত্রপাতি তীর ধনুক সবই মানুষগুলোর হাতে ছেড়ে দিয়ে মুখার্জি সাহেব তাদের একটু নজর রাখেন। মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা, আলাপে ঠিক কথাটা তৈরি করতে পারছে না। নতুন সদস্য প্রভাতকে ঘিরে বক বক করে লোকজন। শেষে প্রভাতকিরণ স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেবের চেয়ারের কাছে এসে বলে, সার—

পালিশহীন ভারী কাঠের চেয়ার। দু দিকের হাতলে দু কনুই রেখে সবুজ ফোল্ডিং ফাইলে একটা চিঠি পড়ছিলেন। হাঁটুর উপর হাঁটু রেখে খানিক আরামে। গায়ের কাছে ধরণী। প্রভাতকিরণ সবিনয়ে বলে,—সার—আপনি বলুন আমরা কতটা, কী ভাবে কাজে লাগতে পারি ?

সীতাকান্ত বেরা ভূপতি জানা একটু আড়ালে। সঙ্গী পাজামা পাঞ্জাবি পরা দীপক বাড়ুই। ভূপতি দু'টান বিড়ি টেনে দীপককে দিয়ে বলে, লে শীঘ্র। স্টেশন অফিসার হাঁক দেন, কই সীতাকান্তবাবু—এদিকে আসুন।

এতক্ষণ পাঁচমিশেলি লোকের সঙ্গে একই চাটাইয়ে বসে নিজেকে সস্তা করে তোলেনি। অতো বড় অফিসারবাবু সম্বোধনে ডাক নিতেই সীতাকান্তবাবু মর্যাদা ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। হুড়মুড়িয়ে কাছে আসে। তখন নিজের জামা কাপড়ে চোখ বুলিয়ে আপশোস করে, ইস যদি ইস্তারি করা পোশাকটা পরি আইসতাম…।

সীতাকান্ত কাছে আসতেই মুখার্জি সাহেব বলেন, ধরণী—

—সার ?

—আমাদের বাঁধ থেকে লক গেট বরাবর কত ফ্যামিলি মানে, পরিবার বাস করে ?

ধরণী খুব শান্ত অথচ জোর দিয়ে বলে, দু'শ উনসত্তরটা সার—

প্রভাত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হলেও তার এতটা হিসেব তৈরি নেই। সুতরাং স্টেশন অফিসারের চিন্তা ক্ষমতাকে ভিতরে ভিতরে সমীহ জানায়।

মুখার্জি সাহেব প্রভাতকিরণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদের এই সমুদ্দুর গাঙের জল নোনা ?

—নোনা বলে সার হেভি নোনা। চৈত্র বৈশাখে তো আরও…

—রোলিং আছে ?

—উফ্ সার। দক্ষিণে হাওয়া পাইলে, নোনা জল যেন পাহাড় হয় ? সেই ধাক্কা সামলাইবে কে ?

সীতাকান্তবাবুও যোগ দেয় কথার মধ্যে।

—আমি কিন্তু আপনাদের নোনা মাটির বাঁধকে লোহা স্টিলে মুড়ে দিতে পারবো না। যেটা পারি—সেটা হল ঘন করে গাছ পুঁতে—

সীতাকান্ত বেরা ধৈর্য ধরতে পারে না, সার সেই টাই হউক না—

মুখার্জিবাবু মানুষগুলোর চোখের সামনে একটা স্বপ্ন গড়ে দেয়। বলতে শুরু করেন, দু তিন বছরে ঝাউগাছগুলো বড় হবে। নানা প্রজাতির পাখি আসবে। গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র…বালিচর…জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক, সূর্যোদয়ে অপরূপ কারুকার্য আকাশময়…! আপনাদের ইট রাস্তাটা এক্সটেন্ড করে দিলে এটাই হয়ে যাবে দারুণ ট্যুরিস্ট স্পট। একটু পরিষ্কার ঘর বাড়ি বাথরুম করে দিলে মানুষের ভিড় হবে। দোকানপাট রেস্টুরেন্ট বসে গেলে সারা বছর পর্যটক, ভ্রমণপিপাসু নরনারী, ফ্যামিলির ভিড় হবে। প্রতিদিন রোজগার—

প্রভাতকিরণ বলে, ব্যবস্থা করুন সার। আমরা পঞ্চায়েত সহযোগিতা করব—

—তাহলে তো প্রথম কথা গাছগুলোকে রক্ষা করতে হবে ? মুখার্জিবাবু রীতিমতো বিভাগীয় দায়িত্বশীল কর্মচারী হয়ে ওঠেন।

—রক্ষা হবে নি মানে ? 'একটি গাছ একটি প্রাণ'—আমরা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব। তা না হইলে যে আমাদের ঘর বাড়ি নোনা জলে ডুববে, তখন ?

যাদের দেশের মাটি…বালিচর তাদের উৎসাহে খুশি হয়ে মুখার্জি সাহেব আরও বলেন, চার পাঁচ বছরে গাছগুলো বলিষ্ঠ হয়ে উঠলে দু'শ উনসত্তর ঘরের একজনকে একটা করে গাছ ফ্রি দেওয়া হবে। এখন তো কাঠের—জ্বালানি কাঠের মন ষাট সত্তর টাকা ? কম নয় গাছ পিছু দশ বার মন কাঠকুটো। প্রায় ন'শ হাজার টাকা উপার্জন। কম কীসে ?

—উত্তম প্রস্তাব সার, বলে পঞ্চায়েতের নতুন সদস্য প্রভাত।

মুখার্জি সাহেব উপস্থিত সকলের মন জয় করে ফেলেছেন। তাই সরকারি সুযোগ সুবিধা আরও বিস্তারিত বলে নিজের কাজের পরিবেশটা তৈরি করেন।
—ইচ্ছে করলে আপনারাও সরকারি রেটে গাছ কিনে নিয়ে জ্বালানি বা খুঁটির ব্যবসাও করতে পারবেন—

সীতাকান্তবাবু মুখার্জি সাহেবের কাছাকাছি দাঁড়ায়। উত্তেজনায় বলে, সো ব্যবস্থা করে ফেলান সার—আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

—শুধু সঙ্গে থাকলে হবে ? অনেক বিপদ ঝামেলা আসবে সেগুলো রুখতে হবে যে।

—আপনি ভাববেন নি সার। আমরা সকলে আছি। রাগে চাপা স্বরে সীতাকান্তবাবু সংযোজন করে, যত্তো সোত্তর অনুপ্রবেশকারি…

কথাটা ছোট্ট হলেও খুব তীক্ষ্ণ। ধারালো। তাই স্টেশন অফিসার মুখার্জি

সাহেব ফট্ করে শুধু বলেন, অনুপ্রবেশকারি…!

—হাঁ সার, বেশ জোর পেয়ে সীতাকান্তবাবু মুখের বাঁধন আলগা করে, অনুপ্রবেশকারী শুধু মুসলমান ? হিন্দুও কম কীসে ? বর্ডার পারাইতে পারলে হয়। তারপর তো এদিকে কাকদ্বীপ লাট ওদিকে বনগাঁ, বসিরহাট ?

বনবিভাগের লেবার হায়দার আলি মাস্টারমশাই সীতাকান্তবাবুর দিকে তাকায়। ভাবে, হচ্ছিলি তো গাছের কথা আবার হিন্দু মুসলমান কেন ?

স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেব সকলের দিকে তাকিয়ে বোঝেন, সীতাকান্তবাবুর কথায় মানুষগুলোর মুখ ঝলকে উঠেছে। বুকের ভিতরে সায় আছে। কিন্তু প্রসঙ্গটা তো দেশ বিভাগ, দাঙ্গার ঢেউ এপার ওপারে, তারপর তো খাদ্য খাবার রুজি রোজগার ? অরণ্যচারী মানুষদের দিন কালের মতো… যেখানে খাদ্য খাবারের সুযোগ সেখানেই দলে-দলে মানুষের ভিড়। ভূগোল… সীমারেখা কত কীই বা আটকাতে পেরেছিল তখন…! সেই আদিকালে! আবার মুখার্জি সাহেব বলেন, আপনাদের বসবাসের কাছাকাছি ফলের গাছও পুঁতবো। আমাদের কাছ থেকে লিজ নেবেন। না হয়, পঞ্চায়েত লিজ দেবে আপনাদের। পারবেন গাছগুলো রক্ষে করতে ?

সকলে উৎসাহে আশ্বাস দেয়, হাঁ সার পারব ?

—তাহলে তো একটা বন সংরক্ষণ কমিটি গড়তে হয় ?

প্রভাতকিরণ সদস্য হিসাবে নিজেকে জাহির করার সুযোগ পায়। পরিষ্কার গলায় বলে, গড়া হউক সার—

সবুজ ফাইলের মোড়ক থেকে লম্বা রোগাটে একখানা বাউণ্ড রেজিস্টার খাতা বের করেন মুখার্জি সাহেব। খাতাটা সীতাকান্তবাবুর হাতে দিয়ে স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেব বলেন, মাস্টারমশাই লিখুন—

—হাঁ সার বলুন।

মুখার্জি বলে যান, নিম্ন স্বাক্ষরকারী গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে স্থির হইল বনরক্ষা কমিটির সভাপতি মাননীয় শিক্ষা ও সমাজসেবী শ্রীসীতাকান্ত বেরা—

সীতাকান্তবাবুর কলম থেমে যায়। মুখার্জি সাহেব প্রশ্রয়ে ধমক দেন, কী লেখা হয়েছে ? সম্পাদক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীপ্রভাতকিরণ দাস…।

(১০)

চারদিকে পাড় বাঁধিয়ে প্রায় কাঠা আণ্টেক জল অংশ পুকুর। দুপাড় সরু হয়ে পুব পশ্চিমে লম্বা। নিজেদের বাস্তুর সঙ্গে সীমানা জুড়তে বাঁশ বাখারি গরাণ খোঁটা পুঁতে বেড়া। মাঝে মাঝে বাতিল ছেঁড়া জাল বেড়ার গায়ে বেঁধে ছাগল গরুর মুখ গলাতে প্রতিরোধ।

লুঙির উপর ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট। শার্টের হাতা কনুই অব্দি গুটিয়ে দাঁতে ব্রাশ ঘষে মিন্টু দাস। রাতের হিমে পাড়ের ধুলো মাটি ভিজে স্যাঁতসেতে। চামড়ার চটির তলায় জাপটে ভারী। আশ্বিনের সকালে হাওয়া। শীতের মৃদু

আঁচড়। দমকা হাওয়ায় নখের ধার। মুখ ভরতি ফেনা বেড়ার গায়ে জাল বাঁচিয়ে সাবধানে ফেলে। পুবের দিকে তাকাতেই মিন্টু দাস দেখে, ঝোপঝাপের মধ্যে ক'খানা কাশ ফুল ঘাস ছাপিয়ে ঝাঁটা কাঠির মতো ডগ ঠেলেছে। মিন্টু দাস দাঁতে ব্রাশ ঘষা থামিয়ে বাস্তুর চারপাশ দেখে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘের পাশে নীলচে মেঘের স্তূপ চলমান। এমনি করে আকাশের মেজাজ মর্জি বুঝতে সমুদ্রে নোঙর ফেলা ট্রলারে দাঁড়িয়ে কতবার কত মিনিট ধরে তাকিয়ে থেকেছে। সেটা আবহাওয়া ধরতে। আজ তাকায়…নাড়ির গতি বুঝতে চায়, আগামী সিজিনটা কেমন যেতে পারে…।

বুক ভরতি পাকা লোম। কেশহীন মাথা, কপালময় বয়সের ভাঁজ। গোলমাল মুখে নাদুসনুদুস বৃদ্ধ। কাছা দিয়ে কাপড় পরে হাঁটু অব্দি উদোম। মোটা কব্জি চওড়া চেটোয় থ্যাবড়া থ্যাবড়া আঙুল। খালি পায়ে ঢিল ঢিবি পাশ কাটিয়ে হাঁটে মানুষটা। দু চোখের ভ্রূ পেকে সাদা। গেটের বেড়া ঠেলে উঠোনে পা রাখতেই মমতা বলে, তালুই মশাই ?

—কেডা ? মমতা ?

—হাঁ। জালের ফাঁসের ওপারে তাই মমতার মুখে আঁকিবুঁকি রেখা।

—মিন্টুর লগে কথা আছে। মিন্টুরে কই পামু ?

—দেহেন। পুষ্করণীর ওই ছাইডে।

বাস্তু সংলগ্ন পাড়ের কোণায় কয়েক টুকরো খেজুর গাছের কাণ্ড। তার উপর তক্তা বিছিয়ে ঘাট। বাড়ির বউ মেয়েরা রাতের এঁটো বাসনকোসন মাজছে। বড় বড় বাঁশ ক'খানা জল খেয়ে পুকুরের এক কোণ থেকে বিপরীত কোণে ডগালি ছুঁয়ে সিজিনড হচ্ছে। স্রেফ ক'খানা তক্তা বিছিয়ে খোঁটায় পেরেক মেরে পুরুষদের ব্যবহারের জন্যে জরুরি ঘাট। ধীরে ধীরে নামে মিন্টু দাস। শীতের সূচনায় সারা রাতের হিম পড়েছে চাঁচা তক্তায়। বে-খেয়াল হলেই পা পিছলে জলে পড়ার সম্ভাবনা। তাই মনোযোগ দিয়ে হাঁটে।

বুড়ো মানুষটি চেঁচায়, মিন্টুরে একটা কথা কমু—

মিন্টু দাস তাকায় না। চলার পথে সব সময় সে একাগ্র। চটিসুদ্ধ মসৃণ কাঠের উপর হাঁটে।

—কথাডা কমু যে, তালুই মশায় মর্যাদা হত গলায় নিবেদন করে।

পুষ্করণীর জলের সামান্য উচ্চতায় পাতা তক্তার প্রান্তে পেঁছে ঘাড় ফেরায় মিন্টু, কয়েন তালুই মশাই—?

—এইবার চরে যাবা কবে ?

—এ্যাহনও পঞ্জিকা দেহা হয় নাই, উত্তর দেয় মিন্টু দাস।

—আমাগো পাঁচশ টিয়া দিবা ?

—ক্যান গো তালুই মশায় ?

—আত্মীয়বান্ধব আইছে। কিছু টিয়ার দরকার, তালুই মশায় তার বুদ্ধ চোখে বুঝতে পারে মিন্টুর নীরবতার কী অর্থ। তখন আবার শুরু করে বুড়ো তালুই, ছিঁড়া জাল সেলাই দিমু…তোর সাবাড়ে রাতে গাড় দিমু—

বুড়ো মানুষ। যৌবন আর তাগদ হারিয়েছে বাবা কিন্টো দাসের সঙ্গে জাল ডিঙিতে বছরের পর বছর। ওপার বাংলায় চিটাগাঙ নোয়াখালির সমুদ্রে। দেশভাগের পর এপার বাংলার সাগর মোহনায়। হুগলি মুড়িগঙ্গা জম্বুর দ্বীপে। কথাগুলো মনে হতে মানুষটার প্রতি আত্মীয়তার টানে আর জীবনযাপনে বাপের সঙ্গে ধারাবাহিকতায় মায়া জম্মায়। তাই দুম করে না বলতে পারে না। পারে না বলেই 'হ্যাঁ' কথাটা মুখে ফুটতে দেরি। তখন মনে হয় মিন্টু দাসের, আজগা বেলা দুইটার সময় এক নম্বর ট্রলারের ব্যাঙ্কলোনের পঁচিশ হাজার টিয়া গুণে কিস্তি জমা দিতে হইবে। দু এক দিনের মদ্য জলধরকে শ্যাওড়াফুলির বাবুর গো কাছে পাটাইতে হইব। বাবুরা লাখ খানেক টিয়া না দিলে শীতের সিজন্ ধরা যাইত না।

এক পাঁজা এঁটো বাসনকোসন এনে মেয়েদের ঘাটের কাছে দাঁড়ায় মিন্টু দাসের বউ। কালোর উপর গোলগাল মুখ। নাকে সোনার নাকছাবি। লাল জমিনের আট-পোরে শাড়ি। বাসী চুল গুছি করে হাত খোপা বাঁধা। বাসন কটা রেখে মিন্টু দাসের বউ গোলাপি বলে, তালই মহায় কাজের কথা হইস্যে ?

মাথা ভরতি টাক গোল মুখে বয়েস ছাড়াও হাজার দুশ্চিন্তার রেখা। ঘাড় ফিরিয়ে গোলাপির দিকে বলে, না।

—বারিতে বুয়েন না ?

মিন্টু দাস উবু হয়ে পুকুরের জলে কুলকুচো করে। মুখটা খানিক ধুয়ে যায়। বাসিভার কাটে। মিন্টু দাস বউয়ের কথায় একটা স্বস্তি পায়। বলে, তালুই মহায় যান। বাড়িতে বয়েন গা—

অল্প গভীর পুকুর। ক্রমে ক্রমে ভরাট হয়ে বাস্তু ঘর বাড়বে! তাই সংসারের সকলের জন্যে কেনা। বেশি নাড়াচাড়া করলে জল ঘুলিয়ে পাঁক ওঠে। জলের উপর ভাসমান পাতা কুটি ঢাইয়ে মুখ ধোয়। বে-খেয়ালে হাত নাড়াচাড়া জোর হয়ে যায়। চোখের সামনে ঘোলা জল তির তির নাচে। ঘোলাটে জল যেন তার সামনে নদী হয়ে গেছে। জোয়ারের স্ফীতিতে ঘোলাটে নোনা জল ক্রমে ক্রমে বাঁয়ে মেদিনীপুর ডাইনের চব্বিশপরগনা খানিক এগিয়ে হাওড়া জেলাকে পাশে রেখে বড় সেতুর তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নিমতলা ঘাট ফেলে আরও এগিয়ে ডাইনে ব্যারাকপুর এপাশে শেওড়াফুলির নিস্তারিণী ঘাট। গাঙ্পাড়ে খেলার মাঠ। মাঠের পাশে বাবুদের আড়ত। কোটি কোটি টাকার শুটকি মাছের কারবার। লরি ভরতি হয়ে আসাম, ত্রিপুরা, কেরলে চালান। বাবুদের ছোকরা ছেলেরা সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে গদি পেতে বসে। বড় ক্যাশ বাক্স, পাশে লাল টেলিফোন। মাথার কাছে দেওয়ালে কালী, রাধাকৃষ্ণের পট কাচে বাঁধানো। কাঠের খোপে মাটির গণেশ। ধূপ-ধুনোর ব্যবস্থা। দামী প্যান্ট শার্ট, হাতে কাঁখজ ভরাট ঘড়ি। চোখে চশমা এঁটে ছেলেমানুষ সনজিৎবাবু। পৈত্রিক ব্যবসায় কোটি কোটি টাকার মালিক। জলধরকে সপ্তাহ খানেক আগেই সনজিৎবাবুর কাছে পাঠালে বোধহয় ভাল হত…ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দ্বিধায় পড়ে মিন্টু দাস।

রাস্তার দু পাশে ঝাউ গাছ ছায়া ফেলেছে। সকালের বাতাসে নতুন ঠাণ্ডার ছোঁয়া। বিন-বিন শব্দে বাতাস কাটে। শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ পঞ্চায়েতের রাস্তায় গড়ায়। দমকা হাওয়ায় সরু শাখাটি দুলে দুলে রোদের আলপনা আঁকে।

থুতনির দাড়িতে হাত বুলিয়ে থমকে দাঁড়ায় শেখ আলাউদ্দিন। রোগা শরীরে বসা চোয়াল। কপাল উঁচু হয়ে কালো চুল। যেহেতু ফাঁকা ফাঁকা অল্প-স্বল্প, সামান্য হাওয়ায় মাথা তছনছ। ঘোড়ার লাগাম হাতে দু পায়ে গোড়ালির গোত্তা মেরে বাদার পর বাদা ছুটিয়ে যাওয়ার সময় এমন করে কপাল ঝামরে চোখে পড়ে চুলগুলো। রোদের উপর দাঁড়িয়ে চুল গুছিয়ে নেয় শেখ আলাউদ্দিন।

এক ঢালাই রঙের পুরনো লুঙি। লুঙির উপর চার পকেটের ফতুয়া। জামার রঙের সঙ্গে বেমানান পকেটগুলোর রঙ। জীর্ণ হাওয়াই চটিতে পা টেনে টেনে হাঁটে একদা ছোকরা বয়সের ঘোড়সওয়ার।

বাস রাস্তায় এসে বিব্রত। আগের বাস একটু আগে বেরিয়ে গেছে। তিন চাকা ভ্যান রিক্সাগুলো এদিক ওদিক ছোটে। একটা ভ্যান রিক্সা গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। চালক বলে, চাচা কোথায় যাবে গো? কাশীনগর—না আট নম্বর পয়েণ্ট?

—তুই কাই যাবো রে?

—বাজার।

—ধুস তুই যা। পাটকাঠির বাতিল ভরতি লরি পাশ কাটায়। উল্টোদিক থেকে কলকাতাগামী স্টেটবাস সাইড পেতে হর্ন নেয়।

চাচা জীর্ণ হাওয়াই চটি বাঁচিয়ে সরে আসে। ছোকরা ভ্যান চালক আবার বলে, তুমি যাবে, নাকি তোমার জেনারেটার যাবে?

চোয়াল চোপরা বসা মুখে দাঁত খিঁচিয়ে বলে, জেনারেডার কী আমার সঙ্গে আনছি? চক্ষুতে ঠুলি লাগাই গে যা—

রোগা থুতনিতে ক'গাছি দাড়ি। ভ্যানচালক ভয় পেয়ে বলে, বাপুরে! যেন লাগাম খিঁচতেই তোমার ঘোড়া দাঁত মুখ চিতিয়ে ঝাকরে উঠল?

কথাটায় রাগের উপর জল ঢালে। বুকের ভিতর ভরে ওঠে, ছোকরারা তা হইলে মনে রাখছো আমার ঘোড়ার কথা! আহা! কত সখের যে ছিল ঘোড়াটা!

আলু ভরতি ম্যাটাডরু পাশ কাটায় মাছ ভরতি লরি কলকাতার পথে এগোয়। তিন চারজন মেয়ে পুরুষ নিয়ে ভ্যান রিক্সাটার চালক চেঁচায়, কাই গো চাচা, যাবে নাকি?

—হুঁ। বাসন্তী ময়দান যাবো?

—না। বড়পুল—

পিছনে তাকিয়ে আন্দাজ পায় শেখ আলাউদ্দিন, বাস আসছে। ফুট করে জানতে চায়, কত লিবিরে বাপ?

—কত আর? এক টাকা দিবে—

—তবে যামু, বলে কাঠের ফ্রেমে বসে বলে, বড় পুল থেকে আর একটু খানি বাসন্তী ময়দান। লে যাবি নি বাপ্ ?

—ধুস। এাকি তোমার ঘোড়ার পিঠে উঠ্ছ্যো। চাবুক কষাইলে মাঠবাদায় ছুটবে ? অতোখানি টানতে শরীরে কষ্ট নাই ?

শেখ আলাউদ্দিন ব্যথিত হলেও রাগে না। চাপা আনন্দে বাকি পথটুকু হেঁটে যাওয়ার বল পায় বুকে।

মিন্টু দাসের পুরনো ঘরের দাওয়ায় চারপায়া জলচৌকি চেপে বসেছে তালুই মশাই। কত জল ঝড় শীতেও সহজে গায়ে জামা গলায় না। কড়া শীতে যখন গা ফাটে, ঠোঁট ফাটে তখন তো মাত্র একটা চাদরই যথেষ্ট। পিঠের দু দাবনা ঘিরে লোমগুলো পেকে সাদা। টালির ছাউনি ঘরের আড়কাঠে সিলিং ফ্যান। ফ্যানের হাওয়ায় পিঠের লোম ফর-ফর ওড়ে।

মা বলল, কেমন আছেন গো বুড়োবাবু ?

—যা তিনি রাখছেন গো দিদি।

মমতা কাছে আসে। ঘিরে ধরে বুড়ো মানুষটাকে বাচ্চা মেয়ে দুটো। মমতা বলে, তালুই মহায় কে আইসেন গো আপনাগো বারিতে ?

—ছেলের শ্বশুরবারির আত্মজন।

বড় ডাইনিং টেবিলের উপর জালের স্তূপ এখন হালকা। পাশে সানমাইকা সাঁটা চেয়ার। তার উপর ভিজে গামছা। গামছাটা জালের উপব রাখতে গিয়েও থমকে যায়। আড়কাঠের বাঁশে ঝুলিয়ে দিতে দিতে ভাবে মিন্টু দাস, দিন রাত তো জলে ভিজে টান খায় জাল দড়ি। অ্যাহন ভিজা গামছায় তারে আরও জখম করাই ক্যান ? ফ্যানের হাওয়ায় ভিজে গামছা নড়ে। চেয়ারে বসে বসে মিন্টু বলে, গত দফে দুই'শ লইছেন।

—হুঁ।

—আবার লইবেন ? বড় বেশি টিঁয়া হইব না ?

ম্যানেজার ছোকরা জলধর লো-ভল্যুমে টেপ চালিয়ে শোনে, "বাজিগর-ও-বাজিগর যাদুকর..." হলেও আত্মীয় স্বজন, টাকা পয়সা লেনদের বাকি বকেয়ার কথা হচ্ছে, মা ঘরের মধ্যে চলে যায়। মমতা জাল বোনার উদ্যোগে ফেরে।

যেহেতু আত্মজন মেয়েরা জায়গাটা ফাঁকা করে দিয়েছে। তালুই মশাই বলে, হইবে। তোমাগো সাবাড়ে গাড দিমু...জাল সেলাই করুম।

মিস্টু দাস হাঁক দেয়, মমতা—জলধরকে ডাক দিবা।

চমকে ওঠে মমতার বুক ! পর পুরুষ ছোকরাটাকে তো ছুঁতে ধরতে পারে না। বড়দা ওপাশে, এপাশে মেঝদার সব কিছু। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে পুরুষ মানুষের তাপ নেয়। তখন ও নিজের সেই পুরুষ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনুভবে গড়ে নিতে সাহায্য করে। খুশি হয়ে পা ফেলে মমতা। সারা শরীর জুড়ে প্রাপ্তির যাতনা মনোরম হয়ে ওঠে।

এক পাল্লার চাঁচের দরজা খোলা। পালিশ করা টেবিলে দু তিন খানা মোটা

লাল লাল খাতা। একখানা তার গাঁথা কাটা ফাইল। রাজ্যের স্লিপ ঢোকানো। টেপ চালিয়ে বুকের কাছে মেসিনটা। বালিশের এক কোণে মাথাটা হড়কে এসেছে। কামানো গালে ফরসা যুবক শরীর। দু বাহু বেষ্টনে নিকট করতে যে কী আর্তি! দরজা ফুঁড়ে মানুষের মুখ। আচমকা মেয়ে মানুষের মুখ! ধড়ফড় করে উঠে বসে জলধর। মমতার চকচকে দু চোখ নিবে আসে। বলে, মেঝদা আপনাকে ডাকে।

—মেঝদা কোনহানে?

মুখ তুলে জলধরের গা বুক দেখে আঙুলে দিশা বোঝায় মমতা, ঘরে। আর কথা ফোটে না। কাটা খোঁচা কিছু নেই। তবু দাঁড়াতে কষ্ট। জলধর টেবিল পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে। মমতা সরে সরে পথ ছাড়ে। দরজা থেকে নামতেই গোপনীয়তার সঞ্চয়টুকু ক্ষয়ে যায়। নিরাবরণ উঠোন। নিজের বলে কিছু রইল না।

জলধরকে দেখতে পেয়ে মিন্টু দাস বলে, খাতাটা লইয়া আইসবা। তালুই মহার নামে চারশ টাহা লিখবা তো—

উঠোনময় ফটাস ফটাস্ শব্দ। গোড়ালির চাপে হাওয়াই চটি ছেতরে ফেটে ফেটে গেছে। গোড়ালিতে ধুলো ছিটকে লাগে। মাঝে মাঝে গোড়ালি ডিঙিয়ে ধুলো শেখ আলাউদ্দিনের পায়ের গোছে। লোমের ডগায় ধুলোর ভার। মিন্টু মুখ বাড়ায় দাওয়ার দরজা গোড়ায়। রোগা শরীরে কপাল গলায় ঘাম। বাঁ হাতের কনুইয়ে কালচে দাগ। মিন্টু দাস বলে, চাচা—তুমি এই বেলা?

আলাউদ্দিন কাছাকাছি ছায়া খোঁজে। শেষে ছাঁচতলায় দাঁড়ায়। খানিক আওতা। পরিশ্রান্ত চোখ মুখ। মিন্টু দাস আবার বলে, আসো ভিতরে বয়ো চাচা—

তালুই মশাই টাকা কটা গেঁটে পাক মেরে ধীরে ধীরে ওঠে। জলচৌকিটা খালি হয়। পথক্লান্ত চাচার ইচ্ছে হয় জলচৌকিতে বসতে। নেহাৎ মনিবের বাড়ি, তারই আসবাবে বসার আগে নীরবে অনুমতি প্রার্থনা করে।

—বইয়ো ওই চৌকিতে।

আড়কাঠ থেকে ফ্যানের হাওয়ায় ক্লান্তি ধীরে ধীরে উবে যায়। বুড়ো চাচা রোদ ঘামের মুখ লুঙির খুঁট দিয়ে মুছে সাফ হয়। বলে, বড্ড দরকারে তোমানকে আসছি গো বাউয়ু—

—কী ডা?

আবার ঘাম মোছে। কনুইয়ের কাছে কালচে তেল কালির দাগ। হঠাৎ চোখে পড়ে মিন্টু দাসের, হাতে কী লাগস্যে?

আলাউদ্দিন চাচা কনুই উল্টে দেখে বলে, এই জন্যিই তো আসা? ম্যাসিনটা খুলে সাফাই করছিলি, দু একটা নাট পুলির ফিতা বদলাইব। খরচের জন্যে অগ্রিম মাঙছি তোমাকে—

মিন্টু দাস সাড়া করে না। ফলত শেখ আলাউদ্দিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে, চরে যাবা হইবে কবে?

—অ্যাহনও নিম্মলবাবু সুচিত্র মিদুল বাবুদের সঙ্গে দিন ঠিক হয় নাই গো, চাচা—?

—আবার খোঁজ লুবো। অখন হাজার খানেক টাকা দিয়ে সাহায্য করুন। ম্যাসিনটা সাইজ করি—

মিন্টু দাস হাসে, এত টিয়া? পামু কই?

—সাবাড়ে চার মাসের ভাড়া থেকে কাটি লিবেন, যুক্তি দিয়ে বোঝায় শেখ চাচা।

দাদা সৃষ্টি দাস আকুল কণ্ঠে ডাকে, অ মিন্টু…।

মিন্টু দাস চমকে ওঠে! দাদা তো সহজে হাঁক-ডাক করে না।

আশঙ্কায় ঘরের বাইরে এসে বলে, কী হইস্যে?

—ভদ্রলোকেরে আগে বইয়ে দে। অনেক কষ্ট করিসে আমাগো চিনতে, ঠিকানা খুঁজতে।

বেঁটে খাটো চেহারার মানুষ। মিণ্টু দাস বলে, আয়েন। পাখা চলতিছে—। সামনে দাদা, বনবিহারী, শেখ চাচা। বসার জায়গা তো মাত্র দুটো। মিন্টু বিব্রত বোধ করে। চেয়ারে কাকে বসতে বলবে? মিন্টু দাস দুম করে বলে, সৃষ্টি দাসকে, দাদা চিয়ারে বইয়েন।

সৃষ্টি দাস মিন্টুর দিকে পরে বনবিহারীকে দেখে বলে, উঁহু। উনি অতিথি আয়ছেন। উনি চিয়ারে বইয়ুক—

শেখ চাচা জলচৌকি ছেড়ে দিয়ে সৃষ্টি দাসকে বলে, বড় বাবু আপনি এইটাতে বুসেন গো। আমি মাটিতে বুসছি—

—ধুস। তাই হয়?

—না কেনি গো বউয়ু? মাটিতে ভূমিষ্ঠ মাটিতেই গোর। মাটিতেই রোজগার—মাটি ছাড়া আছেটা কী? শেখ চাচা বলতে বলতে কেমন দুর্বল হয়ে যায়। সরল সত্য বলতে পেরে বোধ-মুগ্ধ অশ্রু তার কোটরগত দু চোখে।

ফ্যানের হাওয়ায় বনবিহারীর গা জুড়োয়। রুমাল ঘষে ঘাড় মোছে, মুখ মোছে। মিন্টু দাস বলে, আপনার বাড়িটা কোনহানে?

—বালিস্থানের বাঁধ বরাবর, উত্তর দেয় বনবিহারী।

মিন্টু দাস সৃষ্টি দাসের মুখের দিকে তাকায়। সংশয় ফুটে ওঠে দু জনের মুখে। বনবিহারী বুঝতে পেরে বলে, ওই যে বটগাছের এপাশে পঞ্চায়েতের বড় হিউম পাইপ? ওরই ডান দিকে—

—ও। এইবার বুঝসি। কন কী খবর? মিন্টু দাস শুনতে চায়।

বনবিহারী চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসে বলে, খবর আর কি? আপনারা যেখানে আড়ত সাবাড় বসান সেখানে তো ফরেস্টার গাছ বসিয়েছে। এই এত বড় গাছ এখন, দেড় দু হাত উচ্চতা রেখে হাতের সাপটা দেখায়।

মিন্টু দাস আঁৎকে উঠে বলে, আমাদের সাবাড়ের এরিয়া বাদ দিয়া গাছ পুতেছেনি?

—না।

—আমরা যে ফরেস্টারকে দরখাস্ত দিছিলাম ?

সৃষ্টি দাস মিন্টুকে থামায়, ভদ্রলোক তো খবর দিতে আইস্যে ? উনি কী জানবেন ?

—বড়দা এইবার উপায়…, মিন্টু দাস অসহায় গলায় বলে। যেন কেউ পেটের ভাত কেড়ে নিল এই মাত্র। এমন নির্মম আক্রমণ !

ম্যানেজার জলধর এসে দাঁড়ায়। বুড়ি মা দেওয়াল ধরে ঠেকনো পায়। মমতার পেছন পেছন বাচ্চা মেয়ে দুটো। বড় বউদি গায়ে কাপড় টেনে টুনে দেওয়রের ঘর বারান্দায়। তারপর মিন্টু দাসের বউ ছেলে দুটো…ক্রমে ক্রমে গোটা পরিবার একই বারান্দায়। বনবিহারী নামক মানুষটাকে দেখে। দুঃসংবাদ বাহক মানুষ ! মমতা পাশ ফিরে দেখে, ছোকরা ম্যানেজার জলধর গায়ের কাছে। কোন কম্পন নেই। নেই আঁচড় বুকের মধ্যে ! বরং জল-কলরোলে ডুবন্ত মানুষের শেষ রায়টুকুর জন্যে আকুতি ! বাচ্চা মেয়ে দুটোকে গায়ের কাছে টেনে আঁকড়ায় মমতা।

সৃষ্টি দাস বারান্দায় নিজের রক্তের জনদের দেখে বনবিহারীকে বলে, ভাই আমনি যাইয়েন না। আমনি আমাগো উপকারি বান্ধব। মিন্টু দাস সঙ্গে সঙ্গে, হ্যাঁ। আমনি সান খাওয়া আমাগো ইয়ানে করবেন। বিয়ালে আমাগো সঙ্গে থাকবেন।

সৃষ্টি দাস নিজের লোকজনদের মুখ দেখতে দেখতে খুঁজে পায় জলধরকে। বলে, যাও তো নির্মলবাবু সুচিত্র মিদুলদের ডাক দাও ইয়ানে।

মমতা ফট করে হাত দিয়ে থামায়, দাঁরান আমি যাইত্যাছি।

জোরে-জোরে পা ফেলে। রঙিন শাড়িতে মেয়েটা। দু হাতের কব্জিতে ক'গাছি কাঁচের চুড়ি বাজে ঝন্ ঝন্। হাবুডুবু জলস্রোতের ধাক্কা থেকে কূল খুঁজতে নিজেই ছোটে। ছুটতে ছুটতে ভাবে, মেঝদার সংসার না বাঁচলে ঠাঁই কোন্হানে !

(১১)

একদা নদী। এখন পাড় ঘেঁষে কাঠ চেরাই কল এগিয়ে এসেছে পাঁক কাদার উপর পাকা পিলার পোস্ট তুলে ছাদ বিছিয়ে। এপাবে দোকানপাট খুঁটি খাটায় মাচা বানিয়ে লাইন ধরে, শাল গরানের খোঁটায় তক্তা মেরে প্ল্যাটফরমের উপর ভিডিও হল। হলের গা ঘেঁষে সিসার পোল রোগা নদীর এপার-ওপার। পোলের লোহা লক্কড়ে রুপোলি রঙে ভোর মিশে আছে। সিসার পোলের উঁচু দুই পোস্টে সাদা কাপড়ে ফেস্টুনটা ঝোলে। ফেস্টুনের মাঝখানে মুকুটসুদ্ধ বড় বড় চোখে ত্রিনয়নী দুর্গার মুখ। মোটা হরফে লেখা,

মিন্টু দাসের ভ্যান রিক্সাটা পোলের উপর চাকা মাড়াতেই ঝম্ ঝম্ বাজনা।

হাওয়ায় 'শারদ বন্দনা'র ফেস্টুনটা থর থর কাঁপে। ভ্যান রিক্সার ডান দিকের আংটা ধরে সামলে নেয় নির্মলবাবু। বলে, ও মিন্টু—কাল কুণ্ডুপদ কী বলছিল ?

—আজ সকালেই এম.এল.এ একটা ব্যবস্থা লইবে।

নির্মল খুঁটিয়ে জানতে চায়, কী ? মিনিস্টার গো কাছে ?

—চলেন। কী কয় এম.এল.এ ? মিন্টু দাস বলতে বলতে দাঁতে দাঁত চেপে চলন্ত ভ্যান রিক্সার ঝাঁকুনি সামলায়।

বাঁয়ে হাসপাতালের পথ ফেলে আর একটু এগোয় ভ্যান রিক্সা। সরু মোটা গরান খুঁটি বাণ্ডিল বেঁধে দাঁড় করানো। দোকানদার এখনও ওঠেনি। দু একটা চা দোকানে ঝাঁপ খুলে উনুনে কয়লা সাজায়। তে-তলা বাড়িটার গ্রাউণ্ড ফ্লোরে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। দোতলায় গামছা কাপড় শুকোয় এই সকালে। চমকে যায় মিন্টু দাস। ভ্যান চালককে বলে, এহ্যানে থামু—

দোতলার সিঁড়িতে পা ফেলার আগেই মিন্টু দাস কপালে হাত ঠেকিয়ে শুভ প্রার্থনা করে। দেওয়ালের গায়ে পোস্টার একখানা ফোকলা দাঁতে হাসি মুখ। মুখের সামনে মোটা করে আঁকা থ্যাবড়া কলম। কলমের গায়ে ফুল কাটা কাজ। কলমের ডগার উপরে বড় বড় বর্ণে "লিখব", হাসি মুখের সামনে "পড়ব", কলমের নিচের ফাঁকা অংশ লেখা "ভুলবো না"।

মিন্টু দাসের পেছনে নির্মল দাস। লম্বা চেহারার সঙ্গে সুস্বাস্থ্য। তারপর বেঁটেখাটো ছোকরা কারবারি মিদুল। নাটা শরীরে সিঁড়ি ভাঙা। সকলের পিছনে বুড়ো সুচিত্র দাস। চারজনের জোড়া পায়ে চটির শব্দ মসৃণ সিঁড়িতে খটাস্ খটাস্। সিঁড়ি ধাপ বেয়ে মানুষগুলো ওঠে। তার আগেই মিলিত পদক্ষেপ স্থাপত্য বেয়ে ঘুমন্ত কুণ্ডুপদকে জাগিয়ে দেয়। চোখমুখ ফুলে বেশ নধর। সিলিং ফ্যানের আওয়াজ খোলা দরজা উপচে বাইরে আসে।

মানুষ চারজন দরজার কাছাকাছি আসতেই কুণ্ডুপদ হাঁকে, কে-এ ?

—আমরা মিন্টু দাস, নির্মলবাবু, মিদুলরা—

—ভিতরে আসুন, বলতে বলতে কুণ্ডুপদ হাই তোলে। দু হাতের উল্টো পিঠে চোখ রগড়ায়। আলস্য মোছে।

দু খানা চেয়ারে লম্বা বেঞ্চটা দেওয়াল ঠেসে। মিন্টু দাসেরা বসে না। বরং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চায়, আমাদের সংবাদ কী ?

কুণ্ডুপদ আবার হাই তোলে। যেন দুরূহ বিষয়ের মধ্যে ঢুকছে। তারপর বলে, রাতে সব কথা বলছি এম.এল.এ-কে। কিন্তু মিন্টু দাসের বুক কাঁপে। বলে, হ্যাঁ—তারপর ?

—এম.এল.এ ভোর—অ্যাঁ চারটায় কলিকাতায় গেছে। উদ্বিগ্ন নির্মল দাস ! সুচিত্র দাস জানতে চায়, বাবু ফিরুম কহন ?

—এই সন্ধ্যে···পাঁচটা ছটায়।

—তা হইলে উপায়···

চোখের সামনে মানুষগুলোর হতোদ্যম মুখ। কুণ্ডুপদ ভেবে চিন্তে পরামর্শ

দেয়, অখন তো পাঁচটাও বাজেনি। আপনারা বরং চিলখালির ফরেস্ট অফিসে যান না? সেখানে ফরেস্টারের সঙ্গে কথা বলুন—এত বছর ওই চরে আড়ত সাবাড় বসে। গরমেন্ট ট্যাক্স লেয়—ফি লেয়—

মানুষ চারজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পরামর্শটায় রাজি কি না আন্দাজ নেয়। তখন বুড়ো সুচিত্র দাস সায় দেয়, হুঁ। ঠিক, কথাডা ঠিক। চলেন গত সনের কাগজ পত্র লইয়া অ্যাহনই চলেন—

কুন্ডুপদ এম.এল.এ.র স্থানীয় সচিব। তার পরামর্শটা কাজে লেগেছে বুঝে আবার বলে, পাঁচটা ছ'টার মধ্যে এইখানে এসে সব রিপোর্ট দিবেন। এম.এল.এ কারেন্ট পজিসান বুঝে সিদ্ধান্ত লিবেন—

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে নির্মলবাবু। মিন্টু দাসও দেখে। মিদুল হাত ঘড়ি দেখে বলে, রসিদ কাগজগুলো তো বারিতে?

—হুঁ। অ্যাহন বারিতন যাইতে হইব। বিনা রসিদে কি ফরেস্টার কথা কমু? বুড়ো সুচিত্র দাস পাকা মাথায় বাস্তব কথা বলে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পাঞ্জাবির পকেট ভারী লাগে। নির্মল মিন্টুর হাতটা ধরে থামায়। পরে নিজেই পিছনে ফিরে যায়। কুন্ডুপদ তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। পকেট থেকে নতুন এক প্যাকেট সিগারেট ধরে কুন্ডপদকে বলে, দাদা—এটা আপনের।

কুন্ডুপদ হাসে। পাশ করা ছেলে। পুরনো কর্মী। এখন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ থানা বি.ডি.ও., বি.এল.আর.ও. একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রোডস্, বাজার কমিটি দেখা পেলেই নমস্কার জানিয়ে বলে, কেমন আছেন কুন্ডুবাবু? ফরেস্ট অফিস সেখানে কী এমন বাঘ ভালুক!

কুড়ি বাইশ জন কারবারি আড়তদার নিজের নিজের বাক্স খুলে কাগজপত্তর খোঁজে। চিলখালি ফরেস্ট অফিসের রসিদ। খবরটা ছড়িয়ে যেতেই ছেলে ছোকরারা মনমরা। আকাশের দিকে তাকায়, পুকুরঘাট গাছপালার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চায় শীত আসতে আর কত দিন? ক'মাস? দুর্গা পুজো পার হতে আর কটা সপ্তাহ?

আড়তদারদের বাড়ি বাড়ি গৃহদেবতার কাছে ধূপ জ্বলে। ধুনো পোড়ে। প্রদীপের সলতের আগুন। বউরা কাচা কাপড় পরে শাঁখ বাজিয়ে গড় জানায় গৃহ দেবদেবীকে। প্রার্থনা জানায়, মা—আমাগো যে বড় বিপদ…!

কুড়ি বাইশ ঘর আড়তদার হাতে চেন টানা ফোলিও, পলি প্যাকেট মূল্যবান বস্তুর মতো বুকে বগলে জাপটে ইট বিছানো রাস্তা মাড়িয়ে বাস রাস্তা মুখে। পাকা রাস্তার ওপারে একদা প্রমত্ত ঘিয়াপতি গাঙ রুগ্ন হয়ে সরু নালা। নালার উপর কাঠের পুল বাধিয়ে দাসবাবুদের বরফ কল। মোটা-মোটা পাইপ "ইউ" আকারে খাঁচা বন্ধ হয়ে কনডেনসার। জল পড়ে ঝির ঝির শব্দে।

বিশ বাইশ জন সাবাড়ে আড়তদারের পিছনে সত্তর আশি জন বুড়োবুড়ি। বিপন্ন মুখে এগিয়ে দেয় সংসারের সকল কাজ ফেলে। কলিকাতা-টু-নামখানা ডিলাক্স বাস থামায় সব লোকজন। বাসের মধ্যে প্যাসেঞ্জাররা অবাক! এত

লোকজন কেন! কোনো বিয়ে বাড়ি তো নয়। বর বউ নেই! তাহলে?

ফেরিঘাট পেরিয়ে একখানা ফিরতি ম্যাটাডরে চেপে ডাইনে ঝাউবন ফেলে সোজা চলে যায় মানুষগুলো। দুদিকে কাঠের রেলিং দিয়ে পোল। চড়ায় পুরনো ভুটভুটি রঙ হচ্ছে। একখানা ট্রলারের আহ্নিক কাঠের ডগায় লাল কাপড় মুড়ে মেরামতিতে লেগেছে মিস্ত্রি, লোকজন। সকালের ফুর ফুর হাওয়া। কাঠের পোলের ও মুড়োর চড়ায় মড গরানের ডালপালা দোলে। তিতা বকুলের চারা মাথা ঠেলে চুড়ো মতো। কাঠের পোলের তলা দিয়ে ভাটার টানে নোনাজল ধীর গতিতে বয়ে যায়। এক ঝাঁক পাখি এত মানুষ দেখে কিচির মিচির ডাক ছাড়ে।

নির্মল বলে, মিন্টু—

—ক'।

—যা কথা আমি কমু।

—হুঁ। তুমি আমাদের মইধ্যে লেহাপড়া জানা মানুষ। অফিছার মাইনষের সঙ্গে তুমিই কইবা নে সব—

বাঁধানো ইটের পিঠ দিয়ে হেঁটে যায় এত মানুষ। তক্তাপোশের উপর টিন লাগিয়ে গুমটি ঘরে উনুন, কড়া, ভাঙা হ্যারিকেন নিয়ে বুড়ো। ঘোলা চোখে তাকায়। হাঁটু বুকে নোনা কাদা শুকিয়ে সাদাটে দাগ। তার চোখে অবাক চাহনি! কাঠের দেওয়াল ছাউনিতে প্রথম অফিস ঘর থেকে ওয়ারলেস মেশিনের বোঁ বোঁ শব্দ। নির্মল থমকে দাঁড়ায়। ডান দিকে নারকেল গাছ। গাছের ছায়ায় তক্তা মেরে বড়সড় সিট। খানিক গেলে পাড়ের ঢালে কাঠ মেরে ঘাট। স্নান, মুখ ধোওয়া, কাচাকুচির মিঠেন জল।

কাঠের বাংলোর বারান্দায় ঘেরা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়ায় কমলা। কালো মুখে কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। চকচকে টানা চোখে বিস্ময়! হাতে খুন্তিটা তখনও। ভাবে, এত লোক অফিসে! চকিতে বিস্ময় থিতিয়ে গেলে কমলা ভেতর বাংলোয় জোরে জোরে পা ফেলে। খালি পায়ে কাঠে বাজে ধপ্ ধপ্। বিছানায় আধো ঘুমে পড়ে থাকা দেহটাকে বলে, সার—, গা ঠেলা দিয়ে ডাকে কমলা, সাব কারা আসছেন গো?

ঘুম চটকায় জানতে চায়, কারা?

—জানিনি।

—কোথায়?

—বড় অফিস ঘরে।

মুখার্জি সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে ব্রাশ করেন। গায়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে ট্রাউজারটার দাঁড় বাঁধেন। পুরনো কর্মী সঞ্জয় বেরা লুঙির উপর গেঞ্জি গায়ে নিতান্ত ঘরোয়া মানুষ, কাছে এসে বলে, আপনারা?

—সাহেবের সঙ্গে দেখা করুম গো সঞ্জয়বাবু, বলে নির্মল।

সোজা দাঁড়াতে রোগা শরীরে সঞ্জয় কেমন বিপরীত চেহারা। একবার ঘাড় ফিরিয়ে সাহেবের বাংলো বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, সাহেব···সাহেব···

লম্বা চওড়া চেহারায় সুস্বাস্থ্যবান নির্মল তখন পকেট থেকে দামী সিগারেটের নতুন প্যাকেটটা খুলে একটা সিগারেট দিতে গিয়ে পুরো প্যাকেটটাই দিয়ে দেয়। বলে, খান।

ভেতরে-ভেতরে খুশি আবার বিব্রত সঞ্জয় বেরা। গোটা অফিসের খাতা লেখে, রসিদ কাটে। তার এই দোলাচলে নির্মল ঘা মারে, যান গো সঞ্জয়বাবু— সাহেবকে ডেকে দিন—

কাঠের দেওয়ালে বড় আয়না টাঙানো। মাথায় চিরুনি টানতে টানতে মুখার্জি সাহেব বলেন, ওরা কারা ?

—সাবাড় পার্টি, সঞ্জয় বেরা জানায়।

—কী চায় ?

—আপনার সঙ্গে কথা কইবে।

—উম্। অফিস ঘর খুলে দিন। আপনিও থাকবেন—, চিরুনি দিয়ে আর একবার টানেন মুখার্জি সাহেব। ফরসা মুখ সাদা পাঞ্জাবিতে আলিগড়ি কাজ। চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নেন।

বড় কাচ লাগানো টেবিল। কাচের তলায় বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পাশে প্রিন্ট করা, কাঠা কচ্ছপের ছবি। ছোট্ট করে একখানা ম্যাপ। দক্ষিণবঙ্গের ভূমি নদী পথ। পেছনে কাঠের দেওয়ালে কাচের ফ্রেমে বাঁধানো বড় ম্যাপ। নিম্ন দক্ষিণ বঙ্গের উপকূল, ছোট বড় দ্বীপ, মাঝে মাঝে সবুজ রেখায় ঝোপ জঙ্গলের আভাস। সামনে ছ'খানা চেয়ারে লোক ভরতি হয়ে পেছনে পাশে দাঁড়িয়ে। পাশে টুলে বসা সঞ্জয় বেরাকে মুখার্জি সাহেব বলেন, আর টুল চেয়ার হ'ল না ?

নির্মল কথাটা ধরে নিয়ে বলে, সার ঠিক আছে, ভাববেন না। আমরা জলে ঝড়ে কাজ করা লোক। সব সহ্য আছে—

—বলুন। কী খবর সব।—

নির্মল সকলের দিকে তাকিয়ে এবার সাহেবকে নমস্কার জানায়। সাহেব ছোট্ট করে প্রতি নমস্কার জানিয়ে নিজেকে আটকায়।

—আমরা তো সার সকলে—বউ বাচ্চা, ভাইবোন লইয়া বিপদে।

—কেন ?

—সার, শীত আসতে আর ক'দিন। আমরা তো চরে সাবাড় খুলতে পারমিশান চাই। চার্জ ট্যাক্স যা লইবার ন্যান—

—কোন চরে ? নারাণতলা ? জম্বু ?

মিন্টু দাস বলতে গিয়ে সামলে নেয়। নির্মল খেই ধরে বলে, বালিস্থানের ?

—একদম হবে না। ওখানে প্ল্যানটেশান কমপ্লিট।

—কিন্তু সার, আমরা বিশ বাইশ জন দশ পনেরো বছর ওই চরে সাবাড় পাতি। আড়ত খুলি—

—এখন হবে না।

—বছর বছর রসিদ কাটি, বলে ফোলিও ব্যাগের চেন টানে। এক গুচ্ছ সরকারি রসিদ বের করে। আবার বলে নির্মল, সাবাড় পিছু মাঝ সমুদ্দুরে

জাল পাতার জাগায় দুই ডিঙিতে আট আট ষোল জনা কুলে প্রায় পঞ্চাশ জনা—

—তা তো কাটতেই হয়। ওটা নিয়ম, স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেব গম্ভীর গলায় উত্তর দেন।

—হ্যাঁ সার সেই জন্যি তো কার্তিক অঘ্রাণ পৌষ মাস—চার মাসের তরে লোক পিছু ষোল টাকা পাস কাটি। দ্যাহেন রসিদ—, বলে সকলের দিকে নির্মল তাকায়, আপনারাও আনছেন রসিদ ?

হঠাৎ যেন ঢেউ উঠেছে মাঝ গাঙে। হুড়োহুড়িতে রসিদ বের করে। উত্তেজনায় মিন্টু দাস বলে, ছার, আমার কাছে বারো বচ্ছরের রসিদ আছে। দ্যাহেন, বলে এক পাঁজা কাগজ বের করে দেয়।

মুখার্জি সাহেব পরিস্থিতিটা বুঝে ছোট্ট করে বাক্য ব্যয় করেন, আমার জানা আছে। বরং অন্য চরে যান—

—সার জম্বু নারাণতলায় বহুত পুঁজি রসদ লাগে। আমরা গরিব, আর থাকতে পারে না সুচিত্র দাস, ছার—দ্যাশ ছাড়ি অ্যাহানে পোলাপানের মুখে দুডা ভাত জুগাই। দাঙ্গা রায়টের সোময় আইছি সেই সময়তন এই চর…চরে আমরা বচ্ছর বচ্ছর আসি।

—আমি কিছু পারব না। ডি এফ ওর মন্ত্রী গরমেন্টের প্রোগ্রাম ওই বালিস্থানে গাছপোতা, বৃক্ষ রোপণ—, সরকারি নীতির কথা বোঝায় স্টেশন অফিসার।

সাহেবের হাতের সিগারেট পুড়ে যায়। নতুন করে ধরাতে যাবে নির্মল নিজের পকেট থেকে এক ঘায় দু প্যাকেট দামী সিগারেট রেখে বলে, এটা খেয়ে দেখেন সার—

এতগুলো মানুষের সামনে কিছু বলতেও খারাপ লাগে। তাই স্টেশন অফিসার চুপচাপ থাকেন। বৃদ্ধ সুচিত্র দাস দু হাত জোড় করে বলে, ছার, আমাদের দেইখ্যা একটু করুণা করেন—

নির্মল শান্ত ভাবে, সার। আমাদের কথা একটু ভাববেন না ?

—ডিপার্টমেন্টের কত টাকা খরচ হয়ে গেছে জানেন, গাছ পুঁততে ওখানে ?

—কিন্তু সার আমরা যে জয়েন্ট দরখাস্ত দিছিলাম আরও আগে ? নির্মল যুক্তি দিয়ে সাহেবকে থামাতে চায়।

স্টেশন অফিসার বলেন, আপনাদের তো গত বছরও বলা হয়েছিল, চরে আর পাস দেওয়া হবে না।

—কিন্তু সার…দরখাস্তটার কোনো অ্যাকশান ট্যাকশান—

স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেব হঠাৎ রেগে ওঠেন, দরখাস্ত দিয়েছেন তো কী হয়েছে ? চমক ওঠে বিশ বাইশজন একই সঙ্গে। যেহেতু নাড়া দিতে পেরেছেন, মুখার্জি সাহেব আরম্ভ করেন, আপনারা চরে সাবাড় বসিয়ে চার মাসে তো আমার জঙ্গলের হেঁতাল পাতা সব কেটে নেন। বালির উপর পাতেন, পাতেন না ?

মুখ চুপসে যায় সকলের।

নির্মল বলে, ওগুলা সার গ্রামের মেয়েরা—চুরি করে…

—থামেন, বলে মুখার্জি সাহেব ধমক দেয়।

—আপনারা রান্নার জ্বালানি কেনেন? না, আনেন? সব তো আমার জঙ্গলের?

—সার। ওগুলো তো জঙ্গলের পচা মুড়া, গোড়ার শিকড় বাকড়?

—সেটা কী জঙ্গলের বাইরে থেকে আসে? কয়লাখনি থেকে?

—সার…

—অ্যাডজাসমেন্ট গ্রামের লোকেরা অভিযোগ করেছে, চরে মদ চলে। জুয়া—

বাধা দেয় নির্মল, সার—গ্রামের লোকেরাই পয়সার লোভে বেচতে আসে। আমরাই বাধা দিই। শুনে না—

বৃদ্ধ সুচিত্র দাস একটু কাছে যায়, ছার। আমরা বয়ইস হইসো। আমি কই আমাগো দোষ আছে। আর হইব না ছার। চরডা আমাগো ব্যবসা করতি দ্যেন ছার—

মিন্টু দাস দু হাত জোড় করে বলে, সার—বউ বাচ্চা পোলাপান বুড়া বাপ মায়ের লইয়া সংসার। ইয়ানে ব্যবসা করতি না পাইলে সব মরি যাবা। আপনে ফাইন ন্যান। বেশি ট্যাক্স ন্যান—আমরা সব মিট করুম—

মুখার্জি সাহেব একটু চুপচাপ থেকে বলেন, আমি যা করেছি সব উপরের অর্ডারে। গাছপালা বাঁচাতে, গাছ রোপণ করতে। আর কথা বলেন না স্টেশন অফিসার মুখার্জি সাহেব। পাশের ঘরে ওয়ারলেস বোঁ বোঁ শব্দে বাজে। বঙ্গোপসাগরের হাওয়া কাঠের জানালা ফুঁড়ে অফিস ঘরে।

তিন তিন ছ'ধাপে কাঠের সিঁড়ি। শেষ ধাপ থেকে ঘাস মাটিতে পা ফেলে নির্মল থমকে দাঁড়ায়। মিন্টুর জামাটা ধরে টানে। সাধনের লোকজন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায়। পায়ে পায়ে হাঁটে নির্মল। ফিসফিস করে বলে, সেই ছোকরাটা কে ছিল বল তো?

—কোনটা?

—গত সনে, কি…তার আগের সনে? আমার আরতে বলছিল, তারে আরত পিছু তিন হাজার করি টাহা দিলে চরে পাকা বন্দোবস্ত করি দিবে।

—হুঁ। আসছিলো।

—সেইই বোধহয় গণ্ডোগোলটা করি দিস্যে…

মিন্টু দাস বলে, তাকে তো চিনি নাই। কারতন আইছ্যে কোন্হ্যানে ঠিকানা? টাহা বললেই টাহা…জলে ফেলি দিমু…

নির্মল কিছু বলতে পারে না। বরং ভাবে, আমরাই জলে…।

অফিস ঘর ফাঁকা। সামনের ঘাট, ইটের রাস্তা একদম জনহীন। শুধু পাশে সপ্তয় বেরা। মুখার্জি জানতে চান, ধরণী কোথায়?

—আছে। অফিসে কোথাও আছে।

—আমার সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে বলুন। খুব জরুরি। পুজো গেলেই তো শীতের হাওয়া…?

ফরেস্ট অফিসের ইট বিছানো রাস্তা, লোহার গেট। পায়ে পায়ে আগু পিছু হয়ে যায় মানুষগুলো। নির্মল মিস্টু দাস এগিয়ে। পিছিয়ে পড়ে বেঁটে খাটো মিদুল। পরণে ফুল প্যান্ট গায়ে ব্যাগিস শার্ট। দিন পাচেক আগে শ্যাওড়াফুলির বাবুদের কাছে গিয়েছিল। বাবুরা কথা দিয়েছে, ঠিক আছে দেড় লাখ তো? পাবে। কিন্তু সিজিন শেষে নয় শীতের মাঝের তন হাফ টাকা শোধ দিতে হইব। তারপর মাঘ মাসের পনরো দিনের তন আমার লোক যাবা—বাকি টাহা শোধ চাই।

মিদুল রাজি হয়েছিল।

—ঠিক আছে। কারবারে লাগো, ছোকরা মিদুলের পিঠে যেন বাবুদের সেই আশ্বাসের চাপড় এখন লাগে। কাঠের পোলের ডাইনে বাঁয়ে ফাঁকা। বাঁয়ে সমুদ্র। হু হু হাওয়া। চামড়ায় ছ্যাঁকছেঁকে কামড়। বাঁ দিকে তাকিয়ে মিদুল ভাবে, এহ্যান থেকে দু তিন ঘণ্টা তেল পোড়াইলে ভুটভুটি ট্রলারে তবে জম্বু। কারবারের গোড়াতেই গোলমাল। কত খরচ…। বাবুদের টাকা শোধ হইব কেমন করে? শীত আসে। শীতকে ধরতে দিচ্ছে না এবারের শীত ফরেস্ট অফিস কিনে নিছে।

(১২)

চার মানুষে চা খায়। নির্মলের পাশে বুড়ো সুচিত্র দাস, মিস্টুর পাশে ছোকরা মিদুল। দোকানের বেঞ্চ। বাজার মোড়। লোকজনে দোকানপাট জমজমাট। বাচ্চাদের নতুন জামা, রঙদার ফ্রকে জোরালো বিজলী আলো। কাঁচের আলমারিতে ঝলমল করে মনোহারি দ্রব্য। ভ্যান রিক্সার হর্ণ, সার্ভিস বাসের স্টার্ট নেওয়ার গর্জন, লরি টেম্পোর চলাচল। ভিডিও হল থেকে মাইকে অবিরাম ঘোষণা, পরবর্তি শো "খল নায়ক"। টিকিটের হার মাত্র দু টাকা। দু টাকা। সুপার হিট ছবি "খ-ল-না-য়-ক"।

কাঁচের গেলাসে চা একটু একটু করে চুমুক দেয় আর চার মানুষের চার জোড়া চোখ নজর রাখে, মানুষের ভিড় কাটিয়ে কোনো ট্যাক্সি সিসার পোলে ওঠে কিনা?

পাউরুটি বিস্কুট থরে থরে সাজানো। তারের ঝুড়িতে ডিম ঝোলে। উনুনে হাঁড়ি ভরতি চায়ের জল ফোটে। ওপাশের বেঞ্চে তিন বন্ধুতে দু গেলাস চা তিন গেলাসে ভাগ করে খেতে-খেতে লাল জামা বলে, আমার টিউশ্যানিটা একদম রাবিশ—

সাদার উপর স্ট্রাইপ হাওয়াই শার্ট বলে, সে কি! তোর পার্টি তো পোলট্রি ফিড়ের কারবারি, হেভি পয়সা?

—হলে কি হবে? মাস পুরিয়ে পনের দিন হলে তবে টাকা। পয়সা আছে

তবু দেরি করবে।

সাদা শার্ট চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আমারটা শালা ধনে ভাঙা পার্টি। দিতে চায়, পারে না। এক গাদা বাচ্চাকাচ্চা বউ নিয়ে হরদম ব্যাট করেছে। এবার আর সামলাতে পারছে না।

—তোর তো ছাত্রী? কোন্ ক্লাস? জানতে চায় লাল জামা। সিগারেটে টান দিয়ে।

—দু বছর নাইনে আছে।

—তাহলে তো দারুণ।

পাশে 'আডিডাস' ছাপা মারা গেঞ্জি গায়ে পুলক। পুলক উৎসাহে বলে, মন দিয়ে লেখাপড়া করে?

—দুস্ গায়ের কাছে বসে ন্যাকামি। বকলে শুধু হাসে—খেয়াল করে না কিছু।

পুলক খুশি হয়ে বলে, আমি পড়াব ওটাকে। মাইনে লাগবে না—করে দিবি?

—ধুস শালা। তোর বাবার আড়ত আছে। তুই টিউশ্যানি করে আমাদের ভাত মারবি কেন রে? একটা চাকরিবাকরি পেলে না হয় তোকে ছেড়ে দিই?

—তোর ছাড়তে হবে না। ভিডিও হলে নিয়ে আয় না তাকে—পুলক প্রস্তাব দেয়।

—টিকিটের দাম? সাদা জামা পুলকেব দিকে তাকায়।

—আমি দোবো। সেদিন সব খরচ আমার, পুলক ব্যক্তিত্ব আর সঙ্গতি দেখায়।

লাল জামা মৃদু হেসে বলে, ঠিক আছে পুলক তাই। আজ তিনটে ডিম বল—

নিজের মর্যাদা রাখতে পুলক চা দোকানিকে বলে, বিমলদা—তিনটে অমলেট দাও তো—

একখানা কালো ট্যাক্সি মানুষের ভিড়ে আটকে যায়। ভেতরে লোকজন। কারা? বোঝা যায় না। মিন্টু দাস বেঞ্চ ছেড়ে ছুটে যায় ট্যাক্সির কাছে। কাঁচের জানলায় চোখ ফেলে হতাশ। ফরসা চেহারার বিশাল ভুঁড়ি ক'জন মানুষ। কপালে হলুদ রঙের বড় করে টিপ। পাশে দুজন লালচে চুলে ফরসা ফরসা সাহেব ছোকরা।

নির্মল জোরে ডাকে, মিন্টু—সেটা তো পেট্রোল বাবুর সাদা কার?

তিনখানা প্লেটে গরম ভাপ। পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা লঙ্কা। পাতলা চামচে কেটে কেটে ডিমটাকে টুকরো করে লাল জামা। এক টুকরো মুখে পুরে চিবিয়ে চিবিয়ে ভেতরে চালান করে বলে, পুলক—আমরা তোকেও খাওয়াব। চাকরিটাকরি পেয়ে নিই—।

—এ সপ্তাহের 'কর্মক্ষেত্র'-এ দেখলুম রেল-এ লোক নেবে, বলে সাদা জামা।

চামচের অমলেটের টুকরোটা ভরে থাকে। লাল জামা হামলে পড়ে বলে,

থামা। এর আগেও দরখাস্ত চেয়েছিল। সে পরীক্ষার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। আবার নতুন লোক নেবে। গ্যাটস ওলারা রেল, হাসপাতাল থেকে লোক ছাটাই করতে বলছে—আবার নতুন চাকরি? যেন বড় বক্তৃতা দিয়ে এবার টিফিন করবে। সে জন্যে অমলেটের টুকরোটা মুখে পোরে লাল জামা। কলকাতা-ট-নামখানা স্টেট বাস চলে যায়। পেছনে-পেছনে প্যাসেঞ্জার ভরতি লোকাল বাস। রাস্তার ওপার থেকে হ্যান্ড মাইকে চিৎকার "ইঁদুর মারতে র‍্যাটফো ব্যবহার করুন। খেয়েছে তো নির্বংশ হয়েছে।"

সাদা জামা প্লেটের অমলেট অর্ধেকটা খেয়ে লালসা দমায়। কাঁচা লঙ্কার ঝাল কমাতে জিবটাকে বার বার বের করে হাওয়া লাগায়। তারপর বলে, এখান থেকে ডিঙি পেরলে তো হলদিয়া?

—হ্যাঁ, পুলক সায় দেয়।

—পেট্রো কমপ্লেক্সে লোক নেবে না?

লাল জামা মুখ খোলার আগেই পুলক হাঁকিড়ে ওঠে, তোরা এতো চাকরি চাকরি করিস কেন বলত?

পুলকের গলার তেজে মনে লাগে লাল জামার। চোখ কুঁচকে ছোট। বলে, কিই-বা করি বল…।

—চল না আমার বাবার কাছে। ব্যবসা করবি—

—দুস্ আমাদের অতো পয়সা কোথায়? দীনতা জানায় লাল জামা। সাদা জামাও এক শ্রেণীতে আবদ্ধ।

—কিচ্ছু লাগবে না। বাগদা চিংড়ি আর মোচা চিংড়ির দাম জানিস?

—হ্যাঁ। লাল জামার সঙ্গে সাদা স্ট্রাইপ সায় দেয়।

—বরফ ভরতি দু খানা পেটি বাক্স দোবো। গাঙ সমুদ্দুরের পাড়াগুলোয় জেলে মেছোদের কাছে গিয়ে গিয়ে দুটো চারটে করে বাগদা মোচা কিনবি। পনের বিশখানা আনবি—খরচ খরচা বাদ দিয়ে ডেলি পঞ্চাশ ষাট টাকা লাভ—। কটা টাকা পাস টিউশ্যানিতে?

কথা খুঁজে পায় না দুই বন্ধু। স্বপ্ন তৈরি হয়…। চোখের সামনে নোনা গাঙ…সমুদ্র। পুরুষগুলো ডিঙি নিয়ে গাঙে…গা গতরে বউরা ভিজে কাপড়ে কূলে…যুবতী মেয়েরা বে-খেয়ালে গা-বুক এলোমেলো হয়ে দৃশ্য। তাদের কাছ থেকে মাছ কেনা বেচা করতে-করতে…সেই মেয়ে বউদের হাসি ঠাট্টা…। বেশ মনোরম চিত্র এঁকে ফেলে সাদা স্ট্রাইপ।

হঠাৎ লালজামা বলে, পুলক—চার পাঁচ বছর পর তাড়িয়ে দিবি না তো?

—মানে?

—এই বাগদা মোচা চিংড়ি খাচ্ছে কারা? বেশ গম্ভীর তার মুখ।

—কলকাতার বাবু, পয়সাওলা লোকেরা আর জার্মান আমেরিকার সাহেব মেমরা—? এখন তো বিদেশে চিংড়ির বড় বাজার—?

—সেই বাজারের বড়-বড় কোম্পানিরা যখন বলবে, যে গাঙ সমুদ্রে বাগদা পাওয়া যায় সেই গাঙ সমুদ্র লিজ দাও—তখন?

—ধ্বস্। বলে লাল জামাকে একদম বসিয়ে দেয় পুলক।

—ধ্বস কিরে? তা না হলে সেই কোম্পানিরা জাহাজ ভরতি ওষুধ যন্ত্রপাতি আর পাঠাবে তাদের হাতে যে ডাণ্ডেকল সাহেবের তৈরি ফর্দ—এক একটা দফা।

উল্টো দিকের বেঞ্চে বুড়ো সুচিত্র শুনে অবাক। ভাবে গাঙ সমুন্দুর আবার লিজ চাইতে পারে…। তহন আমরা মাছ মারুম কোন্ হ্যানে? মাছ শুকাইব কোনতন? নিজের সংশয় কাটাতে সুচিত্র বুড়ো ছোকরাগুলোকে বলে, ও দাদুভাই—

সাদা ট্যাক্সিটা হর্ন দিয়ে ভিড় কাটায়। ক্রমে ক্রমে সিসার পোলের দিকে এগোয়। নির্মল বলে, মিন্টু—তারাতারি কর—এম এল এর গারি।

মিন্টু ডাকে, সুচিত্তর বাবু—আয়েন।

দোকানপাটের আড়াল আর মানুষের ভিড় কাটিয়ে খানিক এগোতেই সিসার পোল। দু দিকে ফাঁকা ফাঁকা। হাওয়া বয়। হাওয়ায় শীতের ধার। ছোকরা নির্মল, মিন্টু দাস বড় বড় পদক্ষেপে পোল পার হয়ে ওপারে। মাঝখানে মিদুল দাস। পিছনে বৃদ্ধ সুচিত্রবাবু। ছোকরা মিদুল দাস গতি কমিয়ে বুড়ো সুচিত্রর সঙ্গী হয়। গায়ের কাছে গিয়ে মিদুল বলে, এত ছোটাছুটিতে কিছু হইব? বালিস্থানে সিজিন ধরা যাইব…?

বুড়ো সুচিত্রর গালময় কুচো সাদা দাড়ি। কদিন দৌড় ঝাঁপে কামাবার ফুরসত পায় নি। দোকানপাটের আলো ছিটকে সাদাটে আভা। আকাশের দিকে হাত দেখিয়ে অসহায় ভাবে বলে, তাঁর দয়া। আমাগো সাধ্য সাধনা।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলা বাড়িতে উঠে যায় নির্মল আর মিন্টু দাস। কুণ্ডুপদর পাশের ঘরে এম এল এর অফিস। ফুল স্পিডে টেবিল ফ্যান ঘোরে। কালো বাটি মুখ এম এল এ। ফ্যানের হাওয়ায় মাথার কাঁচা পাকা পাতলা চুল ফরফর ওড়ে। পাশে টেলিফোন। সামনের চেয়ারে দু চার জন লোক। নির্মল আর মিন্টু দাস ঢুকতেই এম এল এ বলেন, তোমাদের ব্যাপারে কথা হয়ে গেছে বনমন্ত্রীর সঙ্গে। ডি এফ ওর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আশ্বাসে আনন্দ মানুষগুলোর। মিন্টু বলে, বাবু—আমাগো রেডি অইতে হইব। দোকানের চাল ডালের বাজার ট্রলারের তেল ডিজেল দাদনের লেবার, জাল দরি—চার মাসের জন্য সব ব্যবস্থা…

—হ্যাঁ হ্যাঁ। মন লাগিয়ে তৈরি হও। আমি তো আছি—

বুড়ো সুচিত্র নমস্কার জানিয়ে বলে, দ্যাহেন বাবা। দ্যাশ ছাইড়া এহ্যানে। আপনেগো পদতলে—পোলাপান লইয়া সংসার। তাগো সব প্যাটের ভাত…

—ঠিক আছে। আমি তো চেষ্টা করছি, বলেই হঠাৎ মনে পড়ে মাস পিটিশানের কথা। নির্মলকে দেখিয়ে বলে, আমাকে কাল সকাল আটটার মধ্যে পাঁচ কপি দরখাস্ত—যারা বালিস্থানে সাবাড় বসায় আর কর্মী জেলে লেবার সকলেরই সই থাকলে ভালো। এক কপি বনমন্ত্রী, এক কপি মুখ্যমন্ত্রী, ডি এফ ও এক কপি, এস পি আর শেষ কপিটা আমাকে।

নির্মলের পাশে মিন্টু। এত কথার ভারে ঝাপটা খায়। কোন্‌টার পর কোন্‌টা···। ফাং গোছ, ডেইসা, জালের বড় ভারুস, এলান খেলান এই তো তাদের জীবিকার ভাষা। সেখানে মিনিস্টার এস পি মাস পিটিশান সব ঘুলিয়ে নোনা জলের হঠাৎ তোলপাড়।

এম এল এ মানুষগুলোর চোখমুখ বুঝে কুণ্ডুপদকে বলে, তুমি এদের ড্রাফট করে দাও। হাতের লেখাই জেরক্স পাঁচ কপি—সই সাবুদ সহ যেন কাল দিয়ে যায়—?

পুরনো কর্মী কুণ্ডুপদ নির্মল মিন্টু দাসের দিকে তাকিয়ে বলে, আসুন ও ঘরে—

মানুষ চারজন কুণ্ডুপদর পিছু নিলে অফিসঘর খানিক ফাঁকা। চেয়ারে বসা লোকজন কথা তোলে, ওদের হাতে অগাধ পয়সা। রেশন ডিলারশিপের দরখাস্তটা হাতে শিবদাস জানা বলে, সার—ওরা এক একজন পাঁচ সাত লাখ টাকার মালিক—

—জানি।

—ওদের পাশে পাঁচ ছ কাঠা জায়গা বিক্রি হলে ওরা দাম তুলে দেয় কাঠা পঁচিশ ত্রিশ হাজার। এ দেশের লোক দামে পারে না।

এম এল এ হেসে বলেন, ভালই তো। ওদের টাকা দেশের লোক কিছু বের করে নিক—

ডিলারশিপ দরখাস্তকারি আবার বলে, বড্ড টাকার গরম দেখায় ওরা—

—টাকার তো ওই দোষ। এ-দেশের যার টাকা আছে সেও কি কম যায়?

শিবদাস জানা কথা থামায়।

স্থানীয় কলেজে বি এস সি পাশ করে দশ বছর বেকার। শহরের রাস্তা ঘেঁষে পৈতৃক জায়গা। আবাসিক হোটেল-কাম-বার খোলার জন্যে দরখাস্তে রেকমেণ্ডেশান পেতে ক'দিন ঘুরেছে অরবিন্দ ভুঁইয়া। অরবিন্দ এম এল এ কে বলে, দাদা—ওরা আজ রাজা—লাখো-লাখো টাকার মালিক কাল জাল ট্রলার বেচে ফকির—

—জলের ব্যবসায় তো এরকমই রিস্ক।

—তবে যতটা জানি ধার দেনা করলেও একেবারে মেরে দেয় নি। দু পাঁচ বছর পর আবার শোধ দেয়। যদি এ জায়গায় বসবাস থাকে—

এম এল এ সায় দেয়, ঠিক। তবে ওদের জন্যে তো অনেকে করে খাচ্ছে? স' মিলের কাঠ—ট্রলারে লাগায়। মুদিখানায় কম বাজার টানে? ডাক্তার ওষুধ? এক দেড় বছরের আর এম পি অ্যালোপ্যাথিস্টরা তো ওদের পয়সায় বেঁচে গেল। কায়দা শিখে নিজেরাও ব্যবসায় নামছে এদেশের লোক।

পাশের ঘরে কুণ্ডুপদ। বড় কাগজের তলায় কার্বন দিয়ে ডট পেনে চেপে-চেপে অক্ষর ফোটায়, টু দি মিনিস্টার ইনচার্জ, ফরেস্ট অ্যাণ্ড অ্যানিম্যাল হাসব্যাণ্ডরি···মহাশয়—

বুড়ো সুচিত্র দাস নির্মল আর মিন্টুকে দু হাতে ঢাইয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে,

বাবু—কুণ্ডুবাবু—

কুণ্ডুপদ লেখা থেকে মুখ তোলে, বলুন।

—বাবু আমাগো বাঁচান···আপনেকেও আমরা বাঁচামু···যতদিন আমরা বাঁচুম···।

কুণ্ডুপদ হাসে। ধক্ লাগে বুকের মধ্যে। বুকের ভেতর গোপন চরে।

(১৩)

সিক্স সিলিণ্ডার মেশিনে বড় ট্রলারের উপর ফাঁপা মোটা-মোটা আঠারো বিশ হাত ফাং বাঁশ। বড় বড় বেঁউতি জালে বেঁধে মুখ ফাঁক রাখতে লাগে। গাঙের পরে সমুদ্রমুখে জাল পাতবার জন্যে মোটা-মোটা ঝাউ খুঁটির গোছ, ফাঁপা লোহার পাইপ, মোটা কাছির বাঁধনে আটকানো দশ এগারোটা বেঁউতি জাল। বড় বড় বাঁশ, বোঝা বোঝা গরান খোঁটা সব থরে থরে সাজানো।

ছোট ট্রলার ভর্তি হয় তিন চাকা ভ্যান রিক্সা থেকে মাথা মুটে আড়াই মণি বস্তায় সরু চাল। চার মাসের কত চাহিদা, লোকজন কেমন খাবে, ঠিক নেই, তবুও ত্রিশ বস্তা ওঠে ট্রলারের খোলে। একশ লিটার পলিথিন ব্যারেলে ডিজেল পাঁচ খানা, আড়াইশ লিটারের দু খানা। দু'শ লিটারের খালি পলিথিন ব্যারেল দশখানা। নোনা সমুদ্রের মাঝে ফাঁড়ের মাঝি লেবারদের জন্যে ওইটুকু পানীয় মিঠেন জল। চার পাশে তো কটকটে নোনা ··নোনা জল। ধু ধু জলরাশি···। জোরে হাঁক দিলে কিংবা ট্রলারের হর্ন টিপলে ভোঁ বাজনায় খেয়াল হয় তফাতের ফাঁড়ে ভিন আড়তদারের জাল জেলে মাঝি লেবারদের। তারাও হাত নাড়িয়ে গামছা নাচিয়ে কিংবা ভোঁ বাজিয়ে ডাক সাড়া দেয়।

ম্যানেজার ট্রলারের উপর দাঁড়িয়ে লিস্ট ধরে মাল তোলে। কাঁচা বাজার আসে, ওষুধের প্যাকেট আসে, দেশলাইয়ের বাণ্ডিল, ঠোঙা-ঠোঙা বিড়ি।

মিন্টু দাসের গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মালপত্তরের তদারকিটা নিজ চোখে দেখতে এসে শুনতে পায় জলধরের তড়পানি, অই বিশালাক্ষী গঙ্গা বিষ্ণুর ঘট?

মালবওয়া ছোকরাগুলো মাথায় বোঝা শুদ্ধ থমকে দাঁড়ায়, বাবুর বারিতে তো ওই জিনিস নাই—

মিন্টু দাস ম্যানেজার জলধরকে বলে, ওই বাজার কে করসিলো?

—আপনার ভাই রতন।

—রতন কইগিসে?

—বারিতে। ইসাবগুল মিছরি আনতে—

সব শুনে বুঝে মিন্টু দাস বলে, আমি বাজারে যাইতাসি ভ্যানে। ঘটগুলা আনুম।

বড় পুলের তলা দিয়ে গাঙটা এখানে খালের মতো সরু। পর পর বারো চোদ্দ খানা ট্রলার সাজায় বারো চৌদ্দ জন আড়তদার। সাবাড় মালিক। সরে

দাঁড়ায় মিন্টু দাস। শীতের বিছানা—লেপ কাঁথায় ঠাসা বোঝা বয়ে নিয়ে যায় নরেন। গাট্টাগোট্টা ছোকরা। ছলধর হাঁক দেয়, জোরে আইবি তো কাজ আছে—

এখন ইট বিছোনো রাস্তায় ভিড়। মাথায় চালের বস্তা। বাঁশ খুঁটির বাণ্ডিল নয়তো বড় খেঁটে বাঁশের এ-মুড়োয় দু জন ও মুড়োয় দু জন মাঝখানে জালের স্তূপ। সব চলেছে যে যার মেছো ট্রলারে। বাড়ির বাচ্চারা বয়ে দিয়ে আসে ঝাঁঝ ঘণ্টা শাঁখ, জলের পলিথিন জগ।

চারখানা ছোট্ট লোহার চাকায় ইটের উপর ঘর্ষণে ঘড় ঘড় শব্দ। বিছোনো ইটের উপরে বেয়ে বেয়ে ঘড় ঘড় শব্দটা জোয়ারের মতো ছাপিয়ে যায়। রাস্তার দু পাশে ঘর বাড়ি, উঠোন, পুকুর। উঠোনে বাচ্চারা চঙমঙ করে। ধরতে চায়, শব্দটা কীসের? উৎসাহে ইট রাস্তায় দাঁড়ায়। দেখতে পায়, খালি গায়ে রোগা বুড়োটা সামনের চাকার পাশ থেকে বাঁধা দুটো দড়ি এক মুঠোর ধরে টানতে টানতে আসে। সবুজ রঙের জেনারেটর, মোটর বডিতেও রঙ চটা সবুজ। রোগা কালো বুড়ো দড়ি টানতে টানতে কাঁধের গামছায় চোখ মুখ মোছে। পেছনে বড় কাঠের বাক্স ভরতি বাল্ব, পাইপ লাইট, লেচি করে পাকানো তার। বাক্সটা ছোকরা ছেলের মাথায়। হন্তদন্ত হয়ে মিন্টু দাস গঙ্গা বিশালাক্ষী বিষ্ণুর ঘট কিনতে বাস রাস্তা মুখো। একেবারে সম্মুখে জেনারেটর। মিন্টু দাস বলে, শেখ চাচা এত বেলা করলেন?

শেখ আলাউদ্দিন চাকার দড়ি আলগা দিয়ে বাঁকা কোমর সোজা করে বলে, ভ্যান রিস্কার টায়ার বাস্ট করলে। তাইতে তো দু ঘণ্টা খেয়ে গেল বাবু—তার উপর তোমাদের দুর্গা পুজোর চাঁদার জুলুম—

—যান তারাতারি। জলধর ট্রলাবে আছে—সেই ট্রলারে তুলে দিবেন। জোয়ারে খাল পুরলেই ট্রলার ছাড়ুম—। যেতে-যেতে মিন্টু ভাবে, দুর্গা প্রতিমা জলে পড়লেই তো শীত। সিজিন শুরু। চাচা কিছু বলে না। শুধু ভাবে, শীতের বিছানা কাঁথা যে বাস রাস্তাব দোকানে? ছোকরাটা বাক্সের মাথায় যদি বিছানাটা তুলে নিত এক কাজে দুই কাজ সারা হতো। আবার তো ছোকরাটাকে পাঠাতে হবে।

ঘড় ঘড় শব্দে জেনারেটরটা দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যায় শেখ আলাউদ্দিন।

আড়তদারদের বাড়ির বউ মেয়েরা স্নান সারে। কাচা কাপড়-চোপড় পরে গৃহদেবদেবীর সামনে বসে মা গঙ্গার নামে কুলো সাজায়। ধান নেয়, দুর্বো দেয়। গোটা পান সুপারি, খই, চালভাজা, হাঁসের ডিম। কুলোর এক ধারে সরষের তেল, সিঁদুর, সোনা রুপো ভেজানো জল। দইয়ের ভাঁড়। তেল সলতে সাজানো প্রদীপ, আম্রপল্লবে ঘট নিয়ে বউ মেয়েদের দলটা কাঁসি ঘণ্টা বাজিয়ে বিশ পঁচিশ কণ্ঠে উলুধ্বনি রচনা করে।

আড়তদার বউদের পিছনে আসে মাঝি লেবারদের মা ভাই বোন বউ। গাঙ সমুদ্রে আড়তদারের ট্রলার ডিঙি ভালো থাকলেই তো তাদের স্বামী পুত্র ভাই ভাসুরদের ভালো থাকা? সুতরাং তারাও অনুগমন করে মালিক পরিবারের। হা হা গাঙ মত্ত সমুদ্রে কে যে শ্রমিক···কে যে মালিক! বিশাল আকাশ···তপ্ত

সূর্য আর একলা চাঁদ ছাড়া সঙ্গী কে আর আছে! পোর্ট ট্রাস্টের মানুষ বয়ার জাহাজ তো লোহার কাছি ছিঁড়ে নিখোঁজ বছর কয়েক আগে ঝড়ের তাণ্ডবে।

খালের জলে জোয়ার। ট্রলারগুলো মাল পাট গুছিয়ে যাত্রা উদ্যোগি। বাড়ির বউ মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে ঝাঁঝ ঘণ্টায় মনের আশঙ্কা দূর করে। দেব কৃপায় আকুল।

মিন্টু দাসের বউ নতুন কাপড় পরে কপালে সিঁদুরের টিপে শুদ্ধ রমণী। মা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা জানায়। ট্রলারের উঁচু আহ্নিক কাঠে সন্তানের মমতায় তেল মাখায়। খালের বুকে নোনা গাঙ সমুদ্রের জল। আঁজলা ভরে তুলে চান করিয়ে দেয়। তারপর সোনা রুপোর জলে আহ্নিক মাথা ধুয়ে দেয়। দইয়ের ফোঁটা লাগায়। সিঁদুর মাখায়। ধূপ গেঁথে দেয় পাশে। টাটকা ফুলের মালা পরায়। আদ্যিকালের দেবমূর্তি হয়ে যায়। প্রদীপ জ্বালায়। নারীকণ্ঠের সমবেত উলুধ্বনিতে মাঙ্গলিক বাজনা। পাড়াসুদ্ধ বউ ছেলে মেয়েরা খাল পাড়ে। পাশাপাশি ট্রলারগুলোয় উৎসব লাগে। উপার্জনের উৎসব।

মিন্টু দাসের বউ কুলোর খই ভাসিয়ে দেয় নোনা জলে। ভেসে যায় হাঁসের ডিমটা। চালভাজা দোল খায় নোনাজলের ঢেউয়ে। মা গঙ্গাকে অন্ন সমর্পণ করে অন্ন মাঙে এত মানুষের পেটের জন্যে। বলে, মাগো—দয়া করো। বড় কষ্টে ধার দেনা করে তোমার কোলে যাচ্ছে। রক্ষা করো—কৃপা করো—।

দু-হাত জোড় করে গড জানায় মিন্টু দাসের বউ। তারপয় প্রদীপ ঘট পাতায় সাজানো কুলো কাঁপিয়ে বরণ করে। নারীকণ্ঠের উলুধ্বনিতে আকাশ কাঁপে। ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ লাগে ট্রলারের গায়ে পাছায়। খুশির ঢেউ। গ্রহণের ঢেউ। বরণ থামলে বুকের মমতা চুঁইয়ে চোখে জল বউটার। ঘরের মানুষ ঘর ছেড়ে জল ভাসি হতে যাচ্ছে টানা ক'মাস…। মাটি ছেড়ে তো জলে রোজগার মানুষগুলোর…! বউটা হেঁট মুণ্ড হয়ে জানায় মা গঙ্গাকে।

তখন মিন্টু দাসের ট্রলারটা ভোঁ বাজায়। ক্রমে একটা দুটো…মায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ খানা এক সঙ্গে ভোঁ বাজায়।

ধীরে ধীরে স্টার্ট নেয়। জল কাটে। পাখা ঘোরে। বাঁশতলার বড গাঙে পড়ে ডাইনে বাঁক নেয়। শুসনির দ্বীপ ছুঁয়ে—লুথিয়ানার জঙ্গল বাঁয়ে রেখে এগোয় ট্রলারগুলো। বেলা বারোটা একটার রোদ আকাশময়।

কখনও নির্মলের ট্রলার এগোয় তো মিন্টু দাসের পিছোয়। মিদুলের ট্রলার গায়ের কাছে এসে স্পীড কমায়। বলে, ও মিন্টুদা—এই সিজিনে তো লোক পিছু ফরেস্টারের পাশ কাটানো হইল না?

মিন্টু ধাঁধায় পড়ে চট করে চেঁচায়, আগে চরে লামিয়ে তারপর না হয় লোক পিছু পাস কাটাই অইবে?

পরামর্শে মনে জোর পায়। মিদুলে ট্রলারের ড্রাইভারকে বলে, ন্যান। চালান জাহাজ—

পাখি ওড়ে, কুচো কুচো ভাটাম পাখি। দুই ডানার এক চিলতে লম্বা শরীর। আকাশের গায়ে আড়াআড়ি দু চেরা। চিকির মিকির ডেকে ট্রলার

ডিঙিয়ে গাঙের শূন্যতায় ভাসে। মাঝে মাঝে শুষি মেরে জলের কচি মাছ কিংবা পোকা ঠোঁটে ধরে, আবার ওড়ে। ভাসে আকাশে। পশ্চিমের রোদ পূবের লুথিয়ান জঙ্গলের সবুজে ঝলমল করে। ট্রলারগুলো আগু পিছু এগোয়। নোনা জলে ট্রলারের পাখার ব্লেড আঁচড় কেটে দূরত্ব ভাঙে। ক্রমশ বালিস্থানের চর নিকটতর হয়। এতগুলো ট্রলারের পাখার ব্লেডে নোনা জলে ক্ষণস্থায়ী ঢেউ মৃদু ধাক্কা দেয় চন্দন পিঁড়ি দ্বীপে। শহীদ অহল্যা বাতাসির চন্দন পিঁড়ি। ডাইনে রয়ালগঞ্জ··উনিশ'শ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশের কৃষক আন্দোলনে মুক্ত এলাকা গজেনমালি, গেরিলা বাহিনীর কমাণ্ডো বিজয় মণ্ডলদের দ্বীপ··· ফেরিঘাটের বাজার পার হয়ে সমুদ্রমুখী গাঙে পড়ে মানুষগুলো।

লোহার চারখানা কপাট লাগিয়ে চার কপাটি লক গেট। তার পাশ দিয়ে বালি খালা হয়ে সরু সোঁতা। এখান থেকেই পাঁক কাদা হারিয়ে সাদা বালি। মিহি সাদা বালি চর জল বাতাসে উঁচু নিচু ঢিপি হয়ে শুয়ে আছে। গা-পিঠ ছড়িয়ে চিল খালি ফরেস্টের গাছপালার মধ্যেও। বেলা তিনটের রোদ বালির কানায়-কানায় চিকমিক করে। ট্রলারের উপর দাঁড়িয়ে মিদুল দেখে। ছোকরা চেহারায় দৃষ্টি অনেক দূরগামী। একবার পিছনে তাকিয়ে ড্রাইভারকে খবর পাঠায়, স্পিড কমাও। পেছনের ওরা আসুক—

বুড়ো সুচিত্র দাসের ট্রলার মিদুলের কাছে এসে ঠেকে। আরও ত্রিশ বত্রিশ-খানা ট্রলার। এক ঝলকে মনে হবে লঞ্চ। লঞ্চ তো আর এতো ঢেউ সামলাতে পারে না। পারে না জাল বিছিয়ে বিছিয়ে গাঙ সমুদ্র ঘিরতে? তাই লঞ্চ ক্রমশ বাতিল। ট্রলার এসে দখল নিচ্ছে লঞ্চকে হটিয়ে।

মিন্টু ট্রলারের ডেক-এ দাঁড়িয়ে। নির্মল ড্রাইভারের কাঁচ ঘেরা কেবিনের পাশে দাঁড়িয়ে সাদা বালির চর দেখে। সরু-সরু ঝাউ চারা লাইন দিয়ে দোল খায়। টিউকলের পাশে টালি ছাউনি ঘর। মালবাবুর আড়ত খানিক তফাতে। টালি ছাউনি ক্যাম্প ঘর থেকে ধরণী হঠাৎ চেঁচায়, ও হায়দার?

হায়দার চেঁচায়, ও সুরেন?

ধরণী চেঁচায়, আমাদের ফরেস্টের সুধীর, বিশ্ব তোরা কোথায় কে? ড্রেসটা গায়ে দে—লাঠি নে!

জামার বুক পকেটে লাল সুতোয় বুনে বুনে লেখা সি কে এফ ও। ধরণী বলে, ছোট্—ছোট্। শালাদের একদম চরে লাবতে দিবি না।

ফরেস্ট গার্ড আর হায়দার সুরেনরা দৌড়য়। লাইন ধরে বসানো ঝাউচারা কাটিয়ে, গলে গালে বালি মাড়িয়ে ছোটে!

ট্রলারের তে-কাঠা সিঁড়ি বেয়ে নামে মিন্টু দাস, ওদিক থেকে নির্মল, ছোকরা মিদুল। কোমরের লুঙি গুটোয়, হাঁটু অব্দি জল। ঢেউ ছলাৎ ছলাৎ নাচে, হাঁট উপচে নোনা জল কোমর ভেজায়। হায়দার সুরেন, বনকর্মীরা লাঠি হাতে জল কিনারে তেড়ে এসে বলে, একদম চর লাববেন নি।

—সে কি। এই চরে যে আমরা আরত বসাই? সাবাড় পাতি ফি শীতে? ফি বচ্ছর?

—ও হবে নি এবার। ফরেস্টারের অর্ডার—বনকর্মীদের মধ্যে নীলাম্বর বলে।

নির্মল জল ভেঙে আর একটু চরমুখো। বলে, মিনিস্টারের সঙ্গে ফরেস্টারের কথা হইস্যে যে।

ফরেস্ট গার্ড নীলাম্বর বলে, সে আমরা জানি না। ফরেস্টারকে বলুন।

—ঠিক আছে। আমরা ফরেস্ট অফিসে যাইত্যাসি ?

ধরণী লাঠি হাতে ছুটে আসে, উঁহু। আপনারা গাঙ দিয়ে যান। চরে উঠবেন না, বেশ কড়া গলার স্বর।

মিন্টু দাস, নির্মল থমকে যায়। ভেতরে আতঙ্ক জাগে, বন্দুক নিয়ে টালি ছাউনি ক্যাম্পে কেউ আছে, নাকি ফরেস্টের বন্দুক গার্ড।

ব্যাপার দেখে মিদুল দাস ছোকরা লেবারদের মাথায় দু খানা ছোট ব্যারেল চাপিয়ে নোনা জল কেটে-কেটে বালি চরে ওঠে। ধরণী দেখতে পায়। হেঁকে ওঠে, হায়দার—নীলাম্বর—কারা নামছে যে চরে ?

ছুটে যায় হায়দার। ছক কাটা মাস্টার রোলে মজুরি। ধরণীর বিশ্বাস-ভাজন হতে কর্তব্যনিষ্ঠা দেখায়। লাঠি উঁচিয়ে বালির উপব দৌড়য়। পেছনে গম্ভীব চালে মোটা লাঠি হাতে ধরণী। গোটা ব্যাপারটায় নজর রাখে। নির্দেশ দেয়। পরিচালনা করে।

হায়দার হাঁকে, একদম লাববে নি।

—সে কি ? খাবার জল নাই যে ? একটু জল লইব না ? মিদুল বোঝায়।

ধবণী হাজির। হুমকি দেয়, আগে ট্রলারে উঠুন গিয়ে—

—সে কি। ভীষণ অবাক মিদুল। আডতদাররা যখন টিউকল বসিযে ছিল আট দশ বছর আগে···এক হাজার টাকা চাঁদা নিয়েছিল সুচিত্রবাবু। মিদুল দুম করে বলে ফেলে, আমাদের টাহায় তৈরি এই টিপ-কল। আমরা খাবার জল লইব না ?

—না।

—তাহলে মাইনেষরা খাবা কী ?

—যান সেই নারানিতলায়। সেখানে টিউকল আছে। ব্যারেল ভরান গে—

ছোকরা কর্মীরা কথার ফাঁকে গলে গেছিল চরের অনেক বালিতে। হঠাৎ লাঠি নিয়ে তেড়ে যায় ধরণী, বড্ড জোর তো—? বলেই লাঠি বাজায়। কপট প্রহার দেখায়।

লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসায়ী। এমন বন কর্মচারীদের কাছে হেনস্থা হতে মনে লাগে। যেহেতু রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশ হয়ে ভারত নামক ভূভাগের অতি ক্ষুদ্র স্থানে এমন ব্যবহার···। আড়তদারদের মনটা ভেঙে যায়। বিপন্নতায় চোখ মুখ ভারি। ছোকরা মিদুল ভাবে, তিন চারবার ভোট দিসি—পঞ্চায়েতে, এম এল এ, এম পি তে। রেশান কাডে নাম লিখা। দলিল খাজনায় আমার নাম···। তা হইলে আমি কেউ না। যা কিছু বলবার কইবার হক ওই জামার বুকে ছাপকাটা ছোকরা কটার···। নোনা জল বালি আঁচড়ে রোজগার। সেই রোজগারের পথ

বন্ধ···। তা হইলে প্যাটের ভতি ? মাছ শ্বকাইলে বোমলা র্বপোবটি লালপাতি শ্বটকি করিলে তবে তা বিক্রি ? রোজগার। উপায়। সেই রোজগার কি বনবিভাগ দিবে ? মন্ত্রী, রাষ্ট্র এস পি দিবে ? আমাগো সংসার খাবা কী ?

অল্প-অল্প শীতের প্রকোপ। স্বর্য তেজ হারিয়ে ডুব মারার ব্যবস্থা নেয়। বেলা ছোট হয়ে আসে। নোনা গাঙে ট্রলারগ্বলো মেসিন থামিয়ে ভাসে। নোঙরের কাছিতে টান। দোল খায় বড়-বড় চেহারায় ট্রলারগ্বলো।

দ্বজন ছোকরা লেবারের কাঁধে জল রাখা খালি ব্যারেল। একট্বও জল পায় না। সাদা বালির চরে টিউকলটা জল দিতে দাঁড়িয়ে। কল ঘেঁষে টালি ছাউনি ক্যাম্প। ফট করে হ্যাসাক জ্বলে ওঠে বেলাবালি। মিদ্বল দাস হঠাৎ আলোর ছটায় দমে যায়। ক্যাম্প ঘরটাকে গোপন অস্ত্রাগার বলে সংশয়। তখন অসহায় ভাবে ছোকরা মিদ্বল বলে, এ-সিজিনটায় যে মার খাবো রে ভাই ?

—কেন ? জম্ব্বতে যান। ধরণী শ্বভার্থীর মতো পরামর্শ দেয়।

—ফরেস্টারের অর্ডার ? ঢ্বকতে দিবে ?

—অফিসে যান—সব হবে।

হাওয়ার ঝাপটে খানিক শীত। একলা মিদ্বল নতুন শীতে আক্রান্ত হয়। খানিক দ্বলে ওঠে। ব্বকের মধ্যে দোলা চল।

পিছনের ট্রলারগ্বলোর আড়তদাররা চেঁচায়, ও নিম্মল, মিন্ট্ব—কী করবা ?

নির্মল হাত তুলে আশ্বাস দেয়, একট্ব থামেন। ভাবতে দেন—বড় বিপদ।

জলের উপর ট্রলার। ট্রলারের উপর নির্মল। নির্মল দেখতে পায় চরের সাদা বালির পর ফরেস্টের ফিশলট। ওপাশে বাইন গাছতলায় বালিস্থানের ন্বড়ি পাথরে কালী। ফিশলটের পর দেবপ্রবাস গ্রামের বাউণ্ডারি বাঁধ, বিজয়বাটির বনস্বজনের গাছপালার মধ্যে নোনা বাঁধ। বাঁধের উপর গ্রামের মান্বষ, বউ ঝিরা দাঁড়িয়ে অবরোধটা দেখে। দেখে শ্বটকি মাছের কারবারিদের দ্বরবস্থা। যাদের কাছে মজ্বর খাটতে হয়, ম্বখ শ্বনতে হয়। সেই বাব্বদের বেহাল অপদস্থতায় স্বখ পায়। গোপন স্বখ। মিন্ট্বর ট্রলারে উঠে নির্মল বলে, এইবার। অ্যাহন···। কি কর্বম ?

মিন্ট্ব দাস ক্লান্ত হয়ে বলে, এম এল এ ছাড়া উপায় কি ? কুণ্ডুবাব্বরে কইতে হইব।

—কে ? কে যাইবে তার তন ?

মিন্ট্ব এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে, মিদ্বল বিব্রতভাবে দাঁড়িয়ে। ডাক দেয়, মিদ্বল শ্বন।

—কি ?

—কুণ্ডুবাব্বর তন যাবা ?

—না। আমার চাল ডাল সব খ্বলা পড়ি আছে। বাঁধা ছাঁদা করতি অইব। না হলে সব—, বলতে-বলতে ট্রলার ভরতি লেবারদের দিকে তাকায়। চার মাসের জন্যে তিন হাজার কেউ বা পাঁচ হাজারে চুক্তিবন্ধ। সিজিনের শ্বর্ব তো আজ থেকে। একটা দিন কেমন করে যে কেটে গেল।

—তবে আপনে যান নির্মলবাবু। একটা ট্রলার লইয়া গাঙ বাইয়া যান। একেবারে সকালে তাগো এহ্যানে হাজির করবেন—, মিন্টু দাস অনেক ভেবে-ভেবে বলে।

নির্মল নিজের ট্রলার, মালপত্তর জাল ডিজেল ফেলে যেতে আশঙ্কা। তাই বলে, রাইতটা বরং নারাণীতলার ঘাটে থাকাই ভালো। শালার ফরেস্ট গার্ডদের বিশ্বাস নাই—

সুচিত্র দাস সায় দেয়, সেইটাই উত্তম। ওহ্যানে আমাগো দ্যাশের লোক আত্মজন আছেন। তার তন রাতটা কাটাইবেন। এহ্যানে তো লামতিই দিসে নি। খাবার জলও নাই—

নির্মল মিন্টুকে কাছে ডাকে, বনবিহারি এহ্যানে থাকে না?

—হ্যাঁ। বিজয়বাটি—

—তাকে যে চাই।

—ক্যান?

—সেইবার বারিতে খবর দিসিল? তারে কিছু খরছ দিসিলাম তো আমরা?

—হঁ, পাঁচশ টিয়া।

—আইজকে তারে ধরতি হইব। কিছু টিয়া দিয়া কবেন কাল পঞ্চাশ একশ জনা লোক চাই।

—কী হইব? বুঝতে পারে না মিন্টু।

—যারা আমাগো সাবাড়ে কাম করে তারাই অইলে চলবো। এডা খুব জরুরি—

—নারাণীতলায় ট্রলার রাইখ্যা তবে বনবিহারির তন যাইতে হইব—

—হঁ। গোপন রাখবা, বলে নির্মল তৈরি হয়। ট্রলারটা দোল খায়। মেসিন স্টার্ট নেয়। জল পাক মারে। ফেরা পথে যাত্রা করে সিজিন ধরতে।

(১৪)

যেহেতু ফাঁকা গাঙ সমুদ্র, বালিয়াড়ি, ঘিঞ্জি জনবসতয়ের আগেই এখানে ভোর ফোটে। পৃথিবীতে সকাল হয়। বাঁশ কাঠ জাল খাদ্য খাবার বোঝাই ট্রলার-গুলোয় মেছুড়ে লেবারদের গাদাগাদি। ছটফট করে তারা কূলে নামতে। মেসিন, স্টেয়ারিং একজস্ট পাইপ পাখা ব্লেড সব বিশ্রাম পেয়ে ঠাণ্ডা। শুধু নোঙরে মোটা কাছে বন্ধ পাশাপাশি ট্রলার জলে ভাসে। গায়ে-গায়ে অবস্থান নিয়ে জেগে থাকে। বুড়ো সুচিত্র দাস ট্রলারের উচ্চতম অগ্রভাগে আহ্নিক কাঠ ধরে দাঁড়ায়। বাঁয়ে ধু ধু জলের পর ইট বিছিয়ে বাঁধানো বাঁধে নোনা ঢেউয়ের আছাড় সামলে মৌসুনি দ্বীপটা। ভোর মেখে ঝিকমিক করে বাঁধের গা। সামনেই নারাণীতলার বোট ঘাটায় ফিশিং হারবারের কাজ চলে। মোটা-মোটা শাল খুঁটির পাইলিং করতে-করতে লোহা লক্কড়ের কপিকল থেকে ভারী ওজনের হ্যামার ধাক্কার শব্দ। শ্রমিকের শ্রম লাঘবকারী আওয়াজ "হেঁইয়ো আবার

মারো হেঁইয়ো—” আকাশ লালচে হয়। বক চিল ওড়ে। জলে ভিজে বাতাস শীত মাখে। বুড়ো সুচিত্র দাসের মালুম হয়। গেঞ্জিটা টেনে টুনে গা ঢাকে। ধীরে-ধীরে জল নামে।

ছোকরা মিদুল দাস কড়া শীত রুখতে উইণ্ডচিটার জ্যাকেট এনেছে। যদিও শীতের সবে পদচারণা, এই সকালে সেটাই গায়ে চাপিয়ে বুকের বোতাম খুলে দেয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে পিছনে গাঙ…গাঙ তো নয় সমুদ্র মুখ দেখে। ধু ধু নোনা জলের ছোট বড় ঢেউয়ের মধ্যে তাকায় দূরে। সামান্য সবুজ আভায় জলের মধ্যে গোলাকার ভূ-ভাগটা দেখে। ভাবে, ওই দ্বীপে যাইতে হইলে তো এ্যাহন দু-তিন ঘণ্টার ট্রলার ভুটভুটির জলপথ…। ওই দ্বীপে ব্যবসা…। ইচ্ছা করলেই তো এক বেলায় বাসন্তী ময়দান পাড়ায় বউ বাচ্চার খবর লইতে পারা যাইবে নি…। ভালো মন্দর খবর হইতে যে কত দূর…।

চরের খানিক বাদ দিয়ে বাঁধ। বাঁধের গায়ে দোকানপাট দু-চার খানা। চা মুড়ি বিস্কুট গায়ে মাখা সাবান। ছোট বড় ঝুপড়িতে ঘর সংসার। দো-চালা খড়ের ছাউনি মাটির দেওয়াল ঘিরে ভিডিও হল। লম্বা বাঁশের ডগায় মাইক খাটানো। পাশে ফাঁকা চালা। খেজুর চাটাই গোটানো। দেওয়ালে পোস্টার “লিখব পড়ব ভুলব না।” কালো বোর্ড দোলে। বালির উপর হাঁটে সুচিত্র দাস। ক'খানা সাবাড় বসে গেছে। গরাণ খোঁটার গায়ে সরু বাঁখারি বেঁধে বেড়া তৈরি। বেঁউতি জাল খুলে গোছগাছ শুরু! মোটা-সোটা চেহারায় আড়তদার সব তদারকি করতে করতে একবার দেখে। দেখে আবার নিজের কাজে এদিক সেদিক ছোটে। আবার ফিরে আসে জাল সেলাই করা লোকজনের কাছে। বাঁশ, গোছের কাছি গুছোয় কাজের লোকের সঙ্গে।

সুচিত্র দাস বলে, কবে আয়সেন গো বেয়াই মশায় ?

সুচিত্র দাসের ভাইয়ের মেয়ের শ্বশুর। লোকটা একবার শুনে তেমন মর্যাদা দেয় না। বরং আরও ব্যস্ততা দেখায়। তখন আঘাত লাগে সুচিত্র দাসের। যদিও বেয়াই মহায় ব্যস্ত…কিন্তু তার আরতের কাজ তো প্রায় গোছাই ফেলসে…। আর আমাগো ? এ্যাহন জলে…ভাসত্যাসি সব। ভাবতে-ভাবতে চরের চারদিকে তাকায় সুচিত্র। দোকানপাটের ডাইনে বাঁয়েও দেখে। শুধু বালি। কোথাও তো ছোট-ছোট ঝাউগাছ…লাইন ধরে ঝাউ চারা পোঁতা হয় নি। মনে ভাবে সুচিত্রবাবু, যতো গাছ দরকার শুধু আমাগো বালিস্থানের চরে…। ওই হ্যানে ফরেস্ট দরকার…। কাজের গতিতে বেয়াই ভুঞবাবু গায়ের পাশ দিয়ে যায়। সুচিত্র জিজ্ঞেস করে, বেয়াই মহায় বারির সব ভালো ?

বেয়াই ভুঞবাবু পাশ ফিরে দাঁড়ায়। বলে, ভালো আর থাকতে দিবেন আপনারা ?

—ক্যান গো বেয়াই মহায় ?

—আমাগো এই সাবাড়ের ট্রলার ডিঙি রাইখবার জাগা কুলায় না। তায় আপনেরা আয়সেন—

সুচিত্র আবেদন রাখে, আপনের দ্যাশ ছাড়ি আয়সেন প্যাটের লগে আমরাও তাই— ? মিলি মিশে ব্যবসা চালামু।

আর কথা বাড়াল না ভুঞ্জ দাস। কাছির গায়ে কটা বাঁধন আলগা জালটার, সেগুলো বাঁধতে দড়ি যোগায় লেবারদের।

সুচিত্র দাস দু-পা সরে আসে। শুকনো বালির উঁচু ঢিপি ঝরে ঝরে পাশের বালি তলে সমান হয়। বুড়ো সুচিত্র দাসের মনটা দমে যায়। ঝুর ঝুর করে ধসে যায়, একই দ্যাশের মানুষ···দ্যাশ ছাইড়া আইসি···এই ঘটনাবর্তে তৈরি বসবাসের ভূমিতল। বালির মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায় আত্মজন···এই পলেস্তারা লাগানো সম্পর্কের রচনা সৌধ।

মিন্টু দাস বাঁ হাতে লুঙির এক খুঁট তুলে খালি পায়ে বালি ভাঙতে-ভাঙতে এগোয়! মঙ্গল সাঁওতালের নামে মঙ্গলের চয়। ময়ূরভঞ্জ থেকে আনিয়েছিল লাটদার সাঁওতালদের। ব্রিটিশের কাছ থেকে পত্তনী নিয়ে লাট হাসিল করতে। বুড়ো মঙ্গল সাঁওতাল চরের এই কোণটায় জীবনের শেষ দিন কাটিয়ে বালি জল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সেই থেকে তো মঙ্গলের চর। যেহেতু এদিকটায় পুরনো বসবাস, গাছপালা বসিয়ে বালির ঝড় আটকে গাছের গোড়ায়-গোড়ায় বালির স্তূপ। ক্রমে-ক্রমে উঁচু বালির পাহাড়। তারপর একটু-একটু ঢালু হয়ে চরে, জোয়ার ভাটার চরে মিশেছে। বনবিভাগের রোপণ করা মোটা গোলপাতার বাইলো প্রজাতির লতাগুল্ম হাজার-হাজার ডগ ছেড়ে বালি আঁকড়ে রেখেছে। ধসতে দেয় না পাহাড় প্রমাণ বালির দেওয়াল।

ফাঁকা চরটার বাঁশ খুঁটি পুঁতে চালা তৈরি হয়ে গেছে শশধর জানার। পাশে গ্রামের বাসিন্দা। দু খানা ট্রলার করে ফিশিংয়ে নেমেছে। ব্যবসা বুঝে এ বছর মাছ শুকোবার সাবাড়টা বড় করে ঘিরছে। মিন্টু দাস থমকে দাঁড়ায়। ডাইনে বাঁয়ে দেখে বলে, আপনের এরিয়া কতটা গো বাবু ?

—কেন ? আপনি ফরেস্টারের লোক ?

—না।

—তবে ? কি জন্যে ?

—ভাবসি এদিক তন একটা সাবাড় বসানো লগে, বলে শশধরের দিকে তাকায়।

—অ। আপনারা বালিস্থানের কারবারি ?

—হুঁ।

—ফরেস্টারের পাস লিছেন ?

—লইব তারাতারি।

শশধর বেশ কড়া গলায় বলে, আমরা পুরানা কারবারি এই চরে। আমার এরিয়া, বলে বড় বড় পায়ে হেঁটে চরের অনেকখানি দখল দেখায়। তারপর মিন্টু দাসের দিকে তাকায়, এরপর করতে পারেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বলে শশধর জানা, তবে ফরেস্টের পাস দেখে আমার পাশে সাবাড় বসতে দেবো কিন্তু—

তখন থেকে থম মেরে দাঁড়িয়ে বুড়ো সুচিত্র দাস। বেয়াই ভুজবাবু বড় ব্যস্ত। ব্যস্ততা যেন তার আশ্রয়। অবলম্বন। কিংবা আড়াল। জল সারাই লেবারদের একজন বলে, বুড়োবাবু—

—কন্।

—এক ঘরে কয়জনায় শোওয়া যায়? বেশি হইলেই উপুর-উপুর অইবে? তহন কাউরিই ঘুম অইব?

হঠাৎ চর কাঁপিয়ে চিৎকার, ও সুচিত্তর বাবু—উ—উ—অ মিন্টু—উ বাবু—উ।

সুচিত্র দাস পেছন ফেরে। তাদেরই কর্মী ছোকরা বিশ্বনাথ। আরও কাছে আসে ছোকরা। হাঁক দেয়, সুচিত্তর বাবু—উ—

সুচিত্র দাস এগোয়। ছোকরা বিশ্বনাথ কাছে আসে। সুচিত্র জানতে চায়, কি হইস্যে?

—যাইতে হইব বালিস্থানের চরে। খবর হইস্যে। আর ছোকরারা কই গিসে?

—চায়ের দুকানে।

—মিন্টুবাবু?

সুচিত্র দাস উঁচু বালিয়াড়ার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, ওই তন হাঁটছিল তো—

—ওদিক যাই?

—হুঁ। আমি ছোকরাগুলারে ডাকত্যাসি—

বৃদ্ধ দেহে তড়বড় পা ফেলে সুচিত্র দাস। এক মুহূর্তের বেশি পা রাখে না এই চরে। বারি উপরে। এ চর তাদের নয়। তার নয়। এক ইতিহাসের উৎক্ষেপণে ছন্নছাড়া। এক ভাষায় কথা বলেও, রক্তের জনদের ছাড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েও তবু আত্মজন নয়, আত্মজনদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশিক্ষণ অবস্থান মঙ্গলের নয়। সুতরাং জোরে জোরে পা ফেলে।

বিশাল জল বিস্তার কাঁপিয়ে ত্রিশ বত্রিশখানা ট্রলার এক সঙ্গে স্টার্ট দেয়। পাখা ঘোরে ব্লেড জল কাটে, ভোঁ বাজে কেবিন ঘর থেকে। নোনা জল তোলপাড়। হঠাৎ মিদুলের ট্রলার বাঁক নেয় ডান দিকে। গভীর সমুদ্রের দিশায়।

মিন্টু শুধোয়, মিদুল কই যাবা?

—জম্বু।

—ক্যান?

উত্তর দেয় না। ট্রলার বাক্য বিনিময়ের নৈকট্য ছাড়িয়ে তফাতে। মাঝখানে নোনাজলের দূরত্ব। মিন্টুর বুকে লাগে, এই দুঃসময়ে সঙ্গীহারা…! চারদিকে তাকিয়ে নজরে রাখে সব ট্রলারগুলো। মানুষের সংখ্যা কমতে দিতে চায় না। ড্রাইভারকে খবর দেয়, ট্রলারটা সকলের পিসনে পিসনে চালা—। আগে যাইতে অইবে না।

নোনা জল কেটে-কেটে ট্রলারগুলো এগোয়। গাছপালার ঝোপ জঙ্গল পার

হয়ে বাঁয়ে বাঁক নিতেই বালিস্থানের চরভূমি। বেলা দশটার রোদ পড়ে সাদা মিহি বালিচর হাজার রুপোর গহনা গায়ে পরে যেন শুয়ে আছে। ঝিকমিক করে সে বালি। বুড়ো সুচিত্র দাস প্রণাম করে বালিচরের উদ্দেশে, আমাগো মা। অন্নদাত্রী মা—

কিনারে এসে থমকে যায় সকলে। সাদা বালির উপর নির্মল…নির্মলের পাশে মানুষটাকে ঘিরে ধরণী নীলাম্বরদের ভিড়। কথা কাটাকাটিতে মগ্ন সবাই। এক ড্রাইভার হঠাৎ ভোঁ বাজায়। নির্মল ভিড় ঠেলে ছুটে এসে ট্রলার-গুলোর দিকে হাতছানি দিয়ে আকুল কণ্ঠে ডাকে। ট্রলার কিনারে ঠেকিয়ে জল ঝাঁপায় ছোকরা লেবাররা। উত্তেজনায় গেঁটে বাঁশ খুঁটি হাতে হাতে। ছোকরা-গুল্যে ভিজে গামছায় ছুটে আসে। মিহিবালি রোদে চিকমিকিয়ে হাওয়ায় ঝাপটায়।

ধরণী বলে, থামুন—ওই সাহেবরা আসছে। একদম চরে লাববেন নি।

নির্মল তড়পায়, আমরা এমনি আসছি নাই। অর্ডার লইয়া আইছি—

—কই অর্ডার দেখি।

বেশ জোরে ধমকি দেয় নির্মল, তোমার এত কেন? তুমি কি অফিসার?

ফরসা মুখ, থুতনির কাছে ক'গাছি লালচে দাড়ি প্যান্ট শার্ট পরে দ্রুত পা ফেলেন মুখার্জি সাহেব। সঙ্গে সর্বক্ষণের কর্মী সঞ্জয়। রোগা চেহারায় ল্যাক-প্যাক পা ফেলে। পেছনে কটা ছোকরার হাতে লাঠি। গায়ে ফরেস্টের খাকি জামা। বাঁধে সীতাকান্তবাবু দাঁড়িয়ে। সীতাবাবু বলে, সার আমরা আছি—খবর দিবেন। মুখার্জি সাহেব শুধু একটাই কথা বলেন, আমাকে না বলে যাবেন না। মুখার্জি সাহেব বাঁধের ঢাল বেয়ে নিচে নামেন।

বাঁধের উপর দেবপ্রবাস, বিজয়বাটির লোকজন। সীতাকান্তর পাশে ভূপতি তড়পায়, শালার বাংলাদেশিরা। লাখ লাখ টাকা কামাইতেছে—আর জায়গা কিনতিছে। আমরা জঙ্গল হাসিল করছি ওরা কিনে ফেলাচ্ছে। আমাদের দেশ আর আমাদের রাখবে নি—।

বনবিহারী জনা সত্তর লোক নিয়ে কালীর থানের মেটে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। মাঝে-মাঝে বলে, তবু তো ওরা শীতের মরসুমে খটি বসায় বলে তোমরা খেটে খুটে সাত আট মাসের খোরাক পোশাকের পয়সা কামাও—

পাঁচ ছ'জন মেয়ে মজুর বলে, শুধু আমরা গো বাবু? কত পুঁই শাক বেচে দেশের লোকেরা, জানু?

মুখার্জি সাহেব ক্যাম্পের কাছাকাছি হতেই কুণ্ডুপদ বলে, স্যার। নমস্কার।

—নমস্কার। কোনো উচ্ছ্বাস নেই।—বলুন।

চারদিকে সাবাড় মালিক ঘিরে। তাদের দেখিয়ে কুণ্ডুবাবু বলেন, এতগুলি মানুষ যে চরে বসতে চায়?

—সে কী করে সম্ভব? চার হাজার গাছ পোঁতা হয়েছে।

—পোঁতা হোক।

ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হবে, মুখার্জি সাহেব সরকারি মর্যাদায় কথাগুলো

চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেন।

কুণ্ডুপদ এত মানুষের সামনে নিজেকে হীন করতে চায় না। বলে, এম.এল.এ. সাহেবের সঙ্গে ডিপার্টমেণ্টের কথা হয়ে গেছে।

—হতে পারে। আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন নেই। চিঠি নেই…?

—এসে যাবে।

—যতক্ষণ না আসছে চরে কেউ খুঁটি, আড়ত কিছু খুলবেন না।

—কিন্তু এতগুলো মানুষের জীবিকা—কত স্থানীয় লোকের রোজগার—সে সব যে ক্ষতি হয়ে যাবে? কুণ্ডুবাবু যুক্তি দেখায়।

মুখার্জি সাহেব বলেন, আমার যে চার হাজার গাছ—আর ছ'মাস গেলে কত লক্ষ টাকার স্থায়ী রেভিন্যু আনবে, জানেন?

হঠাৎ বাঁধের উপর চিৎকার। একসঙ্গে মিলিত আওয়াজ "গাছ পোত, বাঁধ বাঁচাও", আবার মানুষের চিৎকার "একটি গাছ একটি প্রাণ" "গাছ পোত, বাঁধ বাঁচাও"।

মুখার্জি সাহেব একবার পিছনে তাকান। সীতাবাবুর বুদ্ধিতে বুকে বল পান মুখার্জি সাহেব।

—কিন্তু সার…, কুণ্ডুপদ নতুন সামাজিক ব্যাখ্যা আনতে তৈরী হয়।

—বলুন?

—ভৌগোলিক বিচারে—মানে নদী-নালার অবস্থান গত কারণে আপনার একটু ভুল হয়ে গেছে।

রেগে ওঠেন মুখার্জি সাহেব।—মানে? এই চর গাছ রোপণের অযোগ্য?

—ঠিক তা নয়। তবে গুরুত্বটা ঠিক জায়গায় পড়েনি।

—কী বলছেন? উপরের দক্ষ অফিসাররা এতই ভুল সিদ্ধান্ত দেবেন?

—না। তাঁরা এখানকার ভৌগোলিক ছাড়াও সামাজিক পরিস্থিতিটা ভালো জানতে পারেননি—

মুখার্জি সাহেব উদ্বিগ্নভাবে তাকান।

কুণ্ডুপদ বক্তব্যটা চালিয়ে যায়, চার হাজার গাছ ঠিক আছে। কিন্তু পাঁচ ছ'হাজার লোকের আট দশ মাসের নগদ মজুরি প্রাপ্তির জায়গা হল চার মাসের এই চর। লক্ষ লক্ষ টাকার ড্রাইফিশ পণ্যটি ভারতের কতকগুলো রাজ্যে যে চলে? এর সঙ্গে জড়িত মানুষ…

বাইন গাছের ছায়া ছাড়িয়ে মানুষগুলো এগোয়। এক সঙ্গে চেঁচায়, "কাজ চাই, কাজ দাও। খেটে খেয়ে, বাঁচতে দাও"।

নির্মল তাকায় মিন্টুর দিকে। মিন্টু তাকায় বনবিহারী…বনবিহারী কোথায়—হদিশ পেতে।

কুণ্ডুবাবু বলে, স্যার আপনার অবগতির জন্যে বলছি, "গাছও চাই, মানুষের জীবিকাও চাই। গাছও থাকবে—সাবাড়ও হবে"—

হঠাৎ মিন্টু দাস চেঁচায় মেছো লেবারদের দিকে, হই তোরা খুঁটি গাঁথ। আরত বসা—তিরপল টানা। উপাশের গাছগুলারে উপড়ি ফেলায় দে—

বুড়ো সুচিত্র দাস হামলে ছুটে যায়, হুঁ। এতো চর নয়, আমাগো ভাতের থালা। ধরণী বাধা দিতে দৌড়য়। চার পাঁচজন ছোকরা মেছো লেবার পাঁজা কোলা করে আটকায়। হায়দার সুরেন থমকে যায়। নির্মল কুণ্ডুপদ মুখার্জি সাহেবকে নিরাপদে রাখে।

চকিতে ঝাউ চারাগুলো উম্মুলিত। একটা একটা চারা উপড়োয়। দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে। বুড়ো আর অবোধ শৈশব সম্বলকারি মধ্যবয়সী কর্মীরা দেশ বিভাগে ছিন্নমূল হওয়ার আক্রোশ মেটায়।

মুখার্জি সাহেব ধীরে ধীরে বালি মাড়ায়। বালি ছেড়ে বালি অংশ মাটিতে পা রাখেন। ক্রমে ক্রমে বাঁধে ওঠেন। বাঁধ চলে গেছে সোজা চিলখালির ফরেস্ট অফিস। বাঁশ খুঁটির খট্‌খট্‌ শব্দ। চরের বুক খুঁড়ে জীবিকার ছাউনি। খুঁটির উপর হোগলা চাপে, ত্রিপল চাপে। ট্রলার থেকে জাল নামে, চালের বস্তা আড়ত ঘরের মাচায় টাল দিয়ে সাজানো হয়।

পুবের আকাশ ফুঁড়ে পূর্ণিমার চাঁদ। শীতের ছোঁয়ায় লুথিয়ানা জঙ্গলের কচি পাতা জ্যোৎস্না ধুয়ে দেয়। মৃদু বাতাসে টল টল করে। জ্যোৎস্না নোনা গাঙ সমুদ্রে ধাতব তরল। গাঙ সমুদ্রে ঝিলমিল তরল ফণা। হাওয়ায় ঠাণ্ডা। সাদা মিহি বালিতে জ্যোৎস্না গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝিকমিক করে।

সুচিত্র বুড়ো ধীর গলায় কুণ্ডুপদকে বলে, বাবু পুলিশ থানা হইবে নাকি?

—হতেও পারে! কিছু অপরাধ তো হয়েছে—?

—হুঁ।

—তাহলে বিত্তান্ত সব বলবেন। একসঙ্গে দোষ স্বীকার করে সালে শাস্তি নিতে চাইবেন—

—হুঁ। ঠিক কইসেন।

স্টোভে চা তৈরি হয়। বালির উপর গোল হয়ে বসে চা খায়। ক্লান্ত নির্মল। হাওয়ায় আচ্ছন্ন মিন্টু দাস। বুড়ো সুচিত্র বলে, কুণ্ডুবাবু—

—বলুন?

—গোটা পিথিমী দেশ সবই তো অরণ্য জল আছিল। অরণ্যের কোলে মাইনষে ঘর বাঁধে, জলের কূলে ঠাঁই লয়।…সহাবস্থান…।

চা খাওয়া হতেই কুণ্ডুবাবু উঠে দাঁড়ায়। জ্যোৎস্নায় জুতো জোড়া স্পষ্ট। দূরের বাঁধও পরিষ্কার। উপড়ানো ঝাউচারার কাছে গিয়ে একটা দোমড়ানো চারা তুলে নেয়। মূলোচ্ছেদে আর সারাদিনের রোদে ঝলসে গেছে। জীবনের বিরুদ্ধে জীবন পেতে চেয়েছিল গাছটা! মেছোদের তাপে পুড়ে গেছে! চারাটা হাতে নিয়ে কুণ্ডুপদ বলে, নির্মলবাবু—

—আজ্ঞে?

—ফিশলটের আলের ওপারে তো অনেক জায়গা খালি?

—হ্যাঁ।

—ওখানে পুঁতে দেবেন গাছগুলো?

—হ্যাঁ। দিবো, বলে নির্মল।

চারা গাছটা ধরে কুণ্ডুপদ বলে, দিন তো এটা পুঁতে।

শাবল হাতে কর্মী আসে। কোদাল হাতে বয়স্ক লোক আসে। শাবল দিয়ে বালি অংশের মাটি খুঁড়ে ঝলসানো চারাটা পুঁতে দেয়। জল দেয়। ঝিমিয়ে থাকে চারাটা। জ্যোৎস্না জড়িয়ে যায় ঝলসানো পাতায়। গাছটায় জল ঢালে।

শেখ আলাউদ্দিন চাচা জেনারেটারে হ্যাণ্ডেল মেরে স্টার্ট দেয়। মিন্টু দাসের আলগা আড়তে দশ বারোখানা বাল্ব জ্বলে। সেই আলোয় ঝাউচারাটা দেখতে-দেখতে কুণ্ডুবাবু ভাবে,…শিকড় ছড়াতে গেলে তো ঠিক ভূগোল…ঠিক মাটি চাই…!

(১৫)

বর্ষার জল আর রোদ বাতাস পেয়ে বাইন গাছটা তেজী। ডালপালা ছড়িয়ে মগডালটা সবুজের চূড়ো। সাদা মিহি বালির উপর গাছটা দলছুট হয়ে একলা। গোটা গোটা সবুজ পাতায় জ্যোৎস্না।

জ্যোৎস্না চরের সাদা বালির উপর গড়িয়ে সমুদ্র উপচোনো গাঙের জলে। নোনাজলে ফরফরাস আকাশের নক্ষত্রের মতো ঝিকমিকিয়ে ভাসে।

বিস্তীর্ণ সাদা নরম মিহি বালির চর। বালিস্থান। গোটা বালিস্থানে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ। বাঁশ-খুঁটি কাটা, পোঁতার শব্দ। খটিদারদের আড়ত হচ্ছে। দ্রুত সিদ্ধান্তে বিশ-বাইশখানা আড়ত বসার আয়োজন।

কোঁকড়ানো চুল, সরু-নাক ছোকরা আড়তদার মৌর্য দাসের। কালো ব্যাগিস প্যাণ্ট, গায়ে চেক-কাটা চাইনিজ শার্টে রোগা ছেলেটা ভারিক্কি চালে জেনারেটার মিস্ত্রিকে বলে, বিলাস তোমার হইস্যে ?

লম্বা বাঁশের ডগায় পাইপলাইটটা ভাল করে তার দিয়ে বাঁধে। মৌর্য দাসের মুখের দিকে চেয়ে ছোকরা মিস্ত্রি বিলাস বলে, এই তো এবার সবুজ সিলোফিনে নিয়নটার গা জড়াবো—

—তারপর ? কানেক্‌শান ?

বিলাস বালির উপর নেতিয়ে থাকা লাল-কালো তার দড়ির মতো টেনে তুলে দেখায়, বাঁশ থেকে সোজা চলে গেছে মেন তারে—?

ব্যাগিস প্যাণ্টের ঢোলা পকেট থেকে হাত বের করে মৌর্য বলে, প্রথম আলো জ্বললে এইটা—, পট করে নিজেকে শুধরে নেয়, মন্দির ?

বালি পাড়িয়ে দু-চার পা এগিয়ে যায় ছোকরা আড়তদার। একদিকে লম্বা করে খুঁটি পুঁতে পুঁতে মধ্যিখানের মটকা মাত্র সাতফুট উঁচু। দু-পাশে ফুট-পাঁচেক উঁচু হোগলার বেড়া দিয়ে দেওয়াল। ধু-ধু ফাঁকা চরে সমুদ্রের আলগা হাওয়ার ভয়ংকর দাপট। কার্তিক শেষে শীতের আবহাওয়া। ঝড়-বাতাস যদিও নিস্তেজ, মাঝে-মাঝে দমকও তো বেশ। তাই এই সামান্য উচ্চতা, ঢুকতে-বেরুতে নতমস্তক। নতমস্তক আড়তের প্রবেশপথে হোগলা ছাউনি মন্দিরে, সম্মুখে বিশাল সমুদ্রের মা গঙ্গাদেবীর পদতলে, কৃপাভিক্ষার মানসে।

চার হাত বাই চার হাত চৌকো খোলে বুক-গলা অব্দি উঁচু চারখানা খুঁটির ঠেকনায়, হোগলার মাথা মুড়ে মন্দিরঘর। এখনও দেবদেবীর ঘট বসেনি। মৌর্য চেঁচায়, ও বিলাস ?

—দাদা ?

—মন্দিরের আলোও একসঙ্গে জ্বলা চাই কিন্তু—

—জ্বলবে জ্বলবে। ঠাকুরের দয়ায় সব। ঠাকুর থান জ্বলবেনি মানে ?

লুঙির উপর ফুলহাতা সাদা হাওয়াই শার্ট। কাজের চোটে আড়তদার মিন্টু দাস হুটপাট করে হাতা গুটিয়ে ছ-ফুট খুঁটি ধরে হাঁকে, হই সীমন্ত—এই খুঁটা কে পুতসে রে—? তাগো ডাক—

মেছুড়ে ছোকরা শ্রীমন্ত শাবল হাতে কাছে আসে, ক্যান ? কও—?

আড়তদার মিন্টু দ্যাসের উঁচু হনুর ওপাশ দিয়ে চকচকে চোখে তীক্ষ্ন দৃষ্টি। রেগে বলে, দ্যাহে-শুনে কাম করবা তো ?

শ্রীমন্ত খুঁটির একটু তফাতে সরলরেখায় দাঁড়িয়ে সম্মুখ-বরাবর কখানা পোঁতা খুঁটির সোজা তাকায়। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলে, ইটা তো ছোট ধীরেন পুত্সে—

—ধীরু কোনহানে ?

—রান্নাশালে বেড়া দিতাছে।

মিন্টু দাস আর দাঁড়ায় না। লুঙির এক খুঁট ধরে বালির উপর হাঁটে। হাওয়াই চটির ফটাস্ ফটাস্ শব্দ হারিয়ে নরম বালিতে বসে যায়। পায়ের গতিতে রোষে দ্রুততা কমে। কাছে গিয়ে মিন্টু দাস অবাক! খুঁটিখাটা বাঁশ-বাঁখারির কাঠামো আন্দাজ করে বলে, হেই তুরা কী বানাইতেসিস ? আরত না রান্নাশাল ? রান্নাঘর যদি এতবর হয়—অফিসঘর, গো-ডাউন, লেবারদের ঘর কতদূর যাইবে ? নিকুঞ্জবাবুর সাবাড়ে এরিয়ায় ?

শ্রীমন্ত ছোট ধীরেন কাছে আসে। পেছনে পেছনে আরও চার-পাঁচজন। বুড়ো শেখচাচা সোজা দাঁড়ায়। মিন্টু বলে, তোরা রান্নাঘর ছুটো কর। অফিসঘরে মাচা বাঁধার বাঁশ কাঠ পামু কই ? উপাশে আটবিঘা বালি বেরা দিতে অইব না ? মাছ শুকাবি কোনহ্যানে ? বেরা দিলেও সুরি অয়—তবু ঠিকঠাক বেরা তো চাই-ই—

একে জ্যোৎস্না তার সঙ্গে শেখচাচার জেনারেটারের দশ-বারোখানা বাল্ব, পাইপলাইটের আলো, মানুষগুলোর পরিশ্রান্ত মুখে, কপালে ঘাম। কার্তিকের সামান্য শীতেও বেশ দরদরিয়ে বেয়ে যায়। একটু একটু উত্তুরে হাওয়া, হাওয়ায় নোনাজলের পাশে মৃদু শীত। কথার ফাঁকে জিরানো। হাওয়া লাগে গায়ে। ঘাম জুড়োয়। শ্রান্তি ধোয়। তাই বোঝানো হলেও দাঁড়িয়ে থাকে। কাজে জুততে চায় না।

বুড়ো সুচিত্র দাসের গালে দু-তিন দিনের আ-কামানো দাড়ি। সাদা খোঁচা খোঁচা, রোদে-জলে গায়ের রং যৌবনেই তামাটে। এই বয়সে সে রং আরও ঘন।

মাড়িভরতি কচি-কচি দাঁত গায়ে-গায়ে বন্ধ। দু-হাত জোড় করে কুণ্ডুবাবুকে বলে, বাবু আপনে আমাগো লগে যা করসেন তার মূল্য দিমু ক্যামনে ?

বাপের বয়েসী লোক। একই বাংলা ভাষা হলেও ভিন্ন সুর। একদা একই দেশ হলেও ভিন রাষ্ট্রে বয়েস কাটিয়ে এখন এদেশে বসবাসী। মনুেষটাকে দেখে ··দেখতে দেখতে কুণ্ডুপদর মনে হয়, নিজেদের বাপখুড়োরাও তো উপকার পেলে এমন হাইফাই আকুতি দেখায়। তাহলে দেশ, ভাষা, জীবিকায় কী এমন তফাত! তবে যে কথায় কথায় আমার কালীনগর আটে নম্বরের লোকেরা বলে, বাংলাদেশিরা···ওই বাসন্তী মাঠের লোকেরা ? ওদের ভাষা বোঝাই যায় না। আর কাজ বাগাতে ওস্তাদের ওস্তাদ! কাজ বাগাতে কি এখানকার লোকেরা কম আসে ? হোটেল খুলতে অরবিন্দ কম হাঁটাহাঁটি করছে এম এল এ-র কাছে ? এম এল এ তো গত রাতে জানতে চাইলে, কুণ্ডু—অরবিন্দর ব্যাপারে কী করা যায় বল তো ? এ শহরে তো এমন হোটেল ফোটেল নাই। দূর দূরান্তের লোকও আসে। বাস লঞ্চ ফেল করে। তারাও তো ভাল ঘর—ভাল খাবার দাবার খোঁজে।

চুপ করে ছিল কুণ্ডুপদ।

এম এল এ বলেছিল, বুঝেছি। আবাসিক হলে মেয়েছেলের উৎপাত বাড়বে। ছেলে ছোকরারাও মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর ভাড়া করবে—কিন্তু···

—কী কিন্তু ?

—অরবিন্দটাও তো পাশ করা বেকার।

—হ্যাঁ।

—তার বাবার মণিহারি দোকান আছে। তার নিজের তো কিছু নাই ?

—তাও ঠিক। কিন্তু···

—আবাসিক হোটেল হলে স্থানীয় ছেলেমেয়েরাও বাজে ব্যাপার দেখে সহজে লোভী হবে। এই তো ?

—পরিবেশ···সামাজিক প্রভাব···

—কেরোসিন ডিলাররা অনেক ভাই। ওরাও তো চাইছে এরকম একটা আবাসিক খুলতে ?

হাঁ-করে তাকিয়েছিল কুণ্ডুপদ!

—তাহলে ? তাদের রেকমেণ্ড না করলেও উপরতলার লোকজন ধরে করিয়ে নেবেই।

—তাই!

—হুঁ। সে ক্ষমতা কেরোসিন ডিলারদের আছে।

কোনও যুক্তি খাড়া করতে পারেনি কুণ্ডুপদ। এতবড় রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার কোন দূরতম অবস্থানে মাত্র সাধারণ কর্মী কুণ্ডুপদ। ভীষণ জেদী। আবার নির্দেশের প্রতি অনুগত। তার ধারণায় কুলোয় না। চুপচাপ থেকে এম এল এ-কে দেখে।

এম এল এ বলেন, ফাঁকা মার্কেট। এমন হোটেল নাই যখন করুক না হয় এ দেশেরই ছেলে। তবু সুযোগটা অগ্রিম পাক অরবিন্দ—?

কুণ্ডুপদ উত্তর দেয়নি। নিজের মধ্যে গুমরে ছিল। কতবার যে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নাটক-জলসা, চৈত্র-বৈশাখে টেনিস বল পায়ে পিটিয়ে খেলার কম্পিটিশান…এইসবে কিশোর-কিশোরীদের জমিয়ে রেখে একটা সৌহার্দ্য, বন্ধুত্বের বাঁধন তৈরি করেছিল। যুবতী মেয়েদের, বয়েসী বউদের শুধু মেয়ে বা নারী হিসেবে দেখার চোখ থেকে সরিয়ে সহযাত্রী, সাথী এই ধারণায় আনতে চেষ্টা করেছে। তার কাছ থেকে মতামত জানতে চেয়েছিলেন এম এল এ। তাই বোবা মেরে উত্তর দিয়েছিল কুণ্ডুপদ। যা বোঝার বুঝেছিলেন এম এল এ।

মিন্টু দাস জোরে জোরে পা ফেলে। ফাল্গুন-চৈত্রের দুরন্ত হাওয়া, বৈশাখের খর দহন চরের বালি শুকিয়ে ঝুরঝুরে। ফাঁকা চরে উন্মাদ বালিঝড়। উঁচু-নিচু ছোটখাটো বালির ঢেউ। জলবর্ষায় ভিজে শক্ত হয়ে বালিস্থান।

মিন্টু দাসের জুতোসুদ্ধ পা ডুবে যায়। দ্রুত পা তুলে তুলে হাঁটে। জ্যোৎস্নায় চিনতে পারে কুণ্ডুবাবু হাঁটছে। কিংবা কুণ্ডুবাবুকে এগিয়ে দিচ্ছে বুড়ো সুচিত্র আর ওপাশে নির্মল।

মিহি বালি মিন্টু দাসের হাওয়াই চটির ডগায়। পায়ের তলায় গুঁড়ো বালি। হড়কে যায় পায়ের পাতা ফিতেবন্ধ জুতোর খাঁচা থেকে। হঠাৎ জুতো-জোড়া হাতে নিয়ে খালিপায়ে হাঁটে। বাঁহাতে জুতোজোড়া থেকে মিহি সাদা বালি জ্যোৎস্নায় ঝরে ঝরে পড়ে।

মিন্টু কাছাকাছি হয়ে বলে, কই যান গো কুণ্ডুবাবু ?

নির্মল পাশে তাকায়। সুচিত্র দাস হৃষ্টমনে বলে, বাবুরে তুল্যা দিমু।

—ট্রলারে ? নিম্মলবাবুর ?

—হুঁ। সায় দেয় সুচিত্র দাস।

নির্মল ফিরে তাকায়, তোমার ট্রলারটা দিবে ?

—হুঁ, ব্যস্ত হয়ে ডাক দেয় সারেং নন্দ মণ্ডলকে।

—আচ্ছা, হইস্যে হইস্যে। আমাগো ট্রলারে সারেং আছে—নামে নাই চরে।

এক মানুষকে ঘিরে তিন মানুষে হাঁটে। বালি পাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে নোনা-জলের দিকে। কার্তিক শেষের মৃদু হাওয়া। নোনাজল গড়িয়ে কিনারে চপ্‌চপ শব্দ। ঝিকমিকি জ্যোৎস্না গাঙ ছাপিয়ে সমুদ্রমুখে। নির্মল হাঁক দেয়, ও কেতন—কেতন—এ—এ

চপ্‌চপ্ জলের শব্দ ট্রলারের কাঠের গায়ে। কেবিনঘরের মাথায় ফুটআড়াই কাঠের খুঁটির ডগায় একখানা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে। বাল্বটা ট্রলারের অবস্থান জানিয়ে জ্বলছে। জ্যোৎস্নায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ফুট লম্বা জলযানটা স্পষ্ট দৃশ্যমান।

ট্রলারের আহ্নিক কাঠের ভাঁজে হাত রেখে সাড়া দেয়, কে ? বাবু ডাকছেন ?

—কেতন তুমি এই বাবুরে লইয়া যাও নামখানায়—

—তারপর ?

—ট্রলার ফিরে আইবে।

—দু লিটার মবিল হলে ভাল হয় যে? কেতন জানায়।

—অ। ঠিক আছে। নিমুনে পাম্পের তনে।

একদম জলকিনারে দাঁড়িয়ে চার মানুষে। কেতন সুইচ টিপে বড় আলো জেবলে দেয়। চকিতে নোনাজলে সরু সরু ঢেউরেখায় অসংখ্য আলোর স্রোত।

বড় আলোয় মানুষ চারজনকে চিনতে পারে কেতন। মাঝখানে কাপড়-পাঞ্জাবি পরা মানুষটাই যে বাবু, বুঝতে কষ্ট হয় না। বরং ভাবে, লোকটা শুধু বাবু নয়, এই চরের ত্রাণকর্তা। আড়তদার…সাবাড় মালিকদের কাছেই নয়, তার কাছেও। বারো মাসে মোট কুড়ি হাজার টাকা বেতন চুক্তি। খাওয়া খরচ কোম্পানির।

সুতরাং আড়তদার এই চরে সিজিন না ধরতে পারলে যে কুড়ি হাজার পেতে কষ্ট। সেই উপলব্ধি থেকেই কেতন নিজে বলে, ডিঙি লাগাবো—?

—নাই তো কি? কথাটার মধ্যে নির্মলবাবু নয়, নির্মলবাবুর মালিকানা ফুটে ওঠে। জোরালো আলোয় কুণ্ডুবাবু দেখতে পায়, কেতনের উচ্ছ্বাস খসে গিয়ে মুখটা ছোট। বুকের মধ্যে বেদনা। কৃতজ্ঞতার অংশীদার হলেও নির্মল-বাবু ঠিক মেনে নিতে পারল না কেতনকে। কেতনের মনোব্যথা মুখ ভার করে চোখে ফুটে ওঠে।

শয়ে শয়ে মানুষের সঙ্গে গভীর রাতে গোপন বৈঠক-মিটিং করে কুণ্ডুবাবু যৌবন হড়কে মধ্যবয়সে। কেতনকে বুঝতে পেরে একবার নির্মলের দিকে তাকায়।

নির্মল ফট করে বলে, দ্যাখসেন এই হল কর্মচারী। আপনি যাইবেন ট্রলারে তা কি এহ্যান থিকে সাঁতার দিবেন? ওরা বুঝুম না ডিঙি যখন আছে সেটা তো লাগাইতে অইব?

কুণ্ডুপদর গোড়ালি ডুবে পায়ের গোছে নোনাজলের ঢেউ। পায়ের চামড়ায় শীত। ফাঁকা গাঙ…ধু-ধু সমুদ্র বেয়ে শীতবাহক ঠাণ্ডা হাওয়া। গায়ে শীতের মৃদু নখ ফোটে। মিন্টু দাস, নির্মল সামান্য একখানা করে জামা গায়ে। বুড়ো সুচিত্রবাবু কোঁচার কাপড় গায়ে জড়িয়ে মন্দিরে পূজারীর মতো নম্রতায় কুণ্ডু-পদর পাশাপাশি। কুণ্ডুপদ তিনজনকে দেখে। পেছনে বালিস্থানের এতবড় চর …সাদা বালির চর। সামনে নোনাজলের গাঙ সমুদ্র…দূরে লুথিয়ান সাহেবের নামে একদা-ব্রিটিশ-শাসন-পরিচায়ক জঙ্গলটা জ্যোৎস্নায় আবছা। সেটা নজর করে ভাবে,…এই রকম পরিবেশ-পরিস্থিতি তো এই মানুষগুলোর জন্যে। নোনাজলের মিহি বালির চরটা তো একলা ফরেস্টের ক'হাজার চারাগাছের জন্যেও নয়! মানুষগুলো…জীবিকাসন্ধানী মানুষগুলোর সহযোগী বনসৃজন কিংবা বনসৃজনের সহযোগী মানুষগুলো। মাছ ও গাছ গায়ে-গায়ে। তাহলে নতুন চারাগাছগুলো উপড়ে আড়ত বসিয়ে খুব অন্যায় করেছি? উত্তর-দক্ষিণে তো এখনও অনেকখানি চর ফাঁকা…। হোক না সেখানে নতুন গাছপালা…

হঠাৎ কেতন বলে, বাবু আসুন। সরু বাঁশের লগি গেঁথে ছোট্ট পাশডিঙিটা

গায়ের কাছে।

কুণ্ডুপদ ডিঙির সঁচলো গলুই ধরে একটু দাঁড়ায়। নির্মল দাস বলে, বাবু কুণ্ডুবাবু—আমরা আড়তটা গোছগাছ করে আপনের সঙ্গে দেহা করুম।

—বাবু যান, উঠেন গো—কালা জল। শীত লামছে, আন্তরিকভাবে বলে সুচিত্র দাস।

পাশডিঙিটায় ট্রলার থেকে কূলে মাছের ঝাঁকা নামে, তেল-জলের ড্রাম বয়ে নিয়ে যেতে জরুরি। দরকার না থাকলে পাশডিঙিটা কাছি-বাঁধা হয়ে ট্রলারের সঙ্গে ভাসে। দোল খায়। ডিঙিটায় উঠে বসে কুণ্ডুবাবু। চরের উপর যে কাণ্ডটা ঘটে গেল···এতক্ষণ নিজের ভিতরে যুক্তি সাজিয়ে ভাসছিল কুণ্ডুবাবু।

ডিঙিটায় উঠে যেন আশ্রয় পেল।

মিন্টু দাস চেঁচায়, কেতন—

—আজ্ঞে ?

—তক্তা ফেলে বাবুকে সাবধানে তুল্যা নিবা।

কেতন বাবুকে নিজের এক্তিয়ারে পেয়ে মুখ ঝমকায়, আমার কি সে জ্ঞানগম্যি নেই গো বাবুরা ? আপনারা বলবেন, তারপর করবো ?

নির্মল কেতনের মনের গরম কমাতে বলে, তুই হইলি আমার পুরাতন লোক। তোকে আমার শিখাইবার কিছু আছে ? বরং তুই আমাগো শিক্ষা দিবি—

সুচিত্র দাস রসিক ভঙ্গিতে বলে, ওরা ছোকরা যুবক। আমাগো বয়স বাড়তিসে। ওগো উপুর লাখ লাখ টাকায় ম্যাশিন কুটি কুটি টাকার মহাপ্রাণ—ভালমন্দ ওরা বুঝুম না তো বুঝুম শুধু আমরা ?

দু-চারবার লগি ঠেলতেই ট্রলারের উঁচু আহ্নিক কাঠ। কাঠের চ্যাটালো গা-পেট। কাঠের গায়ে নতুন রঙের গন্ধ। শীতের চার মাসের সিজিন ধরতে মেশিন সারিয়ে কাঠের ফুটোফাটায় তুলোর গেঁজ মেরে রং কষানো। কদিন পর থেকে তো মাঝসমুদ্রের কটকটে নোনাজলে বারবার ভোলা, রুপোবটি, লাল-পাতি মাছের ঝাঁকা বইবে।

মোটা পুরু তক্তার গায়ে তিন ইঞ্চি কাঠের ছোট ছোট বাতা মেরে সিঁড়ি। ট্রলারের লেবার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়, বাবু কাঠের বাতায় পা ফেলে ফেলে উঠুন। আমি ধরছি—

ভিজে পা তখনও শুকোয়নি। একটু টাল সামলে ধীরে ধীরে ওঠে কুণ্ডুপদ। ট্রলারের মসৃণ পাটাতনে দাঁড়িয়ে কুণ্ডুবাবু বলে, ঠিক আছে— । আপনারা কাজ সারুন।

তক্তার সিঁড়ি তুলে নিতেই ঘণ্টা বাজিয়ে মেশিনে স্টার্ট দেয় কেতন। মস্ত ট্রলারটা ঝাঁকুনি খেয়ে পাক মারে। ভট্‌ভট্‌ শব্দ হয়। পাখার ব্লেড ঘোরে। নোনাজল পাক খায়। সারা ট্রলারে আলো জ্বলে ওঠে। সম্মুখের জলে হেড-লাইটের তীব্র আলো ঝলসে দেয় নোনাজলের কুঁচো কুঁচো ঢেউ-রেখা।

তিন মানুষে গাঙ সমুদ্রকে পিছনে রাখে। দূরে জলের গভীরতায় যেতে

থাকে ট্রলার। মানুষ তিনজনের সুমুখে জ্যোৎস্নামাখা বালিস্থানের চর।

দলছুট একলা বাইন গাছটার মগডালে বাঁশের ডগায় হঠাৎ আলো। সবুজ আলোয় মোটা মোটা বাইন পাতা ঝলমল করে। জেনারেটারের ভট্‌ভট্‌ শব্দ। ফাঁকা বালি গড়িয়ে তিন মানুষের কানে।

বাঁশ-কাঠ কাটার ঠক্‌-ঠক্‌ শব্দ এখানেও। মানুষের দেহের নড়াচড়া। হাঁকা-হাঁকি। চর আর চরের নেই। মিন্টু দাস বলে, সুচিত্তরবাবু—

—হুঁ।

—তোমার মৌর্য'র সাবাড়ের আলো—

কচি-কচি ঘনবন্ধ দাঁতে বুড়ো হাসে। হাসিতে জ্যোৎস্না বুড়োর দাঁতে ঝক্‌ঝক্‌ করে।

(১৬)

গাছপালার ফাঁক থেকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে ছিটকে রাস্তায়।

কুঁইতিদের বড় বাস্তুর পাশ দিয়ে ঘড়ুইবাবুর পাঁচিলের গা ঘেঁষে যাতায়াতের সরু মেটে পথ। শুধু বনবিহারি নায়েকদের যাবার মতো। পাশেই তো ধানের মাঠ। পায়ের শব্দে ব্যাঙ লাফায় ঝুপঝাপ। বনবিহারী টর্চ'টা জ্বালায়। দু-ব্যাটারি টর্চের গায়ে তুলোর কাপড় জড়িয়ে সরু নাইলন দড়ির প্যাঁচ। খানিক বাড়তি রেখে প্রয়োজনে কাঁধে ঝোলানোর সুব্যবস্থা। নোনা দেশ, হাওয়া-বাতাসে টর্চের গায়ে বড্ড জং ধরে। সেটাকে প্রতিরোধ করা আর যন্ত্রতন্ত্র হারাবার ভয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা নিরাপদ।

বনবিহারী টর্চের সুইচ টেপে। প্রাণপণে চাপ দেয়। তবুও লালচে মরা আলো। গোটা টর্চ ধরে ঝাঁকুনি দেয় যদি ঠিক কানেক্‌শান পেয়ে আলো জোর ধরে। বাঁহাতের তালুতে রেখে টর্চ'টা ঠোকে বনবিহারী। রাত দশটায় সব শুনশান। ধানচারায় হিম পড়ে। সরু সরু ডগা ভিজে যায়। ভিজে মালুম হয় পায়ের তলায় ঘাসে। শীত-বর্ষায় একই প্লাস্টিক নিউকাট। পা-ঢেকে টাইট। মাঝে-মাঝে ধপ্‌ধপ্‌ শব্দ। শব্দটা কানে যেতেই সামলে নেয় বনবিহারী। অত্যন্ত নিঃসাড়ে অভিযান। কারুর নজরে অন্তত প্রতিবেশীদের নজরে পড়তে চায় না এই নিশি অভিযানে। তাই পা টিপে টিপে হাঁটে।

কপাল মুড়ে কানঢাকা উলের টুপি মাথায় বনবিহারী। লুঙির উপর ফুল-হাতা সুতির গেঞ্জি। হঠাৎ চিনতে কষ্ট। বনবিহারী পঞ্চায়েতের জল-নিকাশি হিউম পাইপের উপর পা ফেলে ভাবে, চরে আড়তদাররা তো সাবাড় বসাচ্ছে। আমিও তাদের জন্যে কম করিনি? প্রস্তাবটা পাড়লে কেমন হয়? ওরা তো সবাই লক্ষপতি ব্যবসাদার। কথাগুলো নিজের মতো সাজিয়ে নেয় বটতলার ছায়ার মধ্যে। নিঃশব্দ চারপাশ। শাখাপ্রশাখায় জ্যোৎস্না আটকে গা-ছম-ছম ছায়া বটের চাতাল ঘিরে। বাঁয়ে বনসংরক্ষণ কমিটির সদস্য প্রভাতকিরণ দাসের বাড়ি। জানালা ফুঁড়ে আলোর ফালি। ভয়ঙ্কর ধারালো অস্ত্রের তীক্ষ্ণতার

মতো। পঞ্চায়েতের নতুন ছোকরা মেম্বার। তাকে এড়াতে আরও গোপন ছায়া খোঁজে। বনসংরক্ষণ কমিটির সভাপতি সীতাকান্ত বেরাবাবু? মনে হতেই বুকে আঁচড়।

একটু হাওয়া বয়। মোটা বটপাতা সড়সড় শব্দে নড়েচড়ে। পাতার ফাঁকে দু-এক ফোঁটা জ্যোৎস্না গলে যায়। বনবিহারী আতঙ্কে এক-ঠে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবে, বন কমিটির সভাপতি তবু ভিন্ গাঁয়ের লোক। তার চোখজোড়া তো সেই রয়ালগঞ্জের চার-কপাটি লক গেটের কাছে। কিন্তু ছোকরা প্রভাত-কিরণ…তায় পঞ্চায়েতের নতুন মেম্বার…তার কুনজরে পড়লে তো বিপদ। সবে আজ শত হুজ্জত-হাঙ্গামার পর তো সাবাড় বসছে চরে। এক একজন আড়ত-দারের আট-নবিঘে পরিমাণ বালিচর ভাগে… । যা কিছু হল, ছোকরা মেম্বারের তো তেমন মধ্যস্থতা নেই। নেই তাদের সঙ্গে ভাবভালবাসা, মাখামাখি। আমার মেলামেশা তার কাছে নতুন করে চক্ষুশূল হবে না তো? সুতরাং উঁকিঝুঁকি মেরে বুঝতে চায়, এই রাত গভীরে প্রভাত ছোকরাটা বাইরে উঠোন দাওয়ায় কি না?

বটের ছায়ায় বাঁধানো চাতাল। চুপচাপ বসে থাকতেও দ্বিধা। বুকের মধ্যে একটুকরো সংকট। তখন মনে পড়ে, আমি নিজেও তো এক সময় এই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলুম। অন্ধকারে লোকে সন্দেহ করলেই হল? এক্স এম এল এ, এম পি দেখলে খাতির করে। তাদের দু-চারটে অনুরোধও তো রাখে, দায়-বিপদে পড়লে, দারোগা-পুলিশ আমার কথায় বিশ্বাস করবে না? দ্বিধা থাকলেও স্বত উত্তাপে গরম হয়ে যায়।

তখনই প্রভাতকিরণের জানালায় আলোর তেজ কমে। বাতির দম নামাতেই নিঝুম। নিজের দ্বিধাও ঝিমিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বগলের টর্চ টেপে। ঘন ছায়ায় কমজোরি ব্যাটারির শেষ আলোটুকু বেশ তীব্র। বনবিহারী হাঁটে। কপাল মুড়ে কানঢাকা টুপিতে শীতের উপযোগী হয়ে, নিজে একদা পঞ্চায়েতীরাজ এলাকায় পা চেপে চেপে হাঁটে।

নোনামাটির বাঁধ। বাঁধের খানিক ছাড় দিয়ে বড় জোয়ারে ভেসে আসা গেঁয়ো-ক্যাওড়ার দানা ফেটে কবেকার পুরনো গাছপালা স্থানে স্থানে ঝুপসি। তারপরই তো বুড়ো প্রামাণিকের ফিশলট্। আড়াইশ বিঘের বনজঙ্গল। তার মধ্যে নালা কেটে নোনাজলের চলাচল। মাঝে-মাঝে গভীর করে কাটা ডোবা-জলাশয়। বাগ্‌দা ভেটকি মোচা গায়ে-গতরে মোটা হয়ে সাঁতরে বেড়ায়। দেশের বাজার ছাপিয়ে বিদেশের বাজারি হয়।

বাঁধের ঢাল বেয়ে নামে বনবিহারী। এবড়ো-খেবড়ো মাটি। টর্চটার সুইচ টেপে। মরা আলো নিষ্প্রভ চরাচরের জ্যোৎস্নায়। ফলে টর্চটা আর তেমন উপকারী নয়। শুধু কাঁধ বেড় দিয়ে বগলের তলায় ঝোলে। নাইলন দড়িটা গেঞ্জির উপর ঘষা খেয়ে কাঁধের চামড়ায় লাগে।

নোনাজল বেয়ে সরু নালায় কাদা। কাদায় এখনও সাপের মতো এঁকেবেঁকে ক্ষীণ জলধারা। বনবিহারী জুতোজোড়া খুলে লুঙিটা সাপটে নেয়। জোরে

লাফ দিতেই ওপার। রোদে শুকনো হলেও মাটি রসা। থুবো থুবো গিরাশাকে পা মুছে জুতোয় পা গলায়। ওপাশের সরু নোনা আলে উঠে দাঁড়াতেই, আলো। চরের উপর নীল-সাদা আলো। দলছুট একলা বাইন গাছটা একথাবা ঝলমলে সবুজ। জেনারেটারের ভট্‌ভট্‌ শব্দ।

বাঁকের মুখে সিঁধুর কুঁড়ে। নিকানো উঠোন, রান্নাশাল। ঝুপড়িঘরে শুয়ে-বসে দিনরাত পাহারা দেয় সিধুটা। বুড়ো প্রামাণিকের আড়াইশ বিঘের ফিশলট্‌। বউ-বাচ্চা নিয়ে এক ঝুপড়িতে শীত-বর্ষা, কালবৈশাখীর ধকল সামলায়। একবেলা রাঁধে তো দুবেলা উনুন জ্বালায় না। হঠাৎ পায়ের কাছে তাপ। আলগা উঠোনে ভাঙা-টালি চাপা উনুন। নিচু হয়ে টের পায়, পোড়া জ্বালুন কুটোর আগুন-ভাপ্‌। চমকে তাকায় বনবিহারী! অনুমান করে, আজ তাহলে সিধু গরম ভাত খেয়েছে? ও যে পান্তার যমরা। ছমাস-এক বছরের শিশুও যে পান্তার ভক্ত!

এলোমেলো পা ফেলে, শব্দ হয় উঠোনে। ঝুপড়িঘরে শোওয়ানো লাঠিটা হাতে নিয়ে চেঁচায়, কে? কে গো বাহারে? সাবাড়ের লোক?

বনবিহারী উত্তর দেয় না।

বেড়ার দোব ঠেলে বাইরে আসে সিধু। লাঠিহাতে একখানা শুধু নীল-সাদায় ডোরা-কাটা বিবর্ণ আণ্ডারপ্যাণ্ট, বড় বড় চুল। খালি গায়ে কুচকুচে কালো। নিচু ঝুপড়ির ছাঁচতলায় শুয়ে পড়ে মাথা বাঁচায়,—কে গা?

—থাম্‌। আমি—

—এত রাত্রবেলায়?

—কাজ আছে, চাপা স্বরে উত্তর দেয় বনবিহারী।

—আমানে?

বনবিহারী হাসে।—দিস তো পরামাণিকের লট্‌ পাহারা? চেহারা তাগদ যা তোর—গাঙডাকাতি করতিস যদি তাহলে তোর সঙ্গে কাজ থাকতো?

—তুমি তো পঞ্চায়েতের মেম্বর। পুলুশ থানা থিকে বাঁচাইবে কও? গাঙডাকাতিতে লাগি।

সিধুর সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়েও থেমে যায় বনবিহারী। বুকে চোট লাগে,···আমি যে মেম্বার নেই···ভোটেও দাঁড়াইনি—এ খবর সিধুর জ্ঞানে ধরা নেই! বরং ইচ্ছে করে একটুকরো সত্যিটা চেপে রাখে বনবিহারী। বলে, রান্না করেছিলিস?

—হাঁ গো, চরের লোকদের মালপাট বয়ে দিছিলুম। দু-কেজি সরু—ফাইন চাল দিছিল···। ভাত যেন আয়না! মুখ দেখা যায়···!

সিধুর উচ্ছ্বাসে বনবিহারী একবার ঝুপড়ির পিছনে তাকায়। খানিক তফাতে চৌ-চাক্‌লা মাটি ঘেরা উঁচু ঢিপি। এক কোণে ঝাঁকড়া বাইন গাছ। গাছটার তলায় একখণ্ড নুড়িপাথরে কালী। বালিস্থানের কালী। সিঁদুর লেপা পাথর-খণ্ডটা কালী। চণ্ডী···।

সিধু উসকো খুসকো কান-ঝাঁপানো চুলে মাথা নোওয়ায় গাছতলার কালীর

দিকে, মা-গো মা—আরও আড়তদার…সাবাড় বসাও। মালপাট বওয়া ছওয়া করি দিব। আরও চর জেগে উঠুক, খটিদার আড়ত আইসুক…এমন আয়নার মতো ভাত খাই রোজ চাট্টি করে মাগো—

—কেন ? পানতা ?

—দুস্। এই চালে পানতা জমেনি, এ হইল ভাতের চাল। ফাইন ভাত। বনবিহারী সিধুর কথায় তাকিয়ে থাকে। জ্যোৎস্নায় কপাল ঝামরে বড় বড় চুল। ছোকরা বয়েস, সারা দেহে তাগদ। বনবিহারী আস্তে করে বলে, আর চরটা কোথায় যে জাগবে ?

—দুস্ বাউয়ু। সমুদ্দুরের সব ক্ষমতা আছে। ইপাশে না হউক উপাশকে জাগিয়ে দিতে ক-বছর ?

—জাগলে ?

—আরও সাবাড় খাঁটি আড়ত—

—তাহলে ?

—নগদ রোজগার। ভাত…পুইস্যা…। অতি-কল্পনায় চিন্তার খেই হারায় সিধু।

বনবিহারী অমন চেহারা তাগদের সিধুকে যেন সামান্য সরু দড়ি ঝুলিয়ে অথৈ জলকলরোল থেকে বাঁচাতে বলে, পেলে ?

সিধু ভাবনার কূলে ঠাঁই পেয়ে মুখ খোলে, উফ্। মাইরি দাদা—অমন ফাইন চাউলের ভাত আর ভেট্কি বাগদার ঝোল……

—দুস্। ভেট্কি বাগদা তো ফিশলট্য়ে চাইলেই পাবি।

—না গো দাদা—

—কী ?

—বাবুরা দিতে চায়নি। বাক্সয় বরফ মেরে বাগদা চলে যায় কলিকাতা, লণ্ডন, আম্রিকায়—

—ভেট্কি ?

—আগে দিতো। অখন আর নয়, বলে সিধু চুপচাপ। কথা ফুরোলেও উসখুস তার চোখমুখে। ফট্ করে শুধোয়, এই সব বাগদা মোচা চিংড়ি খায় কারা ?

—সাহেব মেমরা। তারা আমাদের মাছের স্বাদ বুঝেছে—

—সো দিন দুটা কাঁকড়া ধরছিলি বগড়া ঝোপে। বাবুর ছেলে খুব তড়-পাইলে। শেষে দুটা টাকা দিয়া কইলে, কাঁকড়াগুলা দে।

—দিলি !

—হুঁ।

কপাল মুড়ে কানঢাকা টুপিতে বনবিহারীর মুখে বিস্ময় ! তখন কপাল ঝামরানো চুলে সিধুর মুখে সঙ্কোচ। নিজেই জানতে চায় সিধুটা, হ্যাঁ দাদা, বাগদা কাঁকড়া খাইতে সাহেব মেমরা এইখানে চলে আসবেনি ?

—এলে ভালই তো। ওদের অনেক পয়সা। পয়সা খরচ করবে আমরা

নোবো—

বনবিহারী তাকিয়ে থাকে সিধুর দিকে। অমন বলিষ্ঠ চেহারা ঝাঁকড়া চুলে ছোকরা মুখ চুপসে এতটুকু! যাওয়ার জন্যে বনবিহারী পা ঘষে। হুট্ করে মনে পড়ে, সিধু—?

—আজ্ঞা দাদা?

—হতেও পারে। গ্যাট্ ম্যাট্, কী সব চুক্তি হয়েছে সাহেবদের সঙ্গে? তাতে বাবুরা সখ হলে অনেক কিছু পারে···

—তাই! বিপন্ন অস্তিত্বে মাত্র দড়ি গলানো আণ্ডারপ্যাণ্টটা পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভারতের মাটিতে। সমুদ্র ডিঙানো হাওয়া ফিশলটের গাছ-পালা দুলিয়ে গায়ে লাগে। উপবে জ্যোৎস্নাময় আকাশ। বনবিহারী পায়ে পায়ে খানিক দূর।

সিধু ছুটে গিয়ে বলে, সে জন্যি কি সীতাকান্তবাবুরা গোলমাল করছিলি?

—আর প্রভাতকিরণ? না, বলেই শুধরে নেয় বনবিহারী।

সিধু কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠস্বরে বলে, হাঁ—দাদা? ও ছোকরা কি তোমার সঙ্গে নতুন?

এবার সংকটটা তীব্র হয়। বনবিহারী নিজেকে বাঁচাতে জোরে জোরে পা ফেলে। বলে, পরে কথা হবে রে। কাজ আছে—চরে যাই?

(১৭)

রুগ্ন বুড়ো বিনয় দাস খুঁটির গায়ে দড়ি বেঁধে বলে, উই বাঁখারিটা দিবা তো—

—কোনটা? জানতে চায় বউ ছবিরানি।

—বোঝার তন, বলে বুড়ো বিনয়।

যেহেতু জেনারেটার নেই, আলোর অভাব। মাত্র একখানা হ্যারিকেন। বাতি জোর দিয়ে অচিরে ভুষো জমে ঝাপসা। রোগা চিমসে চেহারায় বুড়ি ছবিরানি হ্যাবিকেনটা উঁচিয়ে ধরে বাঁশ-বাঁখারির বাণ্ডিলের কাছে। পাশে চার-পাঁচখানা হোগলা বালির উপর শোওয়ানো। চারদিকে জ্যোৎস্না কিন্তু বোঝার বাঁধন ঠিক ধরতে পারে না! বুঝতে পারে না দড়ির গিঁট কোন দিক থেকে শুরু হয়েছে। হ্যারিকেনের ঝাপসা আলো একবার এদিক একবার ওদিক চলাচল করে। সরু লম্বাটে কালো মুখে সরু নাক বুড়ি ছবিরানির। কাটারি হাতে খুঁটি ধরে ধৈর্য হারায় বিনয়। পায়ের তলায় সাদা মিহি বালি। বয়সের চাপে ক্লান্তি। থাপড়ি মেরে বসে বালির উপর। গেঁট থেকে বিড়ি বের করে দেশলাই কাঠি জ্বালায়। ফস্ করে শব্দটা যেন তাতিয়ে দেয়। রেগে বলে, কি হইস্যে? পারবা?

বুড়ি ছবিরানি মুখ তুলে কথার দিকে মন দেয়। হাতের হ্যারিকেন সোজা নিজের মুখে। সরু নাকে নাকছাবির পাথর ঝমকায়। মিহি গলায় বলে,

পারত্যাসি কৈ ? অনেক দরি জরাইস্যে—

—অ। যামু ?

—আইবে…! রোগা চিমসে ছবিরানি বিনয়ের দিকে তাকায়। ছিটকে আসে আলোর ঝাপটা। বাঁদিকে আড়তগুলোয় একটা একটা করে জেনারেটার জ্বলে। দশ-বারোখানা করে বাল্ব-নিয়নের আলোয় চর ভেসে যায়। হুটপাট করে লোকজন হোগলা-ত্রিপল ঘিরে ছাউনি বানায়। খোলা আকাশ বিস্তৃত বালিচরে মানুষের আবাস তৈরি হয়। ভট্‌ভট্‌ শব্দ বাতাস বেয়ে ছবিরানির কানে। ভাবে, এক জেনারেটারে কত আলো!

বালির উপর বসানো হ্যারিকেন। ভাঙা হাতলের ফাঁকে সরু তার গুঁজে আসল হাতলের পরিবর্ত সুযোগ। উঁচু-নিচু বালি, ধরে থাকে হ্যারিকেনটা। পড়ে গেলে গা-বেয়ে কেরোসিন অপচয় তো হবে অনেকটা।

বুড়ো বিনয় শুধোয়, যোগিন কোন্‌ তন ?

—জাল আনতিসে।

—এই সুমুয়ে যোগিন একটুকু সাহায্য দিলে হোগলা ছাউনি হইতো তো ?

—আইবে অনে।

টুপি-আঁটা মাথা। বনবিহারী বগলের টর্চ হাতে নিয়ে সুইচ টেপে। সাদা বালির চরে পনেরো বিঘেটা ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে বালির ঢিপি। হাওয়া-বাতাসে খানা-খন্দ। টর্চের আলো ঘুরিয়ে বনবিহারী মনের মতো করে সীমা টানে। এখনও কেউ বসেনি। কিংবা বসার তোড়জোড় করেনি। পুরনো দশ-এর দুই ধারা নোটিশ দেখিয়ে বনবিভাগকে গাছ রোপণ করা থেকে আটকানো, আগলানো—এই পনেরো বিঘে সিকোস্তি জায়গা। সুতরাং পাশের আড়তদার দু-পাঁচ হাত সরে এসে খুঁটি পুঁতলে তো দখলি স্বত্ব বসে যাবে? তাই সরেজমিন দেখতে আসা। যা হুল্লোড়…, আলোর রেখায় নিজের জায়গাটুকু দেখতে দেখতে ভাবে বনবিহারী।

বালিস্থানের বিশাল বালিচর। টর্চ বগলে পনেরো বিঘের মধ্যে হাঁটে বনবিহারী। কোনও পিলার, খুঁটি, লোহার পিন কিছুই নেই। তবুও সীমানা টানে অনুমানে। হঠাৎ টর্চের আলো রোগা বুড়োর মুখে। কাছাকাছি এসে বলে, কে ? খুঁটিয়ে দেখে আবার বলে, বিনয়বাবু ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি গত বছরও এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ বাবু, বলার মধ্যে ভীষণ আগ্রহ। গোলমালের বালিচরে এই স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা ব্যাকুল করে।

বনবিহারী গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে, আমি তো জানি।

সামান্য স্বীকৃতিতে বুড়ো বিনয় ডাক দেয়, আয়েন বাবু। বিরি খাবেন গো ?

বনবিহারীও ফাঁকা চরে অনেকবার হেঁটেছে। মানুষের আনাগোনায় চরটা সাবাড়ে রূপ নিয়ে সাজবদল করছে। তাই নিজেকেও সাজায়, দিন। না খেলে

মনে দুঃখ নেবেন তো ?

বৃদ্ধ বিনয় বিড়ি বের করে বলে, বাবু আমাগো কাছে সিগ্রেট নাই। গরিব মাইনষের বিরি গ্রহণ কইর‍্যা সন্তোষ মানবেন গো…।

বনবিহারী চুপসে যায়।…মানুষের কী কথায় যে কোথায় লাগে…, বিড়িটা হাতে নিয়ে ভাবে।

দু-চারবার বিড়ি টানতে খুশি বুড়ো বিনয়। জিজ্ঞেস করে, আপনে যাইবেন কোনআনে ?

বনবিহারী কোনও উত্তর দেয় না। পর পর টেনে যায় বিড়িটা।

বুড়ো আবার বলে, আপনেকে দ্যাখছি—খুব দ্যাখছি। এহানে থাকেন ?

—কেন ? চেনেন না ? এই বালির এদিকটা তো আমার— ?

বুড়ো খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে সায় দেয়, হ্যাঁ। মনে পড়ছে। গত বছর আইসিলেন—এই কলোনির দিকে নজর রাইখত্যেন—

—হ্যাঁ। এবারও তাই। আমি না সঙ্গে থাকলে কারুর কথায় বিশ্বাস যাবেন না।

—ঠিক আছে, ভাঙে দাঁত মেলে বুড়ো বিনয় হাসে। মুখময় অপরিষ্কার গন্ধ।

—পরে আসবো—চলি এখন।

—অবশ্যই আইবেন। আপনে গো জায়গার পাশে আমার আরত। দয়া কইর‍্যা আইবেন তো ?

এটাই চেয়েছিল বনবিহারী। একজন নজরদার। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বুকের মধ্যে আঁচড়ে দেয় পুরাতন এক ইচ্ছা! সামনেপিছনে যতদূর নজর যায় শুধু সাদা। নরম সাদা! ভাবে, কী বড় চর…! দেশময় কত ভূমি…পৃথিবীময় কত ভূমিসম্পদ…! মাত্র একটুকরো পনেরো বিঘের বালিচর রাখতে যে কত কায়দা…। যারা দেশময় ভূ-সম্পদ আগলে রাখে—তারা যে কত বড় ধুরন্ধর… !

বনবিহারী চলে যায়। রুগ্ন বিনয় খুঁটিতে দড়ি বাঁধে। রোগা চিমসে বুড়ি ছাবরানি বাঁখারি এগিয়ে দেয়। স্বল্প জোগাড়ে কমজোরি ছাউনিতলায় আড়ত। কোনও ট্রলার নয়, ভুটভুটি লঞ্চ নয়, দিশি ডিঙি। হাতে-টানা দাঁড়, ছেঁড়া তাপ্পি-মারা জিনকাপড়ের পাল। ছোট্ট সাইজের বেঁউতি জাল নিয়ে শীতের সিজিনের সাজ-সরঞ্জাম।

গায়েমাসে ভরাট বিধবা বউটা। দু-হাতের কবজিতে কাঁচের চুড়ি। গোলগাল ভারী মুখ। পিঠ ছাপিয়ে কালো চুল কমলাপতি দাসের। বিনয় দাসকে শুধোয়, হ্যাঁ গা বাবু—ওই মানুষটি কে ? নতুন আরতদার ?

—না।

—তবে ?

চকচকে দু-চোখ। সুশ্রী কালো গোল মুখে তেরো-চোদ্দ বছরের স্বপন। খালি গায়ে একখানা গামছা কোমরে জড়িয়ে নিখুঁত শরীর। গলায় সোনার রং করা একখানা হার। বিধবা কমলাপতি দাসের ন্যাওটা হয়ে সঙ্গী। স্বপন

গলার হারটায় তিনকোণা লকেট সাইজে এনে বলে, আমি বিকালে দ্যাখসিলাম লোকটা চল্লিশ পঞ্চাশজন বেটাছেলে মেয়েমানুষ সঙ্গে আনছিলো এই বালিস্থানের কালীতলার তন—

স্বপনের কথা শুনে বুড়ো বিনয় খুঁটির গায়ে গিঁটটা মেরে বলে, তা হইলে তো স্বপুন সব জানে?

বিধবা কমলাপতি রঙিন শাড়ির আঁচল টেনে গা ঢাকে। স্বপনের পিঠে হাত দিয়ে থামায়, শুনবা তো? বাবুর সঙ্গে কি কুথা হইস্যে?

বিনয় এবার কাজ থামায়। বউ ছবিরানি ভুষোধরা হ্যারিকেন হাতে দাঁড়ায়।

পুরুষমানুষের পাশে মেয়েমানুষটাকে বেশ মানিয়ে যায়। একলহমায় কী যে দেখে ফেলে মোটাসোটা ভরাট কমলাপতি! অযথা হাত ঘোরায়। হাতের চুড়ি ঝন্ঝন্ বেজে ওঠে।

জ্যোৎস্নায় গা-বুক স্পস্ট হলেও কমলাপতির দু-চোখে ভুষোমাখা হ্যারিকেনের আবছা লাল আলো। বুড়ি স্বামীকে তড়পায়, কী জিগায়? বলি দাও না—

—কী আর কমু? উনার জায়গার তন কেউ খুঁটি লাগাইবেনানি।

স্বপন তাকিয়ে থাকে বুড়ো বিনয়ের দিকে কিশোর চোখে। কমলাপতি খানিক বোঝে কথার ধার আবার খানিক অস্পষ্ট।

সরু নাকে একচিমটি নাকছাবি। সুচলো মুখে বড় বড় দাঁত মেলে ছবি হ্যারিকেন নাচিয়ে বলে, কথা হইসে তো? এবারে কাম করি—

কমলাপতির ছেলে ছোট্ট ছাউনির ভেতর মাচার মাপে বাঁশ, গরানের লাঠি গেঁমুয়া গাছের ছাঁটা ডাল বিছিয়ে বিছিয়ে রাখে। চার বছরের বাচ্চা মেয়েটা বলে, বাবা—এই লাঠি লিবে?

কমলাপতির জোয়ান ছেলে খাটতে খাটতে হিমশিম। ছোট্ট শিশুকন্যার আগ্রহে খুশি হয়ে বলে, যা—মণি ঠাকুরমাকে ডাক দাও—। স্বপুনকে ধরি আন্—

বাচ্চা মেয়েটা দৌড়োয় বালির উপর। জ্যোৎস্নার নরম বালি। কচি হাতে কয়েক গাছি কাঁচের চুড়ি। ঝুমুর ঝুমুর বাজে। কচি গলায় সরু স্বর, ও ছপুন দা—ছপুনদারে—এ—

পরিশ্রান্ত যুবক ডালিম দাস ছাউনির বাইরে এসে গায়ে হাওয়া লাগায়। স্নায়ু পেশি জিরেন পায়। বালির উপর বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। জ্যোৎস্নায় সব কেমন দেখা যায়···আবার কত আবছা! লুথিয়ানা জঙ্গল মাথা ভার করে গম্ভীর। সমুদ্রের জলে ঘুমন্ত মানুষের মতো রক্তস্রোত···। শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো হাওয়া বাতাস। লুথিয়ান পেরিয়ে গেলে তো বুড়োবুড়ির তট। বাস্তু-পুকুর নিয়ে বিঘেচারেক জায়গাজমি। কাকদ্বীপে দু-কাঠা জায়গায় টালির ছাউনিঘর বাবার হাতে। ইলিশের মরশুমে গাঙডুবি হয়ে বাপ নিখোঁজ। দুঃসহ অনটন! তটের বাজারের দোকানি কাকদ্বীপে হাট করত ডিঙি বোঝাই ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি। খরিদ করে বেচত বুড়োবুড়ির তটের বাজারে। বাবা

বিজয় দাসের পুরানো বন্ধু। দুর্দশা দেখে বলেছিল মাকে, ও কমলাবউদি এতটুকু বাচ্চাদের নিয়ে উঠতি শহরে থাকবে কেমন করে ?

—সেই চিন্তা। এইসব কাঁচ কাঁচ পোলাপান…কুনু রোজগার তো নাই গে বরোভাই…

—এক কাজ করো—

—কী কন ?

—হাতে খরিদ্দার আছে। আপনি সায় দিলেই অখনি ব্যবস্থা হয়—, বলেছিল বাবার বন্ধু।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল অল্পবয়সী সদ্যবিধবা কমলাপতি দাস! মনে আতঙ্ক। কেমন আনচান করেছিল মা। বাবার বন্ধুর সামনে মা উৎকণ্ঠায় তাকিয়েছিল।—কী…কন গো…দাদা…।

জিজ্ঞাসা, না অসহায়তা ?

টালি ছাউনি দাওয়ায় বসে বাবার বন্ধু বলেছিল, এই ঘরসহ জায়গাটা বেচে দাও—

মা আঁতকে চেঁচিয়েছিল উদ্বাস্তু অসহিষ্ণুতায়, ক্যান গো দাদাভাই ·· ? তারপর··· ! ডালিম, ডালিমের ভাইবোনকে দু-বাহুর সীমায় আগলে ভয়ংকর কাঁপছিল সারা শরীরে কমলাপতি দাস। কালো চুল কালো রং হলেও শরীরে তখনও চিকণ!

সাহস দিয়েছিল বাবার বন্ধু, আমাদের বুড়াবুড়ির তটে অখনও জমিন জায়গার দর কম। এই টাকায় চার-পাঁচ বিঘা জমিন-জায়গা পাইবে।

আশ্বাসটা যেন স্বপ্ন। পরক্ষণেই কমলাপতি বলেছিল, সে তো অনেক দূর···। গাঙপথ···বোটডিঙির রাস্তা···

—হইলেই বা ? জমি আছে, পুকুরে মাছ হইবে মাঠে ধান ফলবে···বাচ্চারা বড় হইলে ইস্কুল যাইবে···বড় হইলে জাল বোট করবে···

কমলাপতি দাসকে স্বামীর কষ্টে দখলি আর পাশে খানিক কেনা মোট দু-কাঠা জায়গাটা যেন ব্যথা দেয়। মানুষটা এখানে রেগেছে, হেসেছে, বউ করে এইখানে এনেছে···দু-এক মাইল হাঁটলে আত্মীয়-স্বজনের মুখ। সেই দুঃসময়ে ডাকলে গেলে রাগ গোঁসাভরা মুখ···তবুও তো কেউ···! আপনার জন বলে ভাবতে জোর জন্মায়! তখন নিতান্ত বিপন্নমুখে কমলাপতি বলেছিল, বরো-ভাই—ওই দ্বীপে তো আমার কেউ আত্মজন নাই···!

—বিজয়ের বন্ধু, আমি আছি ? আমার বউ ছেলেমেয়েরা আছে···

হঠাৎ গাঙ চিরে লুথিয়ানা জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে একটা লঞ্চ আসে। আলোয় ঝলমল করে। ফরেস্টারের লঞ্চ টহল দিয়ে ফিরছে। লঞ্চের আলোকে ঠাঁই করে নিজের দ্বীপের দিশা অনুমান করে। এখন মনে হয়, দ্বীপের চারবিঘে বাস্তুতে বউটা একলা আছে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে···। নিজে কূলে বসে নোনাজলের গাঙ পারিয়ে—ও—কূলের মহাপ্রাণীদের শুভ প্রার্থনায় দু-হাত জোড় করে। সমুদ্রকে বলে, মা—মা গঙ্গা গো ভাল রাখবে বউ বাচ্চা—সকলকে।

চকচকে চোখ, কালো স্বপনের হাত ধরে চার বছরের মেয়েটা বালির উপর হাঁটে। একদা টকটকে লাল ফ্রক ব্যবহারে রং চটে ফ্যাকাশে। কচি হাতে ক'খানা চুড়ি। স্বপন বলে, তোর ভয় লাগছে নাই ?

—ভয় কিসের গো ছপ্‌নদা ? এখানে বাঁশবন কেঁটকি বন আছে যে ভূত থাকবে ? ছিয়ালের ডাকও কই ? শুধু তো আলো—

নাতনির পাকা পাকা কথায় মজা আছে। খুব ঢিমে চলে হাঁটতে হাঁটতে কমলাপতি দাস শোনে। তখন মনে হয় ঠাকুমার, এই বয়েসে বাচ্চারা কোথায় ঘর, দাওয়া দাপিয়ে বেড়াবে, সন্ধে বাড়লে আলো নিয়ে পড়তে বসবে তা না পেটের ভাতের জন্যে চরে আসা, সেই চরে নেচে বেড়াচ্ছে ? কত বুঝিয়ে বারণ করে তবু থামলে না মেয়েটা ! এমন পথ নেই যে ঘরে থেকে বসে রোজগারপাতি হয় ? সংসার চলে ! তাই খানিক নিজের অন্নসংস্থানের দুরবস্থা আর মেয়েটার বায়নায় বিরক্ত হয়ে ঠাকুমা বলেছিল, ডালিম নিয়ে চল ছেমরিটাকে বালিস্থানে। আমার কাছে থাকবে, খাইবে।

ঠাকুমার মুখে আশ্বাস শুনে বাচ্চা মেয়ে মণি কাঠ বাঁশ জাল দড়ি চাল তেল বোঝাই দেওয়া ডিঙিতে উঠে বসেছিল। সেই মেয়েটা এমন বকবক করছে সাদা বালি মাড়িয়ে যেতে যেতে।

ঠাকুমা দাবড়ি দেয় জোরে, মণি চুপ মার তো।

থমকে যায় বাচ্চা নাতনির কলকল কথা। ভ্যাবলা মেরে স্বপনের গায়ে লেপটে আশ্রয় খোঁজে।—তোর বাপ্‌ কি কইস্যে রে ? জানতে চায় নাতনির কাছে ঠাকুমা।

ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, তোমাদের ডাকতে কইলে।

—মাচা বাঁধা হইস্যে ?

—জানি নাই গো ঠামুন।

ঠাকুমার রাগ ধুয়ে বুকের মধ্যে নাড়াচাড়া। চার বচ্ছরের নাতনিকে বুকে জাপটে বলে, আহারে আমার সখি ! বড্ড বকছি তখন থেকে। আয় গো আমার কোলে আয়—

যুবক ডালিম। মাংসল কাঁধ-পেশি। বালির উপর বসে বিবশ। বাচ্চা নিয়ে অল্পবয়েসী বউটা বুড়োবুড়ির তটে। নোনা গাঙ পেরিয়ে সমুদ্রমুখ···তার উপর আকাশ। দূরের নক্ষত্র ঝিকমিক জ্বলে। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না ঝুলে আছে সমুখের নোনাজল ছুঁয়ে। রাতের গভীরতা বুঝতে ডালিম একবার আকাশের দিকে তাকায়। ভরা জ্যোৎস্নায় তারাগুলো ক্ষীণ। ফলত ক-ঘণ্টা পার হয়ে রাত এখন কত বয়েসী সেটা আন্দাজ করতে পারে না।

ঠাকুমার কোল থেকে ছাড়া পেয়ে বাচ্চা মেয়ে মণি ছুটে যায়। বাপের গলা জড়িয়ে কাঁধে ওঠে, ঠাকুমা আসছে গো—

যুবক ডালিম সম্বিৎ পায়। কচি হাতের বাঁধনে মায়ার গিট। ক্রমশ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধে। ডালিম একূল-ওকূল ছাপিয়ে পিতৃপ্রবাহে ভাসে। সারা দেহের স্নায়ুকোষে চকিত জলোচ্ছ্বাস।

(১৮)

শেষ রাতের জ্যোৎস্না ক্রমশ ফিকে। পূর্বসমুদ্র থেকে ভোর জাগে। লুকোনো সূর্য পূর্বদিগন্ত ফুঁসে একটু একটু করে মুখ তোলে। জল-ছোঁয়া আকাশে লালচে আভা। জঙ্গলের ঝোপঝাপ, বালিয়াড়ির খাঁজে-ভাঁজে মুঠো-মুঠো আঁধার চকিতে মুছে যায়।

চরাচরে ব্যাপ্ত শুভ্রতা। লুথিয়ানা-ধঞ্চির সবুজ অরণ্যে শিকারি পশু গা এলিয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন চোখে পৃথিবী দেখে। এখনও শিকার-উদ্যোগহীন নিষ্কুলষতা বিরাজ করে। হাওয়ায় নির্মল প্রবাহ। অনুবর্তনে প্রভাত মাত্র।

বালির উপর ঝোপঝাপে পাখিরা সকাল বুঝে ঠোঁট দিয়ে গা খোঁচে। ঝাঁক রচনা করে বালির উপর। সরু পায়ে হাঁটে। ডানা ঝাড়ে। দু-চারখানা পোকা-মাকড় চরের বালিতে খুঁটে খায়। একলহমায় যাপনের দিন শুরু হয়। জঙ্গলের পশুপক্ষী প্রাণীরা যুগপৎ নিজ মুদ্রায় ডেকে ওঠে। মানুষ তার অন্নসংস্থানের প্রক্রিয়ায় গতি পায়। সূর্য আপন কৌশলে আকাশে ফুটে ওঠে।

রান্নাশালের বালিমাটিতে খড় বিছিয়ে চাদর-কাঁথায় বিছানা। বড় বড় চুলে খানচারেক সরু জটা। তেলেজলে চকচকে। ঢলঢলে খাকি হাফপ্যান্ট খালি গায়ে মোটা বুননে গামছা। পাশ ফিরতেই মুদ্রিত চোখের পাতায় খুব সরু শুভ্র সকাল। ধড়ফড়িয়ে উঠতেই খসমচ খড়ের বাজনা। চোখ রগড়ে হাই তোলে। পাশে দু-তিনজন লেবার তখনও ঘুমিয়ে। যেহেতু মিন্টু দাসের আড়তে পুরনো কর্মী, একটা দায় আছে। বছর বছর এই চার মাসের জন্যে খুঁজে-পেতে কাজে নেয় গোপালকে। গোপাল তার মূল্য রাখতে উঠে বসে। প্রথম ভোরে তার কী কী কাজ—সেগুলো পর পর ভাবে। পরক্ষণেই বিছানা গুটিয়ে নিজের ভাগের খড়গুলো বাণ্ডিল বাঁধে। নতুন বালি অংশে মাটি। বুকে-পিঠে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা। গুটোনো বিছানায় পাতলা চটটা পাকিয়ে দড়ি বাঁধে গোপাল বেরা।

পাশ ফেরে লেবার শ্রীমন্ত। আড়মোড়া দিয়ে বলে, পুজারীদা রান্না বসাইবে নাকি গো?

—কেনি? রাতে খাবা হয় নাই? অখনই খিদা লাগছে?

শ্রীমন্তর ঘুম ছুটে যায়। এই ভোরবেলার মতো স্যাঁতানো গলায় বলে, এমনি জিগাই ছিলাম—, বলতে বলতে পাশ ফেরে।

পুজারী গোপাল বেরা চট-জড়ানো বিছানাটা এক কোণে মাচায় গুছিয়ে রাখে। গোটা রান্নাশালটা তার সংসার। এক কোণে মাটি খুঁড়ে বড় সাইজের উনুন। গত রাতের পোড়া কাঠকুটোর ছাই বিশাল পেটের এক ধারে। বড় কড়া খানদুয়েক। একেবারে দশ কেজি চাল ফোটার বড় সিলভার হাঁড়ি। থালা বাসন হাতা খুন্তি হোগলা বেড়ার গায়ে হেলানো।

একশ লিটার জল ধরে পলিথিন ড্রামটায়। বাইরে সারা রাত হিম মেখে

ভিজে। গা তোবড়ানো সিলভার ঘটিটা ড্রামের মুখে ডোবায় পূজারী গোপাল। জল অনেক নিচে। ঘটি ঠং ঠং শব্দ তোলে ড্রামের গায়ে আঘাত পেয়ে। পূজারী গোপাল নিচু হয়। কোমর-পিঠ বাঁকায়, দাবনা সেঁধিয়ে তবে জল পায়। আধঘটি জলে বাসি চোখ-মুখ ঝাপটা মেরে ধোয়। হাতে-পায়ে জল দিয়ে গামছাটা কোমরে জড়ায়। পরিশুদ্ধ দেহে ভোরের বালিচরে একটু থমকে দাঁড়ায়।

খুঁটির গায়ে হোগলা বেঁধে মাথায় চারকোণা চূড়ো ছাউনি। রঙিন কাগজ কেটে শিকল গোটা ঘরটায় সাজানো। হোগলার গায়ে লাল-নীল কাগজ সেঁটে চমৎকার কারুকার্য। ছোট্ট ঘরটার মাঝ-দেওয়ালে বাঁখারি ঘিরে ছোট্ট কক্ষ। রঙিন কাগজ কেটে ঝালর। জরি টাঙিয়ে চিকমিকি। এরই মধ্যে মাটির ঘট বসিয়ে সিঁদুরে আঁকা স্বস্তিকা চিহ্ন। আম্রপল্লবের উপর সশিস কচি ডাব। গায়ে সিঁদুর রাঙিয়ে সোলার ছোট চাঁদমালায় দেবী বিশালাক্ষী। পাশের সাজানো খোপটায় ঘট সাজিয়ে দেবী গঙ্গার মূর্তি। আর একপাশে ঘটে আম্রপল্লব ডাব সাজিয়ে বিষ্ণু। ওপাশেরটা দেবী দুর্গা। চারকোণা মন্দিরের খুঁটির বাইরে মাটির ঢিবিতে ঘট বসিয়ে লাল চেলি ঢেকে গাজিপীর। থান গেড়ে বসে আছেন। দুই পাশে হোগলা বাড়িয়ে উইংস। দুই উইংসে বাঁশি হাতে রাধাকৃষ্ণ ক্যালেণ্ডারে ঝকমক করে দোলে।

পূজারী গোপাল বেরা মন্দিরে বালি-মাটির মেঝে ঝাঁট দেয়। জল ছড়িয়ে ধুলো মারে। একগোছা ধূপ জ্বালিয়ে বালি-মাটিতে গেঁথে দেয়। সরু সরু রেখায় সুগন্ধি ধোঁয়া। হোগলা-ঘেরা দেবস্থান পবিত্র হয়ে যায়। ঝমঝম শব্দে ঝাঁঝ বাজায়। মিন্টু দাসের আড়ত সাবাড় জেগে ওঠে। শেষে পূজারী শাঁখ বাজায়।

বাইন গাছ ঘিরে মৌর্য দাসের আড়তেও ঝাঁঝ বাজে। শঙ্খধ্বনি ওঠে। যে যার আড়তে গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষ। মানুষের আচরণে সাদা বালির চর শীতের চার মাসের জন্যে আবাস হয়ে উঠছে। বালিস্থান বাণিজ্যস্থানে বদলে যাচ্ছে।

পূজারী গোপাল বেরা শাঁখের বাদ্যি শেষ করার আগে ফুঁ দেয়। আওয়াজটা নাভি সিঁটিয়ে ভীষণ প্রকট। ঘুমন্ত আড়ত আচমকা ধাক্কা খায়। বুড়ো আলাউদ্দিন শেখ বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। ধড়ফড়িয়ে চলে যায় জেনারেটারের কাছে। বন্ধ করে দেয় মেশিনটা। মন্দিরে রঙিন বাল্বটা নিভে যায়। চারপাশের ভোর ঢোকে দেবস্থানে।

একই চালায় রান্নাশাল, অফিসঘর, মাছ রাখবার গো-ডাউন একেবারে মিন্টু দাসের গায়ের পাশে। তারপর লেবারদের লম্বাদৌড় চালা। এক বাঁশ-খুঁটি টানা দিয়ে চালা। ওপাশে খুট করে ঘা দিলে বাঁশকাঠ বেয়ে এপাশে মালিক মিন্টু দাসের কানে বাজে।

জেনারেটারের আলো নিভিয়ে দিতেই আড়তের হোগলা-ঘেরা কামরায় ভোর পেকে স্বাভাবিক সকাল। লেবাররা উঠে পড়ে। যে যার বিছানা গুটিয়ে মাথার কাছে রাখে। হোগলা বেড়ার বাঁখারিতে দড়ির বড় বড় ফাস মেরে জালের

শিকে। নিজের থালা-গেলাস পর-পর ঝোলে। ভাঙা স্যুটকেস নয়তো ছেঁড়া ব্যাগে একটুকরো সাবান, খানিক মাজন, সরষের তেল, চিরুনি। খুব যত্নে রাখা একশিশি ভেজলিন। চড়া শীতে ঠোঁট ফাটে, আঙুলের নখে জলহাজা—তখন যে এই মলম ভীষণ দরকারি। ওপাশে কজন ছোকরা বিড়ি ফুঁকোয়। গায়ের কাছে নতুন ছেলেটা বিড়ির আগুন দেখে।

ফরসা জলধর চেককাটা লুঙির উপর গলা অব্দি বোতাম লাগানো গেঞ্জি গায়ে। চামড়ার চটি পায়ে দিয়ে ফিটফাট ছোকরা। দাঁতে ব্রাশ ঘষে। দামি পেস্টের ফেনায় মুখ ভরতি। পাশ কাটাতেই সুগন্ধ উপচে নারান শীর নাকে। একটু থমকে নারান বলে, মাস্টারবাবু—

দাঁতের ব্রাশ থামিয়ে শোনে। কথা বলতে অসুবিধে।

—এ মাজন কাকদ্বীপ? না, কলিকাতার? নারান আবার বলে।

জুলপি উঁড়িয়ে গোঁফ-দাড়ি একদম মুড়োনো। ফরসা মুখ ফোলা গাল। ঠোঁট মুচকে হাসে মাত্র। তারপর ব্রাশ ঘষে যায়।

নারান শী বাঁয়ে সদ্য তৈরি গো-ডাউন পার হয়ে ডাইনে মন্দির পাশ কাটিয়ে আর একটু এগোয়। হোগলার বেড়া কেটে দরজা। ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলে, হ্যাঁরা ছোকরারা—তোরা উঠবুনি নাকি গো? অাঁ?

ছোকরা লেবারগুলো ঝটপট বেরিয়ে আসে। হোগলা ছাউনি লেবার শেড মুহূর্তে ফাঁকা। শেখ আলাউদ্দিন বড় বাক্সর পাশে সরু সরু পাকানো তারের বাণ্ডিল গুছোয়। লম্বা লম্বা খাপে পাইপ লাইটগুলো কাঠের বাক্সর গায়ে দাঁড় করায়। নারান শী বলে, চাচা কী করছো গো?

—কেনি রে? আমি কি তোর চুক্তিবন্ধ লেবার?

—দুস্ বাউয়ু। আমি কি সেই কথা কইছি গো তোমানে?

রোগা শরীরে লম্বাটে মুখ শেখ আলাউদ্দিনের। কগাছি দাড়ি বটের ঝুরির মতো এবড়ো-খেবড়ো ঝুলে আছে। ফাঁকা লেবার শেড। বুড়ো মানুষ, ইলেকট্রিকের তার-হোল্ডার নিয়ে খুটখাট ব্যস্ত। তাই একটু খোঁচা দিতে নারান শী আবার বলে, তা নাই হউক। তুমি বুড়া মানুষ। এত ভোরবেলা উঠছো কেনি গো?

শেখ আলাউদ্দিন ফুঁসে ওঠে, তেদের সে বোধজ্ঞান আছে? দিছিলি মেশিনটা বন্ধ করি? বাবুর তেল পুড়বে তো অযথা? মুখ ঝামটাইবে যখন তোরা তো দাঁত ছিরকুটে হাসবু—

লম্বা নারান শী লুঙির উপর খালি গায়ে মাত্র একখানা লেডিস চাদর জড়িয়ে সকালটার প্রথম শীত যোঝে। একটু হেসে বলে, মাইরি চাচা তোমাকে এত ভোরবেলা উঠতে হবেনি। কাল থেকে আমি ম্যাশিন লিভিয়ে দুবো।

শেখচাচা রোগা মুখে একটু হাসে। ভাঙা চোয়াল-চোপরা। চোখ-দুটো সেঁধিয়ে কুতকুতে। সকালের হাসিতে খানাখন্দময় মুখমণ্ডল খানিক ভরাট হয়। সাবাড় মালিক ম্যানেজার মাস্টার নিজেদের লোকজন। এক ভাষি, এক রক্তের আত্মীয়-স্বজন। তবুও শেখচাচার কাছে নারান, নারানের বাপপিতামহ

ধারায় এ ভুগোলেরই মানুষ। তাই হাসি-ঠাট্টা সয়ে নিয়ে শেখচাচা বলে, কাল সকাল হউক। দেখা যাইবে কত বন্ধ করিস—

—মাইরি চাচা, বিশ্বাস যাও—

—আচ্ছা। অখন যা—তোর লেবাররা জঙ্গলে হাগতে যায়ে থাপড়ি মেরে বসে আছে। কাজ ধরছেনি। যা ধরে ধরে তুলে আন—

কথাটায় ঠোক্কর থাকলেও বিষয়টা তো সত্য। এত সময় কথা হল…কেউ তো প্রাতঃকৃত্য সেরে আসেনি। কার্তিক থেকে মাঘ এই চার মাসের জন্যে মাথাপিছু তিন হাজার টাকা চুক্তিবন্ধ মজুরি। কাজে এখনও হাত লাগায়নি ছোকরাগুলো। মালিক মিন্টু দাস তো হেঁকে উঠবে, কেমন সব ফাঁকিবাজ লেবার আনসেন গো নারানবাবু? অগ্রিম পাঁচ ছয়শ করে তো দাদন লইসে লেবাররা। কাম হয় কই? কথাগুলো মনে হতেই আর দাঁড়ায় না নারান শী।

গায়ের লেডিস চাদর ঝাপটে ভালো করে জড়িয়ে নেয়। লুঙির খুঁট হাতে ধরে বড় বড় পা ফেলে নারান শী। এবার বাঁয়ে মন্দির ডাইনে গো-ডাউন অফিসঘর তারপর তো পুজারীর রান্নাশাল বা রান্নাঘর। রান্নাশালের গা ধরে যেতে যেতে ভাবে নারান শী, তবু এই চার মাস তো পরিষ্কার কাপড়-জামা পরে রোজগার। সেটাও কি আমাকে করতে দেবে ছ্যাঁচড়াগুলা? ইস্কুলের বারো ক্লাসে পাশ করছিলি—হইলটা কি? সারা বচ্ছর চাষের কাজে কাদা ঘাঁটা নয়তো লঙ্কা বাগানে কোদাল তাড়া?

তাড়াতাড়ি পা ফেলে। বনবিভাগের রোপণ করা গাছের মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। উপড়ানো গাছপালা দুমড়ে-মুচড়ে কাঠি। সেগুলো ডিঙিয়ে-টপকিয়ে পোঁছয় নারান শী ফিশলটের নোনা বাঁধে। গায়ে গায়ে চৌকো কেটে সেই মাটিতেই বাঁধ। বর্ষার জল এখনও চৌকোয়। সেই চৌকো ঘিরে আরও বিস্তৃত ঝোপঝাপ-গাছপালার সবুজে থিকথিক করছে ছোটবড় চেরা গোল পাতা। এই আড়ালে চরের মানুষদের প্রাতঃকৃত্যের স্থান।

ফিশলট্ বাঁচাতে সরু নোনা বাঁধ। বাঁধের উপর উঠে হাঁক দেয় নারান শী, হেই তোরা জলদি লিবি তো—

ছোট-বড় উঁচু-নিচু ঝোপঝাপ। ক্রমশ বিস্তারিত হয়ে সবুজ ডালপালা দূরে সমতলতা রচনা করে। তখন তাকিয়ে মনে হয় নারান শী-র, এই বুনো ঝাড় পার হয়ে মাইলদুয়েক হাঁটলে তো বাসরাস্তা। তার ওপারে নিজের বসতভিটে। এই বসতমাটির সমুদ্র অংশে এখন কাজকর্ম……এখানকার ছেলেছোকরা, মানুষদের খাটতে পারলেই তবে রোজগার। এরাই রোজগারের উপাদান। এই প্রতীতিতে পোঁছে পাশ করা নারান শী উত্তপ্ত হয়। সোজা দাঁড়িয়ে জোরে ডাকে, হই—জলদি কর।

(১৯)

প্রামাণিকবাবুর ফিশলটের গা ধরে নোনামাটির বড় বাঁধ। বাঁধের উপর ঝাঁক

বেঁধে নারী-পুরুষ বাচ্চাকাচ্চার দল।

পুরুষদের মাথায় সরু সরু বাঁশ-বাঁখারি, গাছের ছাঁটা ডালপালা লাঠি হোগলা একসঙ্গে বেঁধে ছোটখাটো বোঝা। মেয়ে-বউদের মাথায় কাপড়চোপড় বিছানা-কাঁথার বড় পুঁটলি। বাচ্চাদের কাঁধে-পিঠে থালা-বাসনা-গেলাস-বাটির বোঁচকা। পলিথিন ব্যাগে দু-চারটে মুরগিছানা।

মানুষগুলো নারী-পুরুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসারশুদ্ধু পায়ে পায়ে হাঁটে। সিধুর চালার সামনে উঠে দাঁড়ায়। যেহেতু চালার পাশ দিয়ে প্রামাণিক বুড়োর ফিশলটের ঘেরিবাঁধ, মাটি ফেলে জল-মাছ আটকাতে যৎসামান্য মেরামতিতে রোগা বাঁধ। মানুষের ঝাঁক হোগলা-বাঁখারির বোঝা, বিছানা-কাঁথার বড় পুঁটলি ধীরে ধীরে লাইনবন্ধ হয়ে এগোয়। সরু পথের দু-পাশে ফরেস্টের মন্দিরা-ঝাউ-বাইন-গরানের ছোট ছোট ঝোপ।

বউটা ডানহাত দিয়ে মাথার উপর বিছানার বড় পুঁটলির এক খুঁট ধরে বাঁ-কাঁখে বছরখানেকের বাচ্চা আগলে পায়ে পায়ে হাঁটে। নোনামাটির ভসকা ঢিলে পা পড়তেই গুঁড়িয়ে ধুলো। উঁচু-নিচুতে টাল খায়।

পিছনে বাঁখারি-হোগলার বাণ্ডিল মাথায় স্বামী গুরুপদ মুখ করে, দ্যাখে পা ফেলাবি তো? এ কি ঘরের উঠোন পাইছু?

উঠোন হইলে এমন বোঁচকা মাথায় ছেলে কোলে হাঁটতে হইতো? তুমি কত বড় উঠোন পাও দেখি—

গুরুপদর সামনে দু-এক বছরের ছাড়াছাড়িতে দশ বারো-চোদ্দো বছরের তিনটে মেয়ে। গুরুপদ বড়টাকে বলে, ও ছায়া লে তো কচিকে তোর কোলে—

ছায়া বাপের দিকে তাকিয়ে হাতে জলের মেটে কলসিটা মেজবোন মায়াকে দিয়ে বলে, সাবধানে লিবি। ঠোকরা লাগালেই খোলামকুচি হইবে— ?

দশ বচ্ছরের মেয়েটা ছেঁড়া বাজার-ব্যাগের মধ্যে মুরগিছানা বইতে বইতে বলে, তা হইলে তো এক্কা দোক্কার অনেক ঘুঁটি হইবে—

বাপ গুরুপদ ছোটমেয়ের এমন অলক্ষুণে কথায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে—তা হইলে আর জল খাইতে হইবেনি।

বছরখানেকের বাচ্চাটা মায়ের কোল বদলে দিদির কোলে। ছায়ার গায়ে হাঁটু ঠেসে বায়না করে, জল-জ খাবো—

মাথায় বোঝার ভারে হিমসিম গুরুপদ। তায় আবার বাচ্চাটা জল জল করে বায়না তোলে। উঠোউঠি তিন মেয়ের পর বাচ্চা ছেলেটা! সেই সকাল থেকে মায়ের কোলে। গায়ের উপর দিয়ে বেলা নটার রোদ গড়িয়ে গেল। জলের তেষ্টা তো স্বাভাবিক। তাই নরম করে বলে, কচি আর একটু চলু বাওয়া— অনেক জল খাবাবো—

শিশুটা অবোধ চোখে দেখে বাপের চোখ মুখ। ক্ষীণতম অনুভূতিতে টের পায় জলাভাব। তখন কাঁইমাঁই কান্না জোড়ে। দশ বচ্ছরের মেয়েটা দেখে, জল খাবার জন্যে কাঁদে অথচ দু-চোখ বেয়ে অত জল আসে কেমন করে…!

বউটার ইচ্ছে হয় বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বুকে তার মুখটা গুঁজ নেয়।

তাহলে বায়না থামে। বাচ্চাটার শুকনো টাকরা খানিক ভেজে। কিন্তু……
মাথার উপর বড় বোঝা। মাটিতে রাখাও দায়। মা বলে, ও ছায়া পারবি এটা নিতে—

—দিবে? দাও—

মা প্রথমে বাচ্চাটাকে বাঁ-কাঁখে নেয়, স্বামী গুরুপদ চেঁচায়, থাম—ও পারবেনি—

—দুস্। তুমি বুঝোনি। কচির যে টাকরা শুখা—ছায়া না পারু তো বোঝা লিয়া এইখানা দাঁড়া। আমি আবার লুবো—

পিছনের লোকজন কাছে আসে। তাদের মাথায় বোঝা-বোঁচকার ভার। চেঁচায়, বাবু—সরো। আমানে যাইতে দাও—

—আমরাও কি যাইবুনি?

—হুঁ। যাইবে? অখন পথের মধ্যি সংসার খুলছে আমানে খাড়া থাকতে হইবে? মাথার ঠিক আছে—?

কোলের বাচ্চাটা জলের বায়নায় উৎপাত করছে। হাতের কাছে খাবার মতো জল কোথায়। ডোবা নালায় তো নোনাজল। নোনাজল সামনের গাঙ সমুদ্রে। সুতরাং বউয়ের ব্যবস্থাটাই তো এ মুহূর্তে একমাত্র সমাধান। বাধ্যত সরে দাঁড়াতে হয়। বোঝা মাথায়, হাতে ব্যাগ, কলসি নিয়ে গোটা পরিবার সরু রাস্তার একধারে। পাশ দিয়ে চলে যায় পিছনের মানুষগুলো বোঁচকা-পুঁটলিতে সংসার বেঁধে। কর্মক্ষম পরিবার পরিজন নিয়ে।

গুরুপদ হোগলা-বাঁখারির বোঝা মাথায় দাঁড়িয়ে দেখে, বালিস্থান চরে সাবাড়ের হোগলা ছাউনিঘর, খুঁটিখাটায় আলোর তার, গরান-খোঁটা বাতায় বড় বড় ফাঁক বেখে বেড়া। পিছনের মানুষ অনেকে বালিচরে পা রেখেছে কিন্তু নিজেরা? সারা গায়ে সব-ফসকানোর যাতনা। বউয়ের দিকে তাকিয়ে গুরুপদ বলে, কি গো হইল?

এক বছরের কচি বাচ্চাটা মায়ের আঁচল-ঢাকনায় বুকের দুধ চুক চুক করে টানে। গুরুপদর দিকে তাকিয়ে বউ বলে, শুধু টাকরা শুখলা নয় গো কচির খুব ক্ষুধা লাগছে—

স্বামী গুরুপদ কিছু বলতে পারে না। মনে ভাবে,…এই খিদা মিটাইবার জন্যিই তো বালিচরে আসা……! কাছে আইসেও পেঁছাইটা কখন? পলিথিনের বাজারি ব্যাগে মুরগিছানার কিচমিচ ডাক। ব্যাগ খুলে ছোটমেয়ে দয়া মুখ ঢোকায়। মুরগির বাচ্চাগুলো মা-মুরগির পিঠে বসে জ্বালাতন করে। দয়া বলে, তোদেরও খিদা লাগছে?

ব্যাগের বাইরে মুখ আনে দয়া। সামনে তাকায়—চর। ডাইনে তাকায়—শুধু সবুজ ঝোপঝাড়। বাঁ-পাশে তাকায় বাবার গম্ভীর মুখ। দয়া মুরগির বাচ্চাগুলোর জন্যে উদ্বিগ্ন।

মাথায় বিছানা-কাঁথার পুঁটলির ভার। ঘাড় কনকন করে ছায়ার। ছায়া ব্যথা কমাতে বলে, বাওয়া—

—কী ?

—আমরা গত বছর যেখানে চালা বাঁধছিলুম সেখানেও এইবার চালা বাঁধবো ?

আর থির থাকতে পারে না গুরুপদ। ছটকে উঠে বলে, হ্যাঁ গো তোর হইল ? লোকে যে আগে ভালো জায়গায় ঘর বসিয়ে লিবে—। কলোনিতে আর জায়গা মিলবে ?

কচি বাচ্চাটা খিদের চোটে ঝুনে ফেলে মায়ের বুক। বউ অসহায় চোখে তাকায়। বউ তখন মা হয়ে বলে, তোমরা আগাও। আমি ধরি ফেলাচ্ছি—

ছায়া বিছানার ভারী পুঁটলি মাথায় এগোয়। পিছনে মেটে কলসি হাতে মায়া। দয়ার ব্যাগে মুরগির বাচ্চাগুলো কিচিরমিচির ডাকে। বাপ গুরুপদ হোগলা-বাঁখারির বাণ্ডিল মাথায় সামনে মেয়েদের বলে, তোরা একটু জোরে পা ফেলা মায়েরা। আগে যাইতে পারলে উঠোন-মাচার জায়গা মিলবে। তা না হইলে বিজয়বাটির লোকেরা বেশি জায়গা দখল করবে। তানকে ঘরের কাছে চর যে……।

বড়মেয়ে ছায়া বলে, আরও আগে বারাইলে হইত—

গুরুপদ রেগে যায়, বারাইছিলি ঠিক। তোর মা যে কচিকে খাবাইতে বুসলে ?

মুগরিছানার ব্যাগ হাতে দয়া বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক! কচিটার অত খিদা…! তানকে খাবাইছে বলে অত রাগ কেন……! আমরা তো চরের গায়ে আসছি! যেখানে হউক চালা পাতলেই হয়। আমরা তো শুধু থাকবো। ধাঁ করে দ্বিধা জাগে ছোটমেয়েটার, ঘরে ঘর উঠোন পুকুর থাকতে আবার এইখানে চালা বাঁধা কেন ? শুধ শুধু বাবা অমন মুখ শুনাইতেছে……!

মিন্টু দাসের সাবাড়, মৌর্ষ দাসের সাবাড়—লম্বা করে হোগলা বাঁধা চালা তার পিছন বরাবর এবড়ো-খেবড়ো বালি অংশ মাটি ফাঁকা হয়ে অনেকখানি। ফাঁকা প্লটটার বাঁদিক ধরে ফিশলটের সরু নোনা বাঁধ। এরিয়া রক্ষা আর জল-মাছ আটকের ব্যবস্থা। মাথায় বোঝা-সহ মানুষগুলো বউ-বাচ্চা নিয়ে একবার ভাল করে দেখে, কোন দিকটায় ঘর বসালে কাজে যাওয়ার সুবিধে। ফিশলটের সরু নোনা বাঁধের পিছনে ঝোপজঙ্গলটাও দেখে। মনে মনে হিসেব কষে পুরুষরা, নালা-ডোবা কতদূর ? চান, বাসন মাজা, মেয়েছেলেদের প্রাতঃকৃত্যের জলটলও কাছাকাছি কিনা ?

পাশ গ্রামের ছোকরা প্রবোধ সামন্ত এগিয়ে আসে কটা মানুষের কাছে। বলে, এটা কার বোঝা গো ?

মাঝবয়সী চিন্তামণি হোগলা-বাঁশখুঁটি দু-বাহুতে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবু ইটা আমার।

পাশে ছোকরা সঙ্গী রেক্সিন মোড়কে বড় সাইজের ডাইরি হাতে। প্রবোধ বলে, জনার্দন এই লোকের নাম মেম্বার সংখ্যা খাতায় লিখে ফেলা—। আমি ওই লোকগুলোর কাছে আছি—।

বেঁটেখাটো জনার্দন বলে, এ দলের গার্জেন কে?

—আজ্ঞা। এই যে আমি—

—নাম?

—চিন্তামণি মাইতি।

—ঠিকানা?

—জেটির বাজার।

—ক-জন লোক? কে কে?

—আজ্ঞা আমার পরিবার, বলেই বছর আঠারো বয়েসের ছেলেটাকে ধরে দেখায় চিন্তামণি, এই ছেলে। দশ-বারো বছর বয়সী দুটো মেয়েকে কাছে ডেকে এনে দাঁড় করায়, এরা দুই বোন।

জনার্দন মেয়ে-দুটোকে একলহমায় দেখে, কালো চেহারায় লাল ফ্রক, মাথায় রুখু চুল। হাতে লাল-নীল কাচের চুড়ি।

ডাইরির পাতায় ঠিকানার পাশে লিখতে গিয়ে জনার্দন বলে, মোট পাঁচজন?

—হ্যাঁ বাবু, আঁকুড়-পাঁকুড় হয়ে সায় দেয় চিন্তামণি।

—ঠিক আছে। পরে খবর দিলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

—কিন্তু বাবু—

—কী তাড়াতাড়ি বলে ফেলান।

—কতটা জায়গা লুবো?

—পাঁচজন যখন…নিন লম্বা চওড়ায় পনেরো বিশ হাত। হইবেনি?

চিন্তামণি মুখ ফুটে কিছু বলে না। মনের মধ্যে আশা, আর পাঁচ-সাত হইলে ভাল হয়…

ডিঙিটায় নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, বাচ্চাকাচ্চায় ঠাসা। ডিঙিটা বালিচরের জলকিনারে ঠেক খায়। মানুষগুলো নামে। ডিঙির খোল থেকে বেরোয় হোগলা-বাঁখারির বোঝা, বিছানা-কাঁথার বুঁচকি-পোঁটলা। কাহনখানেক খড়। ফিশলটের সরু নোনা বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে জনার্দন। বাঁয়ে মৌর্য ডাইনে মিন্টু দাসের সাবাড়। দুই সাবাড় আড়তের মাঝখানে ফাঁকা পরিসর। ফলত গাঙ…সমুদ্রমুখ দুই-ই স্পষ্ট এখান থেকে। মানুষগুলো ডিঙির মালপত্তর নামায়। দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে জনার্দন বে-খেয়ালে নিজেকেই জিজ্ঞেস করে,… ওরা কোথা থেকে হাজির হইল? জনার্দনের এমন বিভ্রান্ত-বাক্যে চিন্তামণি হোগলা-বিছানা ফেলে নোনা বাঁধটার উপর দাঁড়ায়। চিন্তামণি দেখে অবাক! এত মানুষ…। ওরা ঘর বাঁধবে কোনঠি? এই লাল কলোনিতে? জায়গা হবে! আর দেরি করে না। জনার্দনের কথামত লম্বা-চওড়ায় পনেরো-বিশ হাত পরিমাণ জায়গা খোঁটা পুঁতে আগেই ঘিরে ফেলে। প্রথমে দড়ি ঘিরে সীমানা। তারপর চালা নির্মাণ।

দু-তিনবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেও উতরোতে পারেনি। প্রবোধের সঙ্গী হয়েই তবু কিছু রোজগার। এত দ্রুত বাঁশ-খুঁটি পুঁতে ঘরটুকু বানিয়ে

তোলার আগ্রহে জনার্দনের কাছে বিস্ময়। চিন্তামণির ব্যস্ততা দেখে জনার্দনের মনে হল, আদিগন্ত বালিচর···! মানুষের আনাগোনায় বেড়া পড়ছে। সাদা নরম মিহি বালির বিস্তার ক্রমশ সীমায় সংকীর্ণ হয়ে উঠছে।

মৌর্য দাসের আড়তে পিছনের ঝাঁকড়া বাইন গাছের ছায়া। কটা পরিবার প্রবোধের কথা বোঝার চেষ্টা করে। প্রবোধ একলা। হাঁক মারে, জনার্দন—এদিকে আয় তো রে-এ।

জনার্দন ডাইরির পাতায় লিখতে গিয়ে বলে, এই ফ্যামিলির হেড কে?

বিধবা শাশুড়ি, বউমা, নাতি-নাতনি আর বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেটাকে নিয়ে এই চরে। ফ্যামিলির হেড কথাটায় খানিক বোঝে আবার খানিক ঝাপসা। তাই বিধবা শাশুড়ি এগিয়ে যায় জনার্দনের কাছে, আমি তো এদের আনছি গো বাউয়ু? কষ্টের সংসার···কইলুম চরে চলু তবু চার মাস খুঁটেখাটে খাবা হবে, নগদ পুইস্যা মিলবে—

—আ। তুমিই গার্জেন। তোমার নাম?

—আজ্ঞা। জ্ঞানদা ঘড়ুই—

—ঘন কোনঠি গো মেয়ে?

—হাই পাতিবুনিয়া।

—ক-জনা তোমরা?

বাইশ-তেইশ বছরের যতীনকে কাছে ডেকে জ্ঞানদা বুড়ি বলে, এই আমার কোলের বাচ্চা। বউটাকে টেনে এনে দেখায়, এই হলি আমার বড়বউমা। আট-দশ বছরের নাতি-নাতনি দুটোকে ডেকে বলে, এরা হইল বউমার ছেলেমেয়ে—আমার লাতিলাতনি—

জনার্দন বাইশ-তেইশ বছরের যতীনকে দেখে। ছাঁটা চুলে তাগড়া চেহারার মনমরা যুবক। খালি গায়ে কালো চেহারায় অপরিচর্যার কষ। বউটা লাল শাড়ি, ভরাট মুখ। নাকে সরু রিংয়ের বুপোর নথ। কনুই-কবজি মাংসল। বউটাকে জনার্দন বলে, ও যতীন ইনি তোমার স্ত্রী? বউটা ঘোমটা টেনে খিল-খিল হাসে। তবে সরে যায় না। একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ফাঁকে জনার্দনের চোখমুখ দেখে। তারিফ করে মনে মনে ছোকরা লোকটার চোখের জোর। বুকের সাহস। মুখ ফুটে বলবার-কইবার ধারা।

শাশুড়ি জ্ঞানদা ঘড়ুই এগিয়ে যায় জনার্দনের কাছে, ও বাবু—বউমা ওর এস্তিরি নয় গো। বউদি—

—তা হইলে ওর স্বামী কাই?

—নগেন্দ্রবাজার। ডায়মণ্ডহারবার—হাজিপুর। সেখানে—।

শাশুড়ির কথায় ধন্দ। বাইশ-তেইশ বছরের মনমরা তাগড়াই যতীন ভ্যাবলা মেরে তাকিয়ে থাকে। জনার্দন বউটার আড়াল-ঘোমটায় হাসিমুখ দেখে বলে, তোমরাও পাঁচজনা?

—হাঁ গো বাউয়ু, শাশুড়ি সমর্থন জানায়।

জনার্দন শাশুড়ি-বউয়ের কাছাকাছি হয়ে বলে, তোমরা আমাদের কথাবার্তা

শুনবে। আমরাই কলোনির ভার লিছি—

শাশুড়ি বিনয়ী হয়ে বলে, হাঁ—বাবু। হাঁ। তোমরা ছাড়া আমাদের আর কে আছে এই চরে ?

বহু কষ্টে ছায়া বিছানা-পুঁটলি মাথায় বয়ে আনে। হোগলা, বাতার বাণ্ডিল ঝপ্ করে নামিয়ে গুরুপদ প্রবোধকে বলে, বাবু—আমরা আসছি গো ?

—সে তো দ্যাখছি।

প্রবোধের কথায় খানিক মনে লাগে গুরুপদর। লাগলেও কিছু বলে না। বরং পিছনে তাকায়, কচিকে কোলে নিয়ে বউটা কতদূর ?

নোনা রাস্তার ধারে মাটির কলসিটা খুব সন্তর্পণে রাখে মেজমেয়েটা। ব্যাগের মধ্যে মুরগির ছানাগুলো। হাওয়া-বাতাসের লোভে প্রাণ ওষ্ঠাগত। অবিরাম কিচমিচ ডাকে প্রাণীগুলো।

একখানা বিড়ি ধরিয়ে টানে প্রবোধ। গুরুপদ সরু বাঁধে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করে, লাল কলোনির কোন দিকটায় গত বছর চালা বেঁধেছিল ? ঠিক হদিস করতে পারে না। তখন মিন্টু দাসের আড়ত-চালাটার গা ধরে নজর ফেলে। গত বছরে ফিশলটের শুকনো ঝোপগুলো জল-বর্ষা পেয়ে পাশের ঝোপঝাড়ের চেহারায় মিলে গেছে। তবুও আন্দাজে ভাবে, মিন্টু দাসের রান্নাশালের গা বরাবর ছিল যেন ? এখন দেখে বুকটায় ঝাঁকুনি ! সেদিক বরাবর কারা এরই মধ্যে খুঁটি পুঁতে বাঁখারি বাঁধছে দড়ি দিয়ে।

মনমরা তাগড়াই যতীন ঘড়ুই ছেঁড়া তেরপলিনের বোঝাটা সাবধানে খোলে। পঞ্চায়েতের সদস্য বর্ষায় সেটা দিয়েছিল ঘর ছাইতে। ক-মাসে ছিঁড়ে খাবলা-খাবলা। সুতরাং ধীরে-সুস্থে ভাঁজ খোলে যতীন।

প্রবোধ হাঁক দেয়, ও জনার্দন ইদিকটায় আসবা তো—

ঘোমটা খসিয়ে গোটা মুখ বউটার। রুপোর নথে রোদ ঝলকায়। কালো-ফরসার ধারাধারি গলা-ঘাড়ের রং। মাজা দাঁতে রমণীমুখ। দরদী কণ্ঠে জনার্দনকে শুধোয় বউটা, দাদাভাই—ও বাবুর নাম কি গা ?

—কে ?

—ওই বাঁধে বুসে বিড়ি খায়ঠে ?

জনার্দন নজর করে বলে, ও। উতো আমানে প্রবোধদা—

বউটা ব্রীড়া কাটিয়ে লোকটাকে দেখে। জনার্দন বউটার শাড়ি-জড়ানো গা-মুখ দেখে। জনার্দন ভাবে, কাছে তো আমি ! অত দূরে চোখ যায় কেন বউটার ? তবে কি ধরতে পেরেছে ক্ষমতায় প্রবোধদা অনেক বেশি জরুরি ...।

(২০)

যেহেতু মেসিনের বিশ্রী ভট্‌ভট্‌ শব্দ, জেনারেটার রাখার চালাটা লেবার শেড থেকে খানিক দূরে। মাত্র একখানা হোগলা দো-চালা করে টাঙানো। রোদ

আটকায়, রাতের হিম থেকে বাঁচায় মেশিনটাকে। পাঁচ কিলো ওয়াটের জেনারেটার গা-ময় ডিপ কলাপাতা রং।

মেশিনঘরের তিন দিকে একফারকা হোগলা বেঁধে দেওয়াল। শুধু আড়ত-মুখো খোলা। সরু লিকলিকে বাঁখারি দিয়ে হোগলা বেঁধে দরজা। হাওয়া-বাতাসে হোগলার বুনন সরে খসে ফরফরে ফাঁকা।

শেখ আলাউদ্দিন সাবধানে হোগলার বেড়া-দরজাটা খুলতেই এককাতি মেরে নেতিয়ে থাকে। মনে মনে রাগ করে ছোকরা লেবারদের উপর, শালার ছ্যামরাগুলান। তোরা শুবি ভাল ঘরে আমার ম্যাশিনের বেলায় যত ছেঁড়া-ফাটা হোগলা? আমার ম্যাশিন বিগড়াইলে সব যে অন্ধকারে হাঁচাবি রে—।

বেড়ায় গিট দিচ্ছিল ছোকরা মলিন পড়ুয়া। পিছনে তাকিয়ে দেখে শেখচাচা বকে যাচ্ছে নিজের মনে। সুতরাং চেঁচায়, কী বিড়বিড়াচ্ছো গো চাচা—? লজঝড় ম্যাশিনের সঙ্গে কী কথা কইতিছ?

—আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু।

মলিন পাশে তাকায়। জগন্নাথ সরু সরু গরান বাতা চার-পাঁচ হাত উঁচু খোঁটার গায়ে বেঁধে বেঁধে এগোয়। মলিন বলে, ও জগন্নাথ—?

—কি র‍্যা? হাতের কাজ থামিয়ে জানতে চায়। মাথার উপর চড়া রোদ। কাজ থামাবার মতো সূত্র কিংবা সুযোগও পায়।

—চাচার লজঝড় ম্যাশিন ভট্‌ভটায়, চাচার মুখও ফট্‌ফটায়।

শেখচাচা মুখ ছুঁচাল করে বড় বড় দাঁতে ভেংচি কাটে, তোমাদেরও কুটকুটায়—

—কি? কি হইল? বলে হাতের কোদাল থামায় ক-জন। এতক্ষণ বালির উঁচু-নিচু কোদাল টেনে সমান করে দিচ্ছিল ছোকরাগুলো। আট-দশ বিঘে পরিমাণ সাবাড়ের বিরাট পাড়ন। শুকনো বালির উপর মাছ শুকোবার ব্যবস্থায় কাজ চলছে এখন।

অতগুলো ছোকরা ছেলে একসঙ্গে গলা তোলে, ধর তো রে চাচাকে। নিজে বুড়া হইছে বলে আমরাও যেন বুড়া?

শেখচাচা হাতছানি দিয়ে ডাকে, আয় তোরা কত জোয়ান আছিস আয়। তোদের সকলাকে মবিল খাবিয়ে দুবো—আয়।

ছোকরাগুলো কাজ ছেড়ে একটু হাসে। ঠাট্টার লোক পায়। কোমরের গামছায় ঘাড়-গলা মুছে স্বস্তি খোঁজে।

ফিশলটের সরু নোনা বাঁধের উপর খসখস শব্দ। মেশিনঘর থেকে ফিশলটের আলবাঁধ আর কতটুকু! মুখ তুলে তাকায়। তিনজন লোকের মাথায় ভাগজোখ করে কাহনদুয়েক খড়। তিনটে বোঝা মানুষ তিনজনের মাথায় নেচে-নেচে, দুলে-দুলে, নড়ে-চড়ে এগিয়ে আসে।

শেখচাচা চেঁচায়, এই ছেলেরা দেখ্‌রে—কী আসেঠে?

সকলের নজর ওদিকে টেনেছে বুঝে আবার বলে, পাহাড়। তোদের ঘাড়ে চাপবে—

মলিন বলে, দুস্। তোমার গদির বিছানা হইবে। তাই মালিক আনছে।

—আ রে দেখ না। আমার বিছনা কি তোদের ঘাড়ে—, বলে একবার তাকায় খড়ের বোঝার দিকে। লম্বা লম্বা পাইয়ের আঁটি। গাদার মাঝখানের জিনিস। একেবারে কাঁচা সোনা রং। বেলার রোদ লাগতেই চমকে যায় বুকের ভেতরে শেখচাচা! মনে ফোটে,…গত বছরের আগে বৈশাখে ঘোড়াটা বেচবার সময়ে গা-ময় লোমে এমন চটকদার রং…।

ম্যানেজার জলধর আগে এসে কোদালিদের কাজের কাছে দাঁড়ায়। আট-দশ বিঘের সাবাড়ের মধ্যে এটাই তো পাঁচ-ছ বিঘের পরিমাণ। এখনও সামনের দিকে কাজ অনেকটা বাকি। দু-একদিনের মধ্যে ফাড়ে জাল-ট্রলার-ডিঙি সব যাবে। কাজেই এদিকের ব্যবস্থা তো সেরে ফেলা দরকার। মালিক চেঁচামেচি ফেলবে…, কাজ দেখতে এসে মনে হয় জলধরের।

রান্নাশালের ওপাশ দিয়ে তিনখানা খড়ের বোঝা পাশ কাটায়। বোঝা মাথায় তিনজন একই সঙ্গে বলে, কোথায় ফেলাবো গো?

উনুনে মোটা কাঠটা ঠেলে দেয় পুজারী গোপাল বেরা। হাঁড়ির ভাত ফোটে। বুট বুট শব্দ হয়। রান্নাঘরের বাইরে এসে গোপাল বেরা অবাক! এত খড় কেন!

—তবে এইখানে ফেলাই?

—উহুঁ থামো। বাবুদের জিজ্ঞাসা করি—

কথাবার্তার ঢেউ ম্যানেজার জলধরের কানে যায়। পিছনে নজর যেতেই হাঁক দেয়, এই যে—এইখানে আনো গো ভাই।

আড়তের সামনে দু-খানা আট-ন ফুট উঁচু মোটা সাইজের ঝাউখুঁটি। একটা ফুটচারেক মোটা কাঠ খুঁটি-দুটোর ডগায় আড়াআড়ি বাঁধা মোটা কাছিখণ্ড দিয়ে। এখনও লোহার 'এস' হুক ঝোলানো হয়নি। দাঁড়িপাল্লার কাঠামো মাত্র।

কাঠামোটা পাশ কাটাতে খড়ের বোঝা মৃদু ধাক্কা পায়। একটু সতর্ক হয়ে তিনজনই এগোয়। বাঁয়ে মন্দির, খুঁটি-উইংসের বাইরে নতুন গামছায় ঘট-চাপা গাজিপীর সামলে সাবাড়ের বড় পাড়নে খড়ের বোঝা পর-পর নামায়। ঝপাস্ শব্দে কাজের লোকগুলো একবার পিছনে দেখে।

জলধর বোঝা তিনটের কাছে এসে বলে, ভাই দু-কাহন হবে তো?

একজন বোঝা বওয়া লোক বলে, বাবু আঁটি গুনে লিন—

আর একজন পরামর্শ দেয়, চার চারা—ষোলো। ষোলোটা আঁটিতে এক পণ। এক তড়পায় তো এক পণ। ষোলোটা তড়পা গুনে লিন—

জলধর লোকগুলোর মুখের কথা ঠিক ধরতে পারে না। তার শৈশবে ধারাপাতে কড়া-গণ্ডার হিসেব শেখায়নি তো ইস্কুলে। ভাবে, এদেশের মাটি জলে ঘুরে ফিরে উপায় ইনকাম। এদেশের হিসাব নিকাশ বুঝি কই…! দেশের মানুষ পুরাতন…দেশের মাটি জল তো আরও পুরাতন। ইস্কুল পাঠশালে যা যা শিখালো তা দিয়ে এঁটে উঠি কি করে?

জলধরের বিপন্নতায় বুড়ো মুটে বলে, আপনার কোন ভয় নাই। হিসাবে ঠিক আছে। সামনে গাঙ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলে, মা গঙ্গা সাক্ষী—কোন মিছে কথা নাই গো বাবু—

প্রথম জন সাগ্রহে জানতে চায়, আর খড় লিবেন বাবু ?

জলধর কোনও আশ্বাস দেয় না।

দ্বিতীয় জন বলে, জঙ্গল থিকে হেঁতাল পাতা কাটতেও ঝামেলা। গোড়ায় বগড়া কাঁটা ফুটলে বিপদ—

কথাটার মধ্যে জোর করে ঢুকে যায় প্রথম জন, হউক কাঁটা। এমনি ফরেস্টাররা বাবুদের বুসতে দিতে চাইছিলেনি—। তাদের জঙ্গলে হেঁতাল পাতা কাটতে দিবে কি ?

জলধর মানুষ তিনজনের কথাবার্তার ধারায় টের পায়, এরাই তাহলে ফরেস্টারের বনসংরক্ষণ কমিটির উৎসাহী সমর্থক ? বুঝলেও ঘাঁটায় না। যেহেতু এদেরই গ্রাম আশেপাশে, জলধর সন্তুষ্ট করতে বলে, সত্যিই তো ? তাদের গাছপালা—আমাদের কাটা তো অন্যায়—

প্রথম জন মুগ্ধ হয়ে বলে, বাবু সত্য কইছেন।

দ্বিতীয় জন আবার যোগ দেয়, বাবু—আপনাদের কত খড় প্রয়োজন, আমরাই দুবো—।

—লগদ পাবেন না কিন্তু ? ব্যবসা চালু হোক—মাসখানেক পরে পাবেন।

দ্বিতীয় জন বলে, তাতে কি ? আপনাদের টাকা মার খায় ?

প্রথম জন জলধরকে খুশি করতে বলে, কই ? কোথাও তো শুনি নাই, আপনারা টাকা শোধ দেননি—।

পাশ গাঁয়ের লোক তিনজনের উচ্ছ্বাসে জলধর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এখন তাদের মধ্যে সওদা করার শ্রম আর মুনাফার কৌশল আয়ত্তের চেষ্টা ফুটে ওঠে। তখন জলধরের বলতে ইচ্ছে করে, তোমরা বন কমিটি করে চরে সাবাড় বসতে দিতে চাইছিলে না, তাতে বেশি রোজগার ? না দেড়শ টাকা কাহনের খড় আড়াইশ টাকায় বেচে বেশি লাভ ? ইচ্ছে হলেও বলে না। বরং মানুষগুলোকে হাতে রাখতে একটা টোপ ফেলে, দেখেন বাবুরা—এখানে কুড়ি-বাইশটা আরত—সব্বাইরে খড় লাগবে। কালকে একবার আসবেন। আমি অন্য মালিকদের সঙ্গে কথা বলি--?

—হাঁ ম্যানাজার বাবু হাঁ, ঠিক বলছেন—, তিনজন একই সঙ্গে বকবক করে। তাদের চোখের সামনে বালিচরটা যেন বালির নয়, পয়সা…বিশ-পঞ্চাশ-একশ-পাঁচশ টাকার নোটের চর।

জলধর লেবারদের হেঁকে বলে, এই তোরা বালি প্লেন করা হলে খড়ের আঁটি খুলবি। খড়গুলো বিছিয়ে বিছিয়ে তার উপর নাইলন নেট ওই—, বলে বোঝাটা দেখায়।

দু-তিনজন লেবার জলধরের কাছে। তারা সরু নাইলন সুতোর ঘন বুননের পুরনো বাণ্ডিলটা দেখে নেয়। তারপর বলে, ওগুলায় সব জায়গাটা

ঢাকা যাবে ?

—দ্যাখ কতটা কুলায় ঢাকা দিতে ? দরকার হলে বলবি আবার দিবো—

কালো ছেঁড়া লুঙি দিয়ে শেখচাচা জেনারেটারের ডিজেল ট্যাঙ্কারের গা মোছে। পাশে গোলাকার ফিলটার চেম্বারের গায়ে গুঁড়ো বালি মুছে মোবিল চেম্বারের গায়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া ঘষে। ঘষতে ঘষতে হাতে খানিক পোড়া মোবিল। পাঁক কাদার মতো কালো। বাধ্য হয়ে ডানহাতের মোবিল সামলে বাঁহাতে ন্যাকড়াটা ঘষে যায় মেশিনের গায়ে।

খড়বওয়া লোক তিনজন জলধরের পিছু-পিছু। তাদের মধ্যে প্রথম জন বলে, ওই ম্যাশিনের বুড়াকে চিনি বটে!

—কিসে ? দ্বিতীয় জন জানতে চায়।

—আগো বুড়ার যে দৌড়বাজ ঘোড়া আছে—

তৃতীয় জন ফুট কাটে, আনছে নাকি সৌ জন্তুটাকে ? নিজেই আবার বিবরণ তৈরি করে, আনতে পারে। ফিশলটের ঘাস পাতা পাইলে বুড়ার ঘোড়া যুদ্ধের জানোয়ার হইবে—

প্রথম জন বলে, ধুস্। ঘোড়া গাধা দিয়া আর যুদ্ধ হয় ? অখন তো কামান উড়োজাহাজ রকেট লাগে—

—তুমি থামো। কেলাব-মোড়ের ভিডিও হলে দু-টাকার টিকিটে দ্যাখছি—, দ্বিতীয় জন শুরু করে।

প্রথম জন বলে, কী ?

দ্বিতীয় জন বকে যায়, ডাকাতরা তাগড়া তাগড়া ঘোড়া ছুটিয়ে বন্দুক মারে। পুলিশরা জিপগাড়ি নিয়ে হিমসিম। ঘোড়ার লাগাম টেনে ডাকাত তাড়ায়—দুম্বো দুম্বো চেহারার পুলিশ—

—ধুস্। পুলিশ নয় তা হইলে মিল্টারি—

জলধর লেবারগুলোকে কাজ বুঝিয়ে তাকায় তিনজনের দিকে। কী কথায় যে মশগুল বুড়ো, মাঝবয়সী, ছোকরা মিলিয়ে তিনজন! বেশ বেচাকেনা হয়েছে বলে, এত আনন্দ! এক পা এগিয়ে জলধর বলে, কই আসো গো বাবুরা আরতে—অফিসঘরে।

বড় সাবাড়ের তিন দিক বেড়া ঘিরে আটক। ছোট সাবাড়ের দু-দিক ঘিরে আড়তমুখী পথের দিকে ক্রমে ক্রমে বেড়ার কাজ এগিয়ে আসছে। ডাইনে বিশালাক্ষী, দুর্গা, গাজিপীরের মন্দির-স্থান হোগলা-ঘেরা ঘরে। সোজা আড়তের অফিসঘর।

গোটা ঘর জুড়ে বাঁশ-বাঁখারি বিছিয়ে মাচা। মাচার উপর মোটা চট পাতা। রান্নাশাল ঘেঁষে হোগলা-পার্টিশানের গায়ে বস্তার পর বস্তা সাজিয়ে চাল। বস্তাদুয়েক ডাল। মাচার নীচে শাক-সবজির ঝাঁকা। ঝাঁকার পাশে সরষের তেলের টিন কখানা। কেরোসিন-ডিজেল মুখ দিয়ে টানার সরু পাইপটা হোগলার গায়ে সাপের মতো জড়িয়ে আছে।

চালের পাশে জলধরের বিছানা। মাথার কাছে বড় কিটস্ ব্যাগ। দু-চার-

খানা শীতবস্ত্র। সোয়েটার, মাফলার, শাল, চড়া শীতের জন্যে মাঙ্কিটুপি। হোগলার বাতায় পেস্টব্রাশ গোঁজা। বিছানার পাশে চকচকে শিটের বড় সুটকেস। আড়তের হিসাব-নিকাশের মোটা মোটা খাতা কখানা। দু-তিন প্যাকেট অ্যালোপ্যাথি ট্যাবলেট, মলম, ক্যাপসুল আর এক কৌটো হোমিওপ্যাথি ওষুধ।

নিজে মাচার উপর উঠে জলধর তিনজনকে বলে, কই বাবুরা বসেন গো আপনেরা।

মাচায় মচমচ শব্দ। গোটা কাঠামোটা নড়ে ওঠে। খড়বওয়া তিনজন মাচার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে।

জলধর বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতাটা বের করে বলে, কার নামে লিখব? নাকি তিনজনের নামেই?

প্রথম জন বলে, না ম্যানেজারবাবু। আমাদের বয়স্ক মুরুব্বি-মানুষ এই স্বদেশবাবুর নামেই লিখে ফেলান—

—বেশ। স্বদেশ কি?

দ্বিতীয় জন মাঝবয়সী গেঞ্জি গায়ে স্বদেশ বলে, পাত্র গো বাউয়ু?

—ঠিক আছে। খড় দু-কাহন। আড়াইশ গুণিতক দুই সমান পাঁচশ। লেখা হয়ে গেলে বলে, নেবেন কিছু?

লেবারদের চালানকারী নারান শী মাচার সামনে দাঁড়ায়। জলধর খাতা থেকে মুখ তুলতেই নারান বলে, ম্যানাজারবাবু—

—বলেন?

—খড় কি আঁটি বিছাবো? নাকি খুলে বিছিয়ে বিছিয়ে দুবো বালির উপর?

—কোনটা ভাল হবে?

—তিন-চার-মাস তো মাছ শুকাবে? লোকজন কাজ করবে? আঁটি গায়ে গায়ে বিছালে ভাল।

—হুঁ। যা খড় আনছি তাইতে আঁটি বিছালে বড় সাবাড় কুলাবে?

—উঁহু। আরও হাফ কাহন লাগবে।

—তবে যা খড় আছে আঁটি খুলে বিছিয়ে বিছিয়ে বড় সাবাড়ের কাজ শেষ করে দাও।

—কেনি গো বাউয়ু। ভালভাবে করুন না? খড় লাগে আমরা আনি দুবো। এ-বেলা কইলে ও-বেলায় হাজির করব—, হুড়মুড় করে পরামর্শটা দেয় স্বদেশ পাত্র।

—আপনি থামেন তো, বলে বেশ জোরে দাবড়ি হাঁকে। খড়বওয়া তিনজন যেন উঁচু গাদা থেকে পা-হড়কে নীচে পড়ে যায়।

ডানহাতে মবিল। কাপড়-কাচা গোল সাবান, কেরোসিন না হলে মোবিল উঠবে না। তাই বাঁহাতে অতি যত্নে পাঁচ কিলোওয়াট জেনারেটারের পুলিচাকা মোছে শেখচাচা। ন্যাকড়াটা দিয়ে পুলিফিতের গা মুছে দেয়। ধোঁয়া বেরুনো

একজস্ট নলটা মুছে ঝুল সাফ করে।

খড়ের আঁটির ছোট্ খুলে দিতেই আঁটি আলগা। লেবাররা বিছিয়ে বিছিয়ে পাতলা করে দেয়। তলার বালি ঢাকা পড়ে। সাদা মিহি নরম বালির একটা স্তর তৈরি হয়। কাজের গতি দেখতে দেখতে নারান শী বলে, এ বছর এইটা বাবুদের বাড়তি খরচ হইল—

দু-তিন জন লেবার কাজ ফেলে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে। এরা তো এ-কাজে একদম নতুন। থেমে থাকলেও যেন অনেককিছু জানতে প্রশ্ন করে। সেগুলি বাক্যের আকার পায় না। তবে আগ্রহ আছে।

—আ রে এত বচ্ছর তো ওই ফিশলট্ না হয় লুথিয়ানের জঙ্গল থেকে কাঁচা হেঁতাল বগড়ার ডগ কেটে এনে বালির উপর বিছাইলে একদিনে শুকনা হইত। তারপর নেট বিছাও—

—মালিক তাই করলিই পারতো?

—দুস্। একে কেস চলতিছে। পাতা কাটতি গ্যালেই জেল—ফরেস্টার জেলে পাঠাইবে—

রোগা রোগা দু-হাতে পোড়া মোবিল প্রায়-আলকাতরা রং। দু-হাতের চেটো আঙুল মেলে ভূতের ছবির মতো তেড়ে আসে শেখ আলাউদ্দিন। খালিগায়ে শুধুমাত্র লুঙি পরে ভয়ংকর চেহারা। নারান শী-র কাছে গিয়ে শেখচাচা বলে, তুই তো লেবার সর্দার? আয় তোর মুখে আগে মাখাই। আমার ম্যাশিন নাকি লক্কড়?

মোবিলের চেহারা দেখে ভয় পায় নারান শী।

অন্য লেবার ছোকরারা বলে, তাই তো? একদম লজ্ঝর— ।

—থাম শালারা। লজ্ঝর। দিস তো তোরা কেরাছিন মিশালো ডিজেল? দোষ আমার ম্যাশিনের?

—তাই তো। আর সকলের তো এত খারাপ হয় নে?

—হয় নে? থাম শালারা—আমি যাইঠি তোদের মুখে পালিশ দিচ্ছি, তেড়ে যায় খড় বিছানো পাড়নের উপর দিয়ে।

সাজানো ঘড় ভসকে সাবাড়ের ক্ষতি। নারান শী চেঁচায়, ও চাচা থামো না—

—তোর লেবারদের আগ্রিম থামতে বল, শেখচাচা খেপে যায়।

সাবাড়গুলোর বেড়ার পর থেকে পায়ে পায়ে নরম বালিচর শক্ত হয়ে চলা-চলের সহজ পথ। চটির ফটাস্ ফটাস্ শব্দ। বড় সাবাড় আর ছোট সাবাড়ের দুই বেড়ার মাঝখান দিয়ে মিন্টু দাসের আড়তে ঢোকার পথ। নরম বালি-বাঁশ-কাঠ টানাটানিতে উসকে উঁচু-নিচু। দুই বেড়ার শুরু পথে বড় বড় খুঁটি দিয়ে লম্বা গেট। গেটের মাথায় তিনখানা পাইপলাইট 'ভি' বর্ণে সাজানো। যাতে রাতের অন্ধকারে মাঝগাঙ, দূর সমুদ্র থেকে ট্রলার হদিস পায়, কোনটা মিন্টু দাসের আড়ত।

'ভি' গেটের তলা দিয়ে ঢুকে যায় মিন্টু দাস। শেখচাচার এমন ভূতুড়ে

কাণ্ড দেখে বলে, কি হইস্যে গো চাচা— ?

—এরা কইছে আমার ম্যাশিন লজ্‌ঝড়—

—দুস্‌। জানে ওরা ? তোমার ম্যাশিন কত দামি !

—তবে ? শুনরে ছ্যামড়ারা—শুনু—

—চাচা তোমার সান হইস্যে ?

—না। করতে দিলে পাজিগুলা ?

—যাও সমুন্দুরে সান করি লও। সাবান আছে ?

—হাঁ। আছে—

হাতদুটোর দশা দেখে মিন্টু দাস বলে, চাচা যান। ভাল কইর‍্যা সাফ হইয়া সান সারি ফেলান গো। কাম আছে—

—ফাড়ে যাইবে কোন বেলা ?

—আগামী কাল দুপুর ভাটায়—।

শেখচাচা মুহূর্তে বদলে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে পরে হেঁটমুণ্ডু হয়ে করুণা মাঙে, খোদা দয়া কর। কৃপা কর—

মিন্টু দাসও কপালে হাত ঠেকিয়ে মন্দির উদ্দেশে গড় করে।

(২১)

চার নম্বর, পাঁচ নম্বর সিলভার হাঁড়ি। কলতলা থেকে পর-পর আসে ঘাস বালির উপর। পায়ে পায়ে জল-ঘাসে প্যাচপেচে। তারপর একশ লিটারের পলিথিন ড্রাম খানদশেক। গায়ে-গা লাগিয়ে লাইন। ছোটো সিলভারের ভাতের হাঁড়ি পর-পর ছ-সাতখানা। মেটে কলসি খানদশেক। আবার একশ লিটারের ড্রাম। দু-দিকে হাতল-ব্যবস্থা। কালো কুচকুচে ড্রামগুলো আচমকা বিভ্রম জাগায়, টায়ারের স্তূপ।

ড্রামগুলোর হাতলে নাইলন দড়ি জড়ানো। হলুদ, লালচে, ফ্যাকাশে নীল ঝুলে থাকে গা বেয়ে। মোটা গেঁটে বাঁশের পাঁচ-ছ-হাতি খুঁটি ড্রামওয়ারি পাশে পড়ে আছে। জলবওয়া লেবার, হাঁড়ি মেটে কলসির হকদাররা হাঁড়ি-কলসির সঙ্গে একটু একটু করে এগোয়। টিউকল ছুঁতে পায় না। দেখতে পায় মাত্র। পিছনে তো অফুরন্ত নোনাজল !

কলতলা থেকে চওড়া রাস্তা রেখে দু-দিকে দোকানপাট। মুদিখানা, চা-পান-বিড়ি, আলকাতরা-পেরেক, জালে ভাসানো ককশিট ফিশবল মায় চুল-দাড়ি কামানো সেলুন। ওপাশে একখানা কাচের শো-কেসে ওষুধপত্তর। ভেতরে ছোট্ট টেবিল-চেয়ার-স্টেথো নিয়ে প্যাণ্টশার্ট পরে ডাক্তারবাবু বাসি খবরের কাগজ পড়ছেন। ছোট্ট বোর্ডটা ভেতরে হোগলা দেওয়ালে ঝুলছে,

প্রামাণিক ফার্মেসি

ডাঃ এ কে প্রামাণিক আর এম পি

বিঃ দ্রঃ—সকল প্রকার রোগ যত্নসহকারে পরীক্ষা

করিয়া ঔষধ নির্ণয় করা হয়। কাকদ্বীপের ডাঃ
পাড়ুইয়ের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ সহকারী।

কলতলায় লোহার হাতল টানতে চাপতে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ। হাঁড়ি-কলসির হকদার মেয়ে-বউগুলো গলা চিরে কিচিরমিচির চেঁচায়। হাত-মুখ দুলিয়ে ক্যাঁচাল চালায়। শাঁখা-চুড়িতে ঝন্ঝন্ বাজে।

ছোকরা লেবাররা বিড়ি টানে। বুড়ি বিধবারা মাথায় ঘোমটা দিয়ে ডান-হাতের কোষ-আড়ালে ফুকফুক বিড়ি টানে। যুবতী বউ একটু তফাতে বিড়ি টেনে পাশের বউটাকে বলে, লে। আস্তে টানবি—বুকে খিল লাগবে।

—লাগুক। বুক থাকবে তো?

—কেন থাকবেনি?

—হুঁ। তা না হইলে তোর পিসাতুতো দাদা কলোনির কোন চালায় আবার ঢুকে পড়ে—

—আহা লো। দাদা ঢুকলে—তুইও ঢুকে পড়বি আর কেউ দাদাবাবুর দোরে।

বিড়িতে দু-টান মেরে বউটা বলে, শুন—

—কি লো?

—কাল কাণ্ড হইছে।

—কি টা?

—হাইযে রে মনমরা যতীন? ভ্যামলা ছোকরা?

—হ্যাঁ। বুড়ি শাউড়ি ছুকরি বউ লিয়ে আইছে?

—হুঁ। তার দোরে—রাত অনেক রাত অব্দি কলোনি বসাইছিলে যে বাবুরা? তারা বিড়ি ফুকাইলে—বউটা আগুন দিলে। ভিটির ভিটির কথা কইলে কতক্ষণ ধরে—

সঙ্গী বউটা বলে, তানকে সঙ্গে মিশ খাইছে? তবে তো সব কাজ ওই মনভোলানি পাইবে।

—কেনি? আমরা পাবোনি?

একদম কলের কাছে দুশো লিটারের ড্রাম। যেহেতু কলের মুখ ছাপিয়ে ড্রামটা, দুই লেবারের একজন পাম্প করে অন্যজন বালতি ভরায়। তারপর বালতির জল ড্রামে ঢেলে দেয় ।অত বড় ড্রাম ভরতি হতে দেরি হয়।

লাইনের হাঁড়ি বসিয়ে মেয়ে-বউগুলো অস্থির। বছর বারো-তেরো বয়সের মেয়েটা বলে, ও বালতি একটু থামুনা গো—হাঁড়িটায় জল লিই?

ছোকরাটা দাবড়ি দেয়, আমরা জল লইসি না খেলা করসি?

পাশের বউটা গলা খরখরিয়ে বলে, অতবড় পেট। কখন ভরবে তারপর আমরা লুবো?

পাম্পকরা ছোকরাটা ফচকে গলায় বলে, মেয়েদের থিকেও?

বউটা হকচকিয়ে বলে, হুঁ। হুঃ তো। অত বড়ো জালা—? আজ রাত ফুরাইবে। আমরা রাধবুনি?

কথাবার্তায় নরম বাক্যবিনিময়। বউটা গায়ের কাছে এসে বলে, ভাই—সোনা। দুবোনি এক হাঁড়ি জল। এই তো একটুকা ছোট হাঁড়ি রে ভাই—

ছোকরা লেবার পাম্প করে দেয়। চালাক বউটা খালি হাঁড়ি জলে ভরে নেয়।

পিছনের কটা বাচ্চা মেয়ে হাতে পেনি ছোট বালতি নিয়ে কলতলায় দাঁড়ায়। বলে, আমাদের একটু দাও না গো—

বালতি হাতে লেবারটা হেঁকে ওঠে, পালা। হঠ এহান থেকে। ট্রলারে একটুও খাবার জল নাই?

বাচ্চা মেয়েগুলো ঠোঁট ফুলোয়, অহ্। এইটুকা করে হাঁড়ি। কত জল… কত যেন দেরি হইবে গো? কচি বোনটা জল জল করে কাঁদেঠে।

চালাক বউটা হাঁড়ি ভরতি জল মাথায় তুলতে যাবে মেয়েটার অমন কথায় ডাকে, এই মেয়ে শুন তো?

—কি?

—তোর ঘর কোনঠি?

—লাল কলোনির ইধারে। হাই গাছে আলো জ্বলে?

চালাক বউটা একবার কলের দিকে তাকায়। বড় ড্রামটায় জল ভরছে দুই ছোকরা। তারপর আরও ড্রাম কখানা। জলপ্রার্থিনী মেয়েটার ছোট্ট সিলভার হাঁড়ি খালি দেখে মায়া হয়। লাইনের পর হঠাৎ আট-দশখানা খালি ড্রাম এনে দড়ি-বাঁশ ছাড়ায় ছোকরাগুলো। বউটা বলে, এই খুকি হাঁড়ি পাত—

নিজের বড় হাঁড়ির জল ঢেলে দেয় খানিক। চকিতে ছোট্ট হাঁড়ি ভরে যায়। বলে, কি র্যো? হইল?

মেয়েটা তাকিয়ে থাকে চালাক বউয়ের মুখের দিকে।

—তোর কচি বোনের জল খাবা হইবে তো?

মেয়েটা মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানাতে ভুলে যায়।

একখানা শক্ত পাঁচ-ছ-হাতি বাঁশ জলভরতি ড্রামের দুই হাতলে বাঁধা নাইলন কাছিতে গলিয়ে নেয়। দুই ছোকরা কোমরের গামছা পাট করে কাঁধে বিছিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে পিঠ বাঁকিয়ে টুকরো বাঁশটার দু-প্রান্ত দু-জনের ঘাড়ে গামছার উপর তোলে। দুশো লিটার জল। চলকে ওঠে ড্রামের মধ্যে। বাঁশের মাঝখানে ড্রামটা ভারী হয়ে ঝুলে থাকে। বাঁশের বাঁক কাঁধে সামনের ছোকরা মুখে আওয়াজ করে লোকজনকে, খবরদার—এই খবরদার—

চলতি লোক সরে দাঁড়ায়। চরের ঢিউকলে লোহার হাতল কলের গায়ে লেগে আচমকা শব্দ হয়, ঘটাং। জলভরতি ড্রামের ভারে বাঁকের দড়ি কড়কড় শব্দ করে। পিছনের ছোকরা দাঁত কামড়ে বলে, ও সোটো ধীরু—

দুশো লিটারের ভার ঘাড়ে, তলায় নরম বালি। পা ডুবে যায়। পা তুলে ধীরু বলে, কি র্যা?

—দরি টাইট দিসিলা?

—হুঁ। জুরে পা চালা—।

পায়ের বালি সেঁতিয়ে গেছে রাতের হিমে। দোকান, আড়তের পাইপলাইট বাল্বের আলো ভিজে বালির গুঁড়োয়। জল চলকে চলকে বাজে পলিথিন ড্রামের অন্দরে। ঘাড়-পিঠ টান-টান, দুই ছোকরা বহন করে মিঠেন পানি নোনাজলের পাশ ধরে।

কুড়ি-বাইশখানা আড়ত। কুড়ি-বাইশখানা ট্রলার, ফাড়ের নোনাজলে ডিঙির মানুষের জন্যে জল। পানীয় জল সংগ্রহ চলে।

তিনখানা পাইপলাইটে 'ভি' বর্ণ গেট। গেটের তলা দিয়ে দুশো লিটারের পলিথিন ড্রাম বাঁকে বয়ে নিয়ে আসে দুই ছোকরা। জঙ্গলে মুড়োকাঠ হরিণের আঁকা-বাঁকা শিংয়ের মতো সরু মোটা ডালপালা ভুগে নেওয়া গোড়া অংশ। কদিন রোদ পেয়ে নোনা কাদা শুকনো। মাটির তলায় পচে-রসে কয়লার চাঁই রং। রান্নাশালের সামনে কাঠকুটোর পাশে ঠকাস করে ড্রামটা বসিয়ে একটু দম নেয়। জলভারে ঘাড়-বুক চাপ খেয়ে ভারী। দাবনা-কোমর থরথর কাঁপে। ধপাস্ করে বালির উপর বসে দুই ছোকরা। কপালে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম মিলেমিশে দরানি বয় নাকের পাশ দিয়ে। গলার ঘাম ধারা পায় বুকের খাঁজে।

বড় কড়ায় ডাল নেড়েচেড়ে জল ঢেলে দেয় গোপাল বেরা। খুন্তি নেড়ে একবার ঘেঁটে দেয়। পরিমাণমত লবণ দেয়। ভোল গুড় ঢালে খানিক।

উনুনের কাঠ ঠেলে দিয়ে পাশে বালতির জলে হাত ধোয়। ভিজে হাত গামছায় মোছে? রোগা শরীরে শীত শেখচাচার। পাতলা জামা গায়ে উনুনের জ্বালুন-মুখে বসে আগুন-তাতে শীত আটকায়।

আশি লিটারের জল ফুরনো পলিথিনের ড্রামটা দুদিকে হাতল ধরে বয়ে আনে গোপাল বেরা, মুড়োকাঠের কাছে রাখে। ওপাশের ছোকরারা বলে, হাই পুজারী আর একটা আনছে—।

পুজারী গোপাল বেরা আগুন-তাপে ঘর্মাক্ত মুখ গামছায় মুছে বলে, না আনলে তোমাদের রান্নাটা হইবে কিসে? খাওয়ার সোময় জল পাইবে কোনঠি? গাঙে—

ক্লান্ত দুই ছোকরা মনে মনে বিরক্ত হয়। মন্দিরের ভেতরে লাল গোলাপী কাগজের সামনে ঝুলন্ত বাল্বের আলো লালচে হয়ে ঠিকরে পড়েছে দুই ছোকরার সাদা গেঞ্জিতে। গোডাউন ঘেঁষে মোটা-মোটা নাইলন কাছি, খান-চারেক পাঁচ ফলার বড় বড় নোঙর। লোহার রিঙে আংটা। নোঙরের লম্বা লোহায় পাছা ঠেকিয়ে খানিক বসার আয়োজন। নোঙরে বসে ফুট কাটে দু-তিনজন, আমরা তো জলে চলি যাবা সকাল বেলায়। তোরা কূলে থাকবা। কূলের কাম কর—

দুই ছোকরা ঘাড় ফেরায় পেছনে, আমরা আনুম না, কইসি? তোগো বুকে এতো লাগস্যে ক্যান হুনি? কোলতলায় মাইনষের ভিড়। তাই একটু বসসি—

একজন নোঙরের লোহা থেকে উঠে দাঁড়ায়, হুঁ। ঠিক তো, অহন সারা রাত পড়ি আছে। তাগো কাম তারা করবে—

আড়তের অফিসঘরে মাচায় বসে হিসেব করে জলধর। পাশে পাতলা লেডিস চাদর গায়ে মিন্টু দাস। হাওয়া-বাতাসে চারদিক ছুটে-হেঁটে এসে মাথার চুল উসকো-খুসকো। আড়তের দোচালায় মটকা থেকে একশ পাওয়ার বাল্বটা জ্বলছে। মোটা লাল খাতায় হিসেব লিখতে গিয়ে তাকায় মাঝি বিলু দাসের দিকে। বাবুর কাছ থেকে পাওয়া সিগারেট টানে মৌজ করে। কার্তিক থেকে মাঘ মাস এগারোখানা বেঁউতি জাল, দুখানা ডিঙি, প্রতি ডিঙিতে আট আট ষোলোজনের দায়িত্ব তার। বিলু দাস ধু ধু জলময় সমুদ্রের বেগ, গতি অবস্থান বুঝে জাল-ভাসাতে বলবে। ট্রলার সারেং সাত-আটজন লেবার মাত্র তাব সঙ্গী। সহচর। কূল-কিনারাহীন নোনাজলের মাঝখানে। নির্দেশক-পরিচালক একাই বিলু দাস। চার মাসের জন্যে বত্রিশ হাজার টাকা মোট বেতন। সুতরাং জলধর গুরুত্ব দেয় বিলু দাসকে, আপনার দুই ডিঙির ষোলোজনের তরে এক গণের জন্য দুই বস্তা চাল দেই ?

—দ্যান।

—তেল ডাল শাক সবজি কিছু দেই এক গণেব মতো ?

—তারপর ? জানতে চায় বিলু দাস। বাপ হীরু দাস পুরনো মাঝি। বাপেব সঙ্গে পরের ডিঙিতে শুটকির কাঁচা মাছ মেরেছে সেই কিশোর কাল থেকে। হাওয়া বোঝে, জল বোঝে, জলের পাখনা-ঢেউ বোঝে। আকাশের তারা বুঝে, তারার জ্যোতি বুঝে ঝড়ের উপস্থিতি টের পায়। নোনাজলের মধ্যে শিরা-উপশিরার প্রবাহের মতো ভোলা, লালপাতি, রূপোবটি মাছের ভেসে যাওয়া অনুভব করে। সেইমত সেখানে হুকুম দেয় বিলু দাস, ও সারেং, ট্রলার থামাও। এহানে মা গঙ্গা কৃপা করতে পারে।

গত তিন বছর ধরে মিন্টু দাসের মাঝি বিলু। পর-পর ক-বছরই লাভ। সুতরাং মিন্টু দাসও সম্মান জানায় বিলু দাসের কথায়, কি কইস্যে গো বিলুবাবু ?

—না। আর মালপত্তর ?

—ট্রলার দুটাই থাকবে ফাড়ে। খবর দিলে এহান থিকে লইবে যা দরকার—

লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান মানুষ। পঁয়তাল্লিশ-ছচল্লিশেও যেন বাইশ-চব্বিশের ছোকরা। মন দিয়ে খাটলে একাই দশজনের বিশ হাতের কাজ করে দিতে পারে। জল চিনতে সাগর-পাখি, আকাশ বুঝতে চাতক-ডাহক। বিলু দাস বলে, বাবু—আমার লোকের জন্যে ধূমপান ঠিকমত দিবেন—

—অ্যাই জলধর ?

—কন গো মেজদা—?

—এক হাজারের বিরির বাণ্ডিলটা উকে ধরি দ্যাও তো—

পাশেই চটের থলিতে কমাসের জন্যে বিড়ির স্টক। থলিটার মুখের দড়ি খুলে হাজারখানা বিড়ির আনুমানিক প্যাকেট ধরে দেয় জলধর। থলিতে দড়ির বাঁধন দিতে দিতে বলে, উটা আপনার জিম্বায় রাখেন—

—আর—

—কি ? জানতে চায় মিন্টু দাস।

—আমাগো পাঁচ প্যাকেট ভাল সিগ্রেট দিবেন—

—বিরি দিলাম যে ! মিন্টু দাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

—ওই জলের মধ্যে লরাই করতি গেলে সিগ্রেট দু-একখান লাগে—। কথায় যেন খানিক দাবি, খানিক প্রার্থনা।

মিন্টু দাস নিজের খাবার জন্যে, পুলিশ-দারোগা বা বড় ব্যাপারি এলে আপ্যায়নের জন্য এক কার্টুন দামি সিগারেট বাক্সের মধ্যে রাখে। সেই সিগারেটে বিলুর লোভ ! রাত প্রভাত হলেই তো সমুদ্রযাত্রা, ট্রলার-ডিঙি বেব হবে। তাই মনের গোপন বিরক্তি চেপে রেখে বলে, তুমি খাবা ? না, লেবাররা খাইবে ? প্রশ্নটা রেখেই মুহূর্তে বয়ে যায় মিন্টু দাসের মনের গভীরে, মাত্র চার মাসের জন্যে ফাড়ে ডিঙির লেবাররা তো মাথাপিছু ছ-সাত হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ। ভাত-কাপড়-বিড়ি দেশলাই তো মালিকের খরচে। তার উপর বিলু দাসের এমন বায়না ? নিজের জন্যে !

মিন্টু বিরক্ত হয়ে বাক্সর চাবি খোলে। চামড়ি কাগজের মোড়কে সিগারেট। মোড়কের মুখের কাগজ সরিয়ে পাঁচখানা প্যাকেট বের করতে করতে ভাবে, আমিও কি মাঝিগিরি জানি না…! ওর উপর দায়িত্ব দিসি বলে, এত বাহাদুরি ?

ক্ষোভে-পরিস্থিতি সামলাতে একবার তাকায় বিলু দাসের দিকে। তখন মনে হয়, মৎস্য দপ্তর স্যাটেলাইট নামাইবে—রাডার দিয়া জলের তোলায় মাছের ঝাঁক বুঝবে, মাছের গতি বুঝবে—সোঁ যন্ত্রের দাম কত ? সোঁ যন্ত্র বাজারে চালু হইলে তো বিলু দাসের তেজ মরে।

নাটা গড়ন, একমাথা চুল উলটিয়ে আঁচড়ানো, গোলগাল ফোলা-ফোলা মুখে সারেং নন্দ মণ্ডল। সারেং এই রাতেও কালো সানগ্লাস পরে। চোখটায় লোহার টুকরো ছিটকে লেগেছিল, সামান্য চোট। অপারেশন করলেও এখনও একটু-একটু জল ঝরে। নন্দ মণ্ডল বলে, একশ লিটার ডিজেল দু-টিন মোবিল হাতে পাবো তবে ট্রলারের স্টেয়ারিং ধরবো। তা না হলে মাঝি ছ-ঘণ্টা জলে ছুটিয়ে বলবে, না আরও ক-ঘণ্টা বাঁয়ে চলো। গেলুম—সেখানে সমুদ্রময় জল ফল দেখে বললে, না নন্দদা—ওই ডান দিক বরাবর চলো। ওদিকে মাছের জো পাবো। গেলুম। সেইখানে দাঁড়িয়ে বাঁশ ফেলে, দড়ি ফেলে বললো, না—আর একটু পেছাও। তারপর তো মনস্থির করলে, এইখানে নোঙর গাঁথো। গোছ পোঁত। পাইপ পোঁত—কাছি লাগা—।

গোলগাল ফুলো মুখে হাসে নন্দ মণ্ডল। ক্যানিংয়ের লোক। আগে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের লঞ্চচালক। মাল লোড-আনলোড করত। গঙ্গার বুকে চড়া। খিদিরপুরে বড় জাহাজ ঢোকে না। তেমন লোড-আনলোড নেই। সুতরাং বেকার। তারপর তো মিন্টু দাসের ট্রলারে সারেংবাবু।

ম্যানেজার জলধর একটু হেসে বলে, নন্দবাবু বসেন বসেন।

চোখের কালো চশমা খুলে বসতে বসতে নন্দ মণ্ডল বলে, শুধু বসলে হবে, অত প্যাকেট প্যাকেট সিগারেটের ছড়াছড়ি—আমরা ড্রাইভার সারেং লোক। এক গাছাও পাবোনি ?

মিন্টু দাস প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা দেয়, নেও। চুপ যাও, ওরা হিসাব করুক—

সন্ধের সময় মাটির ধুনাচিতে পোড়া কাঠের আগুন ভরে ধুনোর গুঁড়ো এক-মুঠো দিয়ে গেছিল পুজারী গোপাল। ধুনাচি এখনও মন্দিরে। প্রথমে গলগলে ধোঁয়ায় মন্দিরঘব সুগন্ধ। এখন সরু সুতোর রেখায় ধোঁয়া ওঠে। মাটির হাঁড়ির খোলে সন্ধেপ্রদীপ ক্ষীণ জ্বলে। যেহেতু ফাঁকা হাওয়া-বাতাসের জায়গা, হাঁড়ির পেটে নিরুপদ্রবে জ্বলে এখনও।

রান্নাশাল থেকে বেরিয়ে মন্দিরে নজর যায় পুজারী গোপালের। প্রদীপের আগুন দেখে অনুমান করে,…তাহলে রাত আর কত ? জোর নটা কী সাড়ে নটা ? অখন কি বাবুরা খাইতে বুসবে ? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে যায়। গোডাউনের পাশে লেবার শেডে মলিন-জগন্নাথরা চট বিছিয়ে শুয়ে। ওপাশে তাস নিয়ে জমেছে জনাপাঁচেক। এধারে রেডিও বুকে নিয়ে চালার হোগলা মটকার দিকে তাকিয়ে। যে-যার বিছানা বরাবর পায়ের সোজাসুজি মটকায় ঝুলিয়ে রেখেছে পাঁচশ সাইজের সাদা পলিথিনের জালভাসি বল। গায়ে হাতল। হাতলের ফাঁকে গলানো দড়িটা বিছানার মাথার কাছে বাঁখারিতে বাঁধা। জালভাসি বলের গা চাকিয়ে খানিক কাটা। যে-যার পরিমাণমত লবণ, কাঁচা লঙ্কা দু-একটা গুঁজে রেখেছে পলিথিনের বলের খোলে।

জনাচারেক ছোকরা লেবার লুডো ঘুঁটি চালে। পরবর্তী দানের জন্যে হাঁপিয়ে ওঠে, এক ছয়—ছয়…

পাশেই মলিন ফিলিমগানের চটি বইটা নিয়ে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে পড়ে। স্বল্প অক্ষর জ্ঞানে গানের ভাষা ধরতে চায়। গানের লাইনটা 'এ রাত তোমার আমার…' জগন্নাথ কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে বলে, মলিন—

—আঁ।

—এই গানটা গাইবি আর তোর নতুন বউকে পাঁজা করে ধরবি—

—দুস্। আমি তো এই খটির বেড়া দিচ্ছি আর বউ…, কী দিয়ে যে মেলাবে বাক্যাংশ ঠিক করতে পারে না ছোকরা মলিন। মনটা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। রাত দশটার ধারাধারি। রান্নাঘরে যা হোক ফুটিয়ে খেয়েদেয়ে বাসন-কোসন গুছোচ্ছে… গোবর নিয়ে সকড়ি নেতাচ্ছে…গরুর মেজলায় আর একবার খড়-জল দিচ্ছে…, কেমন ক্রম-পরম্পরায় ভেসে আসে হোগলা চালার মধ্যে। মলিন শুয়ে শুয়ে খোলা চোখে কালো মুখ সরু নাক, পিতলের চকচকে রিং দেখতে পায়। গাঙ-নদীর দূরত্ব নয়। এক বাঁধ, কখানা বাদা মাঠ পার হলেই তো নিজের খোড়ো ঘর। পাশ চালায় রান্নাশাল। কালো মুখে সাদা দাঁতে ঝিকমিক হাসি। বুকের মধ্যে ছটফট করে। মলিন পাশ ফেরে। উপুড় হয়।

এক ছুট দিলে নিজস্ব ঘর। তবুও যে চর থেকে কত যোজন দূরে। চার মাসের শিকলে বন্ধন।

(২২)

রাত ফিকে হয়ে চরাচরে ভোর। বালির উপর ঝোপেঝাপে ঘুমন্ত মনাপাখি ডানা ঝাপটায়। সারা রাতের তন্দ্রাজড়িমা ডানা-পালক থেকে ঝরিয়ে দেয়। গা-থপথপে গোলগাল মাংসল মনাপাখি। ছোটখাটো হাঁসের মতো চেহারা। সরু ঠ্যাংয়ে গুটি গুটি ঝোপ ছাড়ে। ফাঁকা বালি পায়। সামনে নোনাজল চলকে চলকে ঢেউ মেলে। ভোরের আকাশ আর সমুদ্র মিলেমিশে বিশাল বিস্তার রচনা করে।

কালো কালো সরু ডানায় কচি পাখি মুহূর্তে বালি ফেলে আকাশে খানিক চক্কর দেয়। হঠাৎ তীরের বেগে নোনাজলে ছোঁ মেরে কুঁচো মাছ ঠোঁটে তোলে কানকাটি পাখি। সাদামনা পাখি সাদা ডানায় ভোর মেখে আরও সাদা পাপড়ি-মেলা সদ্য ফোটা পদ্মের মতো থপথপ ভাসে। ঢেউয়ের তালে দোল খায়, মনোরম দোলনা। দু-একটা মাছ খাদ্য হয়ে যায়। মস্ত বালিস্থান ভোর পাখি নোনাজলের ছন্দে শীত মেখে মহাপ্রকৃতি।

রয়ালগঞ্জের চারকপাটি লকগেটের বিশাল রিজারভার। তার পাড় ধরে হাঁটে দশ-বারোটা পরিবার। বউ-মেয়েরা সামনে। মাথায় বিছানা-কাঁথা, থালাবাসন, সংসারের খুঁটিনাটি, পেছনে পুরুষরা পঞ্চায়েতের পাওয়া ছেঁড়া তেরপলিন, পচা-খসা হোগলার বাণ্ডিল মাথায় পা ফেলে। উঁচু পাড়ের গা ধরে মাটির প্রতিরোধ। খালি পায়ে শীত, শীত হাতা কনুই কবজিতে, ঘাড় গলায়। রাতের হিমে ঢালুমাটি ভিজে, অসতর্কতায় পা পড়ে। মৃদু হড়কায়। আবার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সামলে নেয়।

মানুষগুলো জোরে জোরে পা ফেলে। পিছনে একবার তাকায়, নিজেদের দেবপ্রবাস গ্রামটা বাবলা, খেজুর, ডাব, হাবলি গাছের শাখাপ্রশাখায় ঘিরে আছে। পুকুর-ঘাট, গাই-বাছুর, হাঁস-ছাগলে নিজেদের সংসার। পরিজন-পরিগ্রহ। মানুষগুলো বালি পাড়িয়ে অনেকখানি চলে আসে। ভাঙা ডিঙিটার গায়ে বালির খোঁদল। নোনাজলে কিলবিল করে গেঙো পোকা। একঝাঁক মনা-পাখি চকচকে বালির উপর সাদা পদ্মের মতো ফুটে থাকে।

পায়ের শব্দ কাছাকাছি হয়। পাখিগুলো দ্রুত পোকা খুঁটে খায়। যখন মানুষগুলো আরও কাছাকাছি, পাখির ঝাঁক ভীষণ অনিচ্ছায় দু-চার ডানা সরে যায়। আবার গোল হয়ে বসে। বাঁকা ঠোঁটে গা খোঁচে। গায়ে গা লাগিয়ে বসে। শীতের হাওয়া আটকায়। ঝোপের বাইরে এসে শীত আটকায়।

মানুষের আনাগোনায় খাদ্য-খাবারের টুকরো বালির উপর। এত মানুষের রান্নাবান্নার ফেন, আনাজের খোসা, মলমূত্রে মাছি-মশার জন্ম হয়। কানকাটি পাখি মরা মাছি ঠোঁটে খুঁটে মহানন্দে আকাশে ওড়ে। পাক খায়। দোল খায়।

দু-একবার শূন্যে চরকিবাজি দেখায়।

দেবপ্রবাসের নারী, শিশু-কিশোরীরা ফরেস্টের গাছপালার ঝোপঝাড় পাশ কাটিয়ে সাদা বালি ভাঙতে ভাঙতে হাজির বিনয় দাস, কমলাপতি দাসের আড়ত চালার পাশে। এখানে সাদা বালি ঢিপি হয়ে উঁচু। ভয়ংকর সাঁড়সাঁড়ি ছাড়া ডোবে না। ফলে বালির ডাঁই।

বনবিহারীর কাঁধে কাপড়ের সাইডব্যাগ। দশ-এর দুই ধারামতে পাটে পাটে খসে পড়া পুরনো নোটিশ, একখানা সাদা খাতা আর ডটপেন। লুঙির উপর হাফশার্ট, গায়ে লেডিজ চাদর। মানুষগুলো নিজের পনেরো বিঘে সাদা বালির চরে পা রাখতেই বনবিহারী চেঁচায়, কারা গো?

পুরুষমানুষগুলো চেঁচায়, আমরা দেবপ্রবাস শিবশ্যামপুরের লোকজন।

—কেনি গো?

—চালা গড়বো। কলোনিতে থাকবো—হঠাৎ-কলোনি?

—এ জায়গা তো ফরেস্টের চর নয়। প্রাইভেট ল্যান্ড, বলে ইংরেজিটা বাংলায় তর্জমা করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

গায়ের কাছে ছেঁড়া গেঞ্জিপরা শিশু, পুরনো ফ্রক-শাড়ি পরে মাথায় মাথায় তিনটে মেয়ে, বড় হাঁড়ি কাঁধে ধামসিমত বউ। পুরুষমানুষটা বলে, সেও ভি জানি।

—কি জান? মালিককে চিনো?

—ঠিক চিনি নাই। তবে শুনেছি—বনবিহারীবাবু। তানকে বাপঠাকুরদারা খুব নামী লোক ছিলেন।

ভূমি……ভূসম্পত্তি ক্ষয়ে হারিয়ে নিঃস্ব বনবিহারী। তবু ঠাকুর্দার প্রতি এই নগণ্য মানুষদের সমীহ প্রদর্শন তাতিয়ে দেয়। পুরনো বৈভব-স্বাচ্ছন্দ্য অন্তত একবার দেখতে চায়! কিন্তু সে ভূমি কোথায় চলে গেছে! ভূমিকে ঘিরে সব যে নদীগত…! তবু হৃত জিনিস উদ্ধারের লোভে বলে, দেখেন তো? চিনেন কিনা?

পুরুষমানুষটা বোঝা মাথায়। দু-চোখ মেলে দেখে বনবিহারীকে। স্মৃতি-বিস্মৃতির তলভূমি হাতড়ায়। দীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে বনবিহারী। গত বছরে গোটা হঠাৎ-কলোনির দায়দায়িত্বে থেকে বরং পুরুষমানুষটাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু…! বাপঠাকুর্দাদের নামে সমীহ অথচ তাদের জীবন্ত বংশধর হয়েও অপরিচিত নিজেরই কাছাকাছি গ্রাম-মৌজার মানুষটার কাছে! ব্যর্থতা তাকে ক্রামশ বিদ্ধ করে। একদা হারানো মর্যাদা পেতে ছটফট করে বনবিহারী। বলে, আমিই তো আপনাকে চিনছি—

চমকে যায় পুরুষমানুষটা! স্মৃতিশক্তির অক্ষমতায় মুখ কালো।

—আপনি তো উমেশ খাটুয়া?

উমেশ খাটুয়া তাকিয়ে থাকে। পাশ থেকে হাঁড়ি কাঁখে খাটুয়াবউ হুমড়ি খেয়ে কাছে আসে, আগো—আমাদের মুরগি গিরিদের রান্নাঘরে ঢুকছিলি না গত বছর?

—হুঁ। বলেই চকিতে ঢেউ উলটে আছাড় মারে উমেশকে। মুরগিটা কঁক-কঁক শব্দে ডাকে এখন শ্রবণ স্তরে। একটা ঢেলার আঘাতে আওয়াজ স্তব্ধ। ঝগড়াঝাটি হঠাৎ-কলোনির দুই পড়শির। তখন তো বনবিহারী এসে বলেছিল, যার মুরগি ঢিলির ঘায়ে মরছে সেই মালিককে ত্রিশ টাকা দিবেন গো গিরিবাবু। ত্রিশ টাকা দিছিল গিরির বউ। মুরগি রান্না হইল রাতে—এক বাটি মাংসের ঝোল গিরির চালায় পাঠাইতে, লিতে চাইছিলেনি। যখন গিরির চালায় যায়ে কইছিলুম, লও গো গিরি। চার মাসের তিন মাস তো পারাইছে। আর এক মাস পরেই তো দেশে—নিজেদের গ্রামে ফিরে যাবু—। লও—।

স্মৃতি থির হলে বোধ ক্রিয়া করে উমেশ খাটুয়ার মস্তিষ্কে। বনবিহারীর হাতটা ধরে উমেশ বলে, বাবু মনে পড়িছে। ইবার আমাদের একটু জায়গা—আশ্রয় করে দিন গো—

এই একচিলতে মর্যাদায় ফাঁকা বালিচরে অতীত সামন্তপ্রবাহ জারিয়ে দেয়। সেটা রসিয়ে উপভোগ করে বনবিহারী। ছেঁড়া তেরপলিন, খসা হোগলা বাণ্ডিল পাশ কাটিয়ে বালির উপর দাঁড়ায় বনবিহারী। বলে, এ বছর থেকে এ কলোনি আমার—

—আচ্ছা বাবু।

—দশ হাত বাই দশ হাতের বেশি জায়গা হবে না একটা ফ্যামিলির—।

—বাবু, আমরা যে ছজন গো?

—ছজন হও, ছেষট্টি জন হও। এক ফ্যামিলির দশ হাত বাই দশ হাত। আর—।

—কী বাবু?

—লোকপিছু এক টাকা। শুধু দশ বছরের নীচে আট আনা—। মাসে মাসে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে।

—লিবেন, কিন্তু বাবু—সাবাড়ে আমানকে কাজ জুটিয়ে দিবেন?

—নিশ্চয়ই। আমাদের ওয়ারকারস্ সমিতিতে নাম লেখাও। একদিনের মজুরি দিয়ে রেস্টারি খাতায় নাম তুলো—

—হুঁ তুলবো।

—বাবা আপনি সহায় থাকবেন গো—

বনবিহারী হাসে। চকিতে ফল্গুপ্রবাহ চেতনায়, আজ তো একবারও মিন্টু দাস—নির্মলবাবুর আড়তে যাওয়া হয় নাই···! দু-এক পা বালি ভেঙেই আবার পিছু ফেরে বনবিহারী, উমেশবাবু?

—আজ্ঞা?

—যে আসে আসুক একই কথা বলবেন, দশ হাত বাই দশ হাত। আমি কাজ সেরে আসছি—আর মাথাপিছু এক টাকা মাসে—

দু-হাত জোড় করে সমীহ দেখায় উমেশ। পরক্ষণেই বাবুর বিশ্বাসভাজন হাত পেরেছে, এই অনুমানে নিজেকে সম্মানিত বোধ করে। বউকে বলে, খুলে ফেলা তো হোগলা বাণ্ডিল—

বাঁয়ে হোগলা-ঘেরা মন্দির। ডাইনে নতুন বেড়ায় মিন্টু দাসের ছোট সাবাড়। সামনে দেড়মণি চালের বস্তা নিয়ে মলিন। পিছনে বস্তা মাথায় জগন্নাথ।

জগন্নাথ বলে, মলিন বেশি কোমর খেলাসনি রে। পায়ে বালি ভাঙতে দম পাবোনি—

জগন্নাথের পিছনে দুই ছোকরার কাঁধে বাঁশ। বাঁশ থেকে মোটা কাছি ঝুলিয়ে চার কাঠের পাল্লা চেহারা। একশ লিটারের ডিজেল ড্রাম লাটে বাঁধা। দুই ছোকরা ড্রামের ভারে হিমসিম। চেঁচায়, হই জগন্নাথদা—আমাগো যাইতে দিবা না?

ডাইনে-বাঁয়ে নতুন গরান বাঁখারির বেড়া। পায়ের ধাসাধাসিতে নরম বালি প্রায় হাঁটু অবধি ডুবিয়ে নিতে চায়। একশ লিটার ডিজেলের ভারে বাঁশের কঠিনতায় কাঁধ জ্বালা করে। কষ্ট পায় দুই ছোকরা। বালি পাড়িয়ে চর এখনও অনেকখানি। তার কিনারে হাঁটুডুবি জল ভাঙলে তো ট্রলার। ট্রলারে ডিজেলের ড্রাম তুলে দিতে পারলেই স্বস্তি। দুই ছোকরা আবার চেঁচায়, হই মলিন—তুরা ছাইড়ে যা আমবা আগাই যাই। একটু ফাঁক পেতে ডিজেল ড্রাম এগোয়। ক্রমে ক্রমে দুই ছোকবা পাইপলাইটের 'ভি' বর্ণের গেট পার হয়।

ফাঁপা বড় বড় পাউয়ের গাঁটওলা বিশ-বাইশ হাত লম্বা লম্বা কখানা ফাং বাঁশ নাইলন দড়ির গিঁট মেরে পড়ে থাকে। ম্যানেজার জলধরের দেওয়া বিড়ি টেনে দম নেয়। বিড়ির আগুন ফুরোয় অমনি ছোকরা দুটো দু-প্রান্তে ঘাড় লাগায়। একই ছন্দে বয়ে নিয়ে যায়। ঠিক পথের সামনে বনবিহারী। সামনের ছোকরাটা বলে, এই খবরদার—

পাশে সরে দাঁড়ায় বনবিহারী। বলে, ও ভাই—মিন্টুবাবু আছে?

—আইজ ট্রলার ফাড়ে যাইবে। বাবুরে তো থাকতে অইব—

বালি ভেঙে ভেঙে হাঁটে বনবিহারী। প্লাস্টিক নিউকাটের মধ্যে বালি সেঁধিয়ে যায়। পায়ের তলা করকরে।

অফিসঘরের খানিক ছাড় দিয়ে কাঁটা-পাল্লার খুঁটি-ফ্রেম। কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় বেঁউতি জালের স্তূপ। বিশাল ডিম্বাকার মুখটায় মোটা কাছির ঘের। ঘেরমুখ থেকে বড় ফাঁসের ঘারা ভাগ তারপর বড় ফাঁস ছোট হতে হতে ঘন বুননের মেলান ভাগ। জালের শেষতম অংশে চুলের গুছির মতো ডগা বাঁধা। এগারোখানা জাল সবুজ হলুদ নাইলন সুতোর বুননে এক একটা বিশ-ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি।

তিনজন জাল বইতে দাঁড়ায়। শীত হলেও প্রায় খালি গায়ে। প্রথম জনের মাথায় দ্বিতীয় জন জাল তুলে দেয়। দ্বিতীয় জনের মাথায় তৃতীয় জন তুলে দেয়। এবার তৃতীয় জন মিন্টু দাসের দিকে তাকায়।

মিন্টু দাস বলে, কিরাা? আমি ধরসি তুই মাথায় তুল—

তৃতীয় জন মাথায় জলের স্তূপ ধরে নেয়। পর-পর তিন ছোকরার মাথায়

সবুজ জাল যেন বৃক্ষের বড়সড় ডালপালা। সবুজ নাইলন সুতোয় বেলা দশটার রোদ জমে জ্বলজ্বল করে।

একটু জোরে বলে মিন্টু দাস, হুই তুরা ওগুলান ট্রলারে রাইখ্যা বাকি জালগুলানরে বুয়ে দিবি। বিলুরে ডাক দিবা টিফিন খাইতে—। বুঝছিস্ ?

—হুঁ।

বনবিহারী নমস্কার জানায়। মিন্টু দাস প্রতিনমস্কারে মানুষটাকে গ্রহণ করে।

—আইসেন ভিতরের তন। মাথাটা সামান্য নিচু করে ঢোকে মিন্টু দাস। বনবিহারীও অনুগমন করে।

—একটা কথা ছিল। সোময় হবে ?

—আপনাগো সঙ্গে কথা, কেন হইব না ? কন—, মিন্টু দাস এত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দেয়।

পূজারী গোপাল বেরা ভেতরে ঢোকে। চারদিকের কাজকর্মের চাপ দেখে কথাটা পাড়ে, আপনাদের টিফিন দুবো বাবু ?

জলধর মুখ তোলে। মিন্টু দাসের দিকে তাকিয়ে মেজাজটা বুঝতে চায়। পরে বলে, গোছাও। লেবাররা সব আসতে দাও—

—বলছিলাম যে, আপনার সাবাড়ে কলোনির লেবার ঠিক হয়ে গেছে ? জানতে চায় বনবিহারী।

—প্রবোধবাবু—, বনবিহারীর চোখমুখে কেমন অজ্ঞতাজনিত বিস্ময়!

মিন্টু দাস সংযোজন করে, ওই লাল কলোনির প্রবোধবাবু আর জনার্দন আইসিলো। জলধরের সনে কী কইস্যে জানি না, ওরে জিগান ? জলধর শুনে বলে, আসছিলো। তেমন পাকা কথা হয় নাই তো। কেন ? আপনার লোক আছে ?

মাথাটা সামান্য সদর্থক ভঙ্গিমায় নাড়ায় বনবিহারী—সেই কোলোনি মানে হঠাৎ-কোলোনি ?

—হ্যাঁ।

—একটু দূর হয়ে যায় না ? মাছটাছ রাত্রে আসলে ডাকাডাকি করতে সোময় যাবে। কেন নিম্মলদার সাবাড় ক্ষীরদবাবুর সাবাড়ে কথা বলেন না ?

বনবিহারী এ বছর থেকে পয়সা নিয়ে কলোনি বসাচ্ছে। তাই একটু সুযোগ-সুবিধে করে দিতে পারলে হঠাৎ-কলোনির গুরুত্ব বাড়ে। খটিতে কাজের খোঁজই কলোনির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে। বনবিহারী চরে দামি মানুষ হয়ে যেতে পারবে। পঞ্চায়েতের সদস্যপদ ? সেটাও নেই। পারিবারিক ঐতিহ্যের কদর ? শত চেষ্টা করলেও ফিরবে না। তাহলে কী নিয়ে কলোনির একশ দশ-বারো ঘর লোকের কাছে দাঁড়ানো যায় ?

চুপচাপ অথচ যাতনা-কাতর বনবিহারীকে দেখে মিন্টু দাস বলে, বসেন। একটু টিফিন খায়েন। পূজারী—এই বাবুরে এক থাল দিবা—।

লেবার শেডের মধ্যে বিছানার চটটা খানিক বিছিয়ে বসে মলিন। পাশে

জগন্নাথ। ওপাশে মিন্টু দাসের নিজের কর্মী শ্রীমন্ত, ছোট ধীরু। দুই ডিঙির ষোলো জনের বিছানা বান্ডিল করে বাঁধা। ছোট ব্যাগে মাজন সাবান।

অফিসঘরে গোপাল বেরা ঝকঝকে দুখানা স্টিলের থালায় গরম ভাত সুন্দর করে সাজিয়ে এনে মাচার উপর রাখে। সরু চালের ঝরঝরে সাদা ভাত। এক থাবা করে আলুভাতে। শুকনো লংকা তেলে ভেজে গুঁড়ো করে মাখানো। পেঁয়াজ কুচি মিশিয়ে উপাদেয় খাদ্য। সঙ্গি ছোকরা আর এক থালা ধরে দেয়। সেটা জলধরের সামনে রেখে বলে, মাস্টারবাবু ভাত আলু লাগলে ডাক দিবেন।

মানুষের বসবাসে মাছি ওড়ে। অতি দ্রুত মাছির ঝাঁক জন্ম নেয়।

ধবধবে সাদা ভাত হাঁড়ি ভর্তি। হাঁড়ির ঢাকনায় থাসা আলু মাথাপিছু গোল্লা করে ভাগ। লংকা-পেঁয়াজে লোভনীয়।

যে-যার থালা গেলাস পেতে বসে আছে। পুজারী গোপাল বড় ছানতা ভর্তি ভাত থালায় থালায় দিয়ে আলুর থাসা পরক্ষণেই দেয়। হরেক কিসিমের থালা। স্টিলে জেল্লা খোলে ভাতের। সিলভারে ম্যাড়মেড়ে। কলাই ডিশে শুধুমাত্র অন্ন হয়ে অবস্থান করে।

ছানতা ভরতি ভাত বিলি হলে গোপাল হাঁড়ি সরায়। যে-যার বিছানার পিছনে হোগলার বাতায় বাঁধা দড়ি আলগা দেয়। চালার মটকা থেকে পলিথিন জারের বল সড়সড় করে নামে। এই পলিথিন ভলভাসি বলে নিজস্ব দরকারে লবণ-কাঁচালংকা পাত্রসুদ্ধ নেমে আসে। থালায় লবণ নিয়ে টিফিনের ভাত মাখে মলিন। ক্ষুধার্ত পেটে গপ্‌গপ্‌ করে পুরে দিয়ে আগুন নেভায়।

মাঝি বিলু দাস কড়ার দেয়, আমার লোক জলদি খাবা। ভাটার আগে ট্রলারে উঠবা কিন্তু—

ষোলোজন ছোকরা দ্রুত খায়। গরগরে আলু থাসার সঙ্গে ঝরঝরে সাদা ভাত লালচে হয়ে ওঠে। ঝপাঝপ থালার ভাত গরাসে গরাসে ফুরোতে থাকে। মলিন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে! ভাবে, কূলের মাটিতে ভাত পেতে ওরা নোনা-জলের সমুদ্দুরে অন্ন খুঁজতে যাবে আর কটা ঘণ্টা···কটা মিনিট পরে। মাটির উপর বাঁচতে, জল ঢুঁড়বে চার মাস···!

(২৩)

ভারি চেহারায় কমলাপতি দাস। মাথার চুল এলো খোঁপায় বেঁধে বাগে আনে। পাশে পাশে নাতনি মণি। পাতলা বাঁখারি কেটে হাতে ধরার মতো পাটোয়া। সাদা বালির উপর শুকোয় ছোট-বড় লালপাতি নিহেড়ে মাছ। বড় ভোলা নিহেড়ে রুপোবটি রোদ খেয়ে শুকনো হয় সরু সরু গরান বাতায়।

মনাপাখি, কানকাটি, বক চক্রাকারে ঘোরে কমলাপতির সামান্য দীন সাবাড়ের পরিসীমায়। নাতনি-ঠাকুমায় বালির উপর পাতা নিহেড়ে লালপাতি বাঁখারির পাটোয়া খুঁচিয়ে উলটে-পালটে দেয়। যাতে এক পিঠ রোদ খেয়েছে

অপর পিঠ রোদ পায়। শুকনো মাছের লোভে দু-একখানা বক ছোঁ মারে। নাতনি হাতের পাটোয়া বাগিয়ে তেড়ে যায়, এই যা-যাহ্।

হেঁটমুণ্ডু। ভারী কোমর-পিঠ নুয়ে বালিমুখো। গোলমুখ নারী। খোপার চুলে রোদ। রুখুশুকু কেশবন্ধন। দু-চারখানা চুল নতুন তারের মতো ঝলসে ওঠে।

বাচ্চা মেয়ে মণি বলে, ঠাক্‌মা—

—কি র‍্যো ?

—ছপুনদা আর বাপ আজ অনেক মাছ আনবে, না ?

—ভগবান দিলে।

শিশু মণি ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে পাশেই সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। চোখের দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা, ছপুনদা আর বাপ ডালিম দাঁড়-টানা একটা ছোট ডিঙি বেয়ে কিনার ছাড়িয়ে অল্প গভীর জলে গোলমুখ বেঁউতি জাল পেতেছে। ছোট জাল…কিনার কূলে পাতা। সামান্য এক-দু-ঝোড়া মাছ। রাঙি চিংড়ি ভোলা নিহেড়ে। চার বছরের মেয়েটা নোনাজলের দিকে তাকিয়ে কালো ডিঙিটা খোঁজে। সবসময় গায়ে-পিঠে নিয়ে বেড়ায় সেই ছপুনদাকে দেখতে চায় এই বালিচর থেকে। ঠাকুমার পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে মণি, ঠাক্‌মা—

—কেন রে ?

—ছপুনদা বাবা কখন ফিরবে গো ?

ফেরার কথায় বুকের ভেতর ছাতরে যায়। নোনাজলের ধু-ধু অসীমতা… তার মধ্যে নিজের সন্তান মাত্র একখানা ডিঙি আর তিনখানা জাল নিয়ে কিনারা ঘেঁষে থাকলেও কত দূরে যে…! সঙ্গে তো মাত্র চোদ্দো বছরের পালিত ছেলে স্বপন। মা-বাপহারা বাংলাদেশি কিশোর! কূলের বালিতে দাঁড়িয়ে মায়ের আকুলতায় সন্তানদের ফেরা চাইতে গিয়ে থমকে যায়! চড়া সুদে দশ হাজার টাকার ঋণ। বুড়োবুড়ির তটের বন্ধকী কারবারির কাছে! তাই বুকের ব্যথা চাপা দিয়ে প্রার্থনা জানায়, মা—মা গঙ্গা গো দু-চার ঝোড়া মাছ লইয়া যে ফিরে গো মা—।

গোলগাল নারীমুখ। রুখু চুলে আলগা খোঁপা। গায়ের কাপড় তেমন কাচাকুচি নয়। নোনাজলের কষ পড়ে ছোপ-ছোপ দাগ। নাতনিটা ঠাকুমার কাপড় ধরে গা জড়িয়ে থাকে। বাপ জলের উপর অস্পষ্ট, কাছেই তো ঠাকুমা। কচি বুকে বড্ড ফাঁকা। মা যে সেই দ্বীপে… বুড়োবুড়ির তটে! আশ্রয়ের জন্যে যে একমাত্র ঠাকুমা…! বোঁটকা গন্ধ নাকে নেই। মায়া আর প্রশ্রয় মণিকে আঠার মতো জড়িয়ে রাখে।

হঠাৎ একখানা ট্রলার গাঙের জল কেটে লুধিয়ানা জঙ্গল পাশে রেখে সমুদ্রের দিকে। উঁচু আহ্নিক কাঠ থেকে কালো বর্ডার ক্রমশ নিচু রান্নাঘর-বাথরুম-পায়খানা ঘরের তলা অব্দি। ট্রলারটা দেখতে দেখতে মণি বলে, ঠাকুমা—

—কি ?

—আমাদের একটা ট্রলার থাকলে অনেক মাছ জালে পড়তো, না ?

ঠাকুমা আফসোসে আর মমতায় নাতনিটাকে কোলে তুলে চুমু খায়, আমানে অতো টাকা কই রে ? তোর দাদুও নাই—তোর বাপ ছেলেমানুষ। একলা। নাতনি মণি বিস্ময়ে বলে, অনেক…অনেক টাকা চাই ?

বেলা কমে আসে। হাওয়ায় শীতের ধার বেশি। একটা ছোট হাতডিঙি কিনারায় থামে। বালিতে নোঙর গেঁথে লোকটা ছুটে আসে। একলা মানুষ হাল খাপচিয়ে খাপচিয়ে কূলে ফিরেছে। বিনয় দাসের আড়তের কাছাকাছি এসে চেঁচায়, ও বিনয়মামু—বিনয়মামু—

ঝুপ করে আঁধার নামে। বুড়ো বিনয় হ্যারিকেন-লম্ফো জ্বালায়। চরের এদিকটায় হঠাৎ-কলোনি! কোনও বড় আড়তদার নেই ফলে জেনারেটারের আলো নেই। লম্ফো হাতে বউ ছবি থমকে যায়। কানে ডাকটা শুনে রোগা চেহারায় সরু স্বরে বলে, কেউ ডাক দিসে— ?

—বিনয়মামু—উ, বলে লোকটা কঞ্চি-বাঁখারি ঘেরা সাবাড়ে ঢোকে। নড়বড়ে মাচা। টিনখানেক কেরোসিন তেল। বস্তাদুয়েক চাল। ছেঁড়া জাল, সুতো। ডেইসা কাঠি ঝুলছে জাল সারাই করার জন্যে।

বৃত্তান্ত শুনে হাউমাউ কাঁদে বিনয় দাস—সবে সিজিন লাগস্যে। আমার বেবস্যা চালামু ক্যামনে? ভাবনায় বিপদটা যখন প্রতীয়মান, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। অসহায়তার ব্যথা। এই বিশাল গাঙ সমুদ্র…এত বড় চরে লক্ষ লক্ষ টাকার সঙ্গে সামান্য দীনদুঃখী দুই স্বামী-স্ত্রী যুঝবে যে কেমন করে! গ্রাম পাড়া থানা প্রশাসন থেকে কত দূরে! দুই স্বামী-স্ত্রীর জীবিকায় মহা অসহায়তা সেটা বুঝবে…জানবে কে ?

বুড়ো বিনয় দাস কাঁদে। রোগা বউ ছবি বুড়িও কাঁদে। কান্নার শব্দ কমলাপতির কানে যায়। থালাবাসন গোছাতে গোছাতে কান করে। বুকের মধ্যে পলিচাপা আতঙ্ক। কেউ…, দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে মনে লাগে!…সবে সিজিন শুরু সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা নাকি? বেরিয়ে আসে সাবাড়ের চালা থেকে। এগিয়ে যায় বিনয় বুড়োর চালার দিকে। লম্ফের আলোয় দুই স্বামী-স্ত্রীর ক্রন্দনরত মুখ। সারা দেহে সঞ্চিত নোনাপানির ধারা দু-চোখ বেয়ে।

সম্পর্কে ভাগনে বসে বিড়িটা টানে। কালো চেহারায় ফুটে ছেঁড়া গেঞ্জিটা অবশিষ্ট আভাসমাত্র।

কমলা বিনয়ের বউয়ের কাছে গিয়ে বলে, কী হইস্যে গো বউদি ? সমজাতীয় নয় প্রায় সমসামর্থ্যের সহব্যবসায়ী ব্যথিত হয়ে জানতে চায়। তখন বুড়ো বিনয় রুগ্ন চেহারায় ভাঙা গাল, দন্তহীন মাড়িতে এত বৃদ্ধ বয়েসেও শিশুর মতো অসহায় কাঁদে। আকুল হয়ে সমাধান খোঁজে মানুষটা। রুগ্ন বিনয় কাঁদতে কাঁদতে দেখে যে সমবেদনা জানাতে এসেছে, সেও তো অসহায়! বেওয়া!

সুতরাং বিনয় কাঁদে। দরিদ্র ছোট ব্যবসায়ীর আর্তিতে কাঁদে! বিশাল

পৃথিবী ব্যবস্থায় একলা সংসারের কান্না কাঁদে।

হঠাৎ-কলোনির দু-পাঁচ ঘর মানুষ হ্যারিকেন, ছোট টুনটুনি বাতি হাতে হাজির বিনয়ের সাবাড়ে। মধ্যবয়সী উমেশ খাটুয়া বলে, কি হইছে গো বুড়াবাবু ?

—আমার দাদন খাওয়া লোককে তুইল্যা লইস্যো…,

—কেনি ? লিবে কেনি ?

বুড়ো বিনয় উমেশ খাটুয়ার তাগদে নির্ভর করতে পারে না। আবার কাঁদে মানুষটা।

এক দিস্তা সাদা কাগজের খাতায় ক্রমিক নম্বর দিয়ে হঠাৎ-কলোনির বাসিন্দাদের নাম। বনবিহারী ব্যাগ থেকে খাতা বের করে। টর্চটা জেবলে পৃষ্ঠা ওলটায়।

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	লোক সংখ্যা	অপ্রাপ্তবয়স্ক	দেয় ট্যাক্স			
				কার্তিক	অঘ্রাণ	পৌষ	মাঘ
(১)	উমেশ খাটুয়া সাং দেবপ্রবাস	৬	১	৫.৫০			
(২)	বিপিন সামন্ত সাং শিবপুর	৭	২	৬.০০			
(৩)							
(৪)							

টর্চের আলোয় নামটা দেখে, উমেশের চালার সামনে দাঁড়ায় বনবিহারী। বউটা ঘোমটা টেনে বলে, বাউয়ু—তিনি তো অউখানে গিছে গো—

—কোনখানে ?

—বিনয়বাবু—ওই বুড়া খটিদারের দোরকে।

—কেন ?

—বুড়া কাঁদতিছে। কি জানি কী বিপদ লাগছ্যে মানুষের…

—উমেশ একলা ?

—না গো বাবু। কলোনির আরও লোক গিছে।

বনবিহারী তাড়াতাড়ি খাতাটা মুড়ে হাতে নেয়। টর্চটা জেবলে কলোনি-বাসীদের রান্নাচালা, মুরগিঘরে বাচ্চা মুরগির কিচমিচ ডাক কাটিয়ে, চারখানা বাতার উপর হাবিজাবি ডালপালা খড়-বিছানো মাচা পাশে রেখে বিনয় দাসের

সাবাড়। চারদিকে অপরিচ্ছন্নতা, দারিদ্র্য প্রকট। উত্তেজনায় অতিরিক্ত বাতি উসকে কাচের গায়ে ভুষো কালিতে ঝাপসা।

বনবিহারী হুটপাট পা ফেললেও বালি আঁকড়ে আঁকড়ে ধরে। পায়ের গতি কমে যায়। বনবিহারী এগোয়। ক্রন্দনরত বিনয় দাসকে দেখে ভাবে, লোকটা এত কাঁদে কেন?

কাছে যায় বনবিহারী। উমেশ এগিয়ে আসে।—বাবু আসছেন। দেখছেন মানুষটার বিপদ।

—কী হয়েছে গো বিনয়বাবু আপনার?

বুড়ো বিনয় দাস বুকে বল পায়। ভাঙা গাল মুখে বহুকণ্ঠে উচ্চারণ করে, হুই যে দামোদর—দামোদরবাবু আড়তদার আছে? ডিঙি থেকে আমার লোককে তুলে লিসে—

—তারপর?

—আমি অ্যাহন কাজের লোক পামু কোথায়? আঠারশো টাকা দাদন দিসি লোকটারে। আমি বুড়া—এত ধারদেনা করি আড়ত খুলসি। এ সিজিন লছ খাইবো—, বলতে বলতে কাঁদে।

বনবিহারী সকলের মুখের দিকে তাকায়। নিজে কোনও আড়তদার নয়। এমনকি পঞ্চায়েতের ক্ষমতাশালী সদস্যও নয়। কোনও কিছু দিয়ে এতগুলো মানুষের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও নয়। তাই একটু ভেবেচিন্তে বলে, বিনয়বাবু—আর কাঁদেন না। এক্ষুণি সমিতির কাছে যান—

—কোন সমিতি?

—কেন? শুকনা মৎস্যের ব্যবসায়ী সমিতি?

বুড়ো বিনয় জানতে চায়, ব্যবসায়ী সমিতির তন গিয়া?

যেহেতু বুড়ো বিনয়ের চেতনায় জাগিয়ে দিতে পেরেছে, বনবিহারী বিনয়ের কাছে উবু হয়ে বসে। বলে সমিতির সেক্রেটারি মিন্টু দাসের কাছে যান—

উমেশ খাটুয়া, বিপিন সামন্ত একসঙ্গে বলে ওঠে, ঠিক বলছেন বাবু। ঠিক—

—বুড়ি ছবি দাস থম মেরে দেখে বনবিহারীকে। 'সেক্রেটারি' কথাটা জিভে আনতে পারে না। এই কথার সঙ্গে যে মানুষের আদল—সেটাও বা কী জিনিস তা তার গরিব মৎস্যজীবীর গেরস্ত বউ অভিজ্ঞতায় ধরতে পারে না। আতঙ্কিত হয়ে ভাবে, ফরেস্টারের বড় অফিসার? বন জলই যে তার!

বিনয় বৃদ্ধ শরীরে উঠে দাঁড়ায়। বনবিহারীর হাতটা ধরে বলে, বাবু যাইবেন গো আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—উই মিন্টুবাবুর তন।

—যেতে লাগবে না আমাকে। আপনারা মৎস্যজীবী হলেই শুনবে—

হ্যারিকেনটা নিয়ে এগোয় বউ ছবি। পেছনে পেছনে বিনয় দাস আর ভাগনে যোগিন দাস। বালির চরে পায়ে-পায়ে মানুষের হাঁটাপথ। ক্রমশ শক্ত হয়ে এখন

একটা রেখা।

খানিক গিয়ে খেয়াল হয়, গোটা সাবাড় আড়তঘর ফাঁকা। বউ ছবি ভাগনে যোগিনকে বলে, তুমি আড়তে থাইকো। আমরা কথা কই—

যোগিন ফিরে আসতে উমেশ-বিপিনদের নৈতিক পীড়ন কমে। উমেশ বলে, হাঁ। আড়ত মনো। এইখানে মাছ শুকাইছে অউ ঘরে চালডাল। নিজের লোকেরে তো দরকার—

বনবিহারী জোরে ডাক দেয়, কই চালায় যাবেন না আপনারা ?

—যাইবো।

—আমার ট্যাক্সের টাকা দিন। অঘ্রানের তো অর্ধেক—?

—কাল দিনভর আমার ঘরের কেউ কাজ পাইছিনি গো বাবু। কাল পরশু গণ ভাল। মাছ আসবে সাবাড়ে, কাজ হইবে বলে মনে হয়। কালই টাকা লিবেন ? উমেশ বোঝায় বনবিহারীকে।

—বিপিনবাবু ?

বিপিন গদগদ স্বরে বলে, বাবু অখনও তো দুমাস। পালাবু কাই ? কাজের চাপ হইলেই লিবেন। না দিয়ে যাবু কোনঠি ?

বনবিহারীর মেজাজ গরম হয়। আবার নিজেকে জুড়োয়—, কিন্তু একেবারে যে দিতে কষ্ট হবে ?

—বাবু। গত মাসে তো দিছি ? বিপিন শুধোয়।

খাতায় টর্চ ফেলে বনবিহারী। নামের পাশে ছককাটা ঘরে মাস কার্তিক, অঘ্রান লেখা। দেখে নিশ্চিত হয়ে বলে, হ্যাঁ। কার্তিক শোধ আছে—

—তবে বাবু। আমরা পাশগ্রামের লোক। পালাইতে পারি ? এইখান থেকে পালাইলে দশ মাইলের হাটেই দেখা পাইবেন। পাইবেননি ?

বিপিনের কথায় যুক্তি থাকলেও মন মানে না। খাতা-টর্চ নিয়ে চলে যায় পাশের চালায়। বউটা বালির উপর বসে মেটে হাঁড়ির উনুনে রাঁধে। পাশে চট বিছিয়ে বসে ভগ্নিপতি। বোনটা আনাজ ধরে দেয়। বাচ্চারা ছেঁড়া জালের নাইলন সুতো নিয়ে খেলে। বনবিহারী হাঁক দেয়, তোমাদের পুরুষ-মানুষ কোথায় গো ?

বউটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। সম্ভ্রমে বলে, বাবু ? তিনি তো দোকানের দিকে গেছে। কুটুম্ব আসছে দুটা ডিম কিনবে—

বনবিহারী প্রমাদ গোনে। চাপা গলায় বলে, আমার কথা বলে রাখবে গো।

পাশের চালায় লম্ফো। হোগলার বেড়া ফেঁসে বাইরে আলো ছিটকোয়। ছোট করে মাচা। প্রায় কাঁধসমান উঁচু। দু-চারখানা ভোলা নিহেড়ে শুটকি হচ্ছে। বউটা সুতো ধরে বসে, বরটা বিড়ি পাকিয়ে এগিয়ে দেয়। রেডিওটা জোরে বাজে।

বনবিহারী হাঁক দেয়, ঘরে কে আছো গো ?

পুরুষটা বাইরে আসে। ফাঁকা ফোঁপরা চালায় পারিবারিক আব্রু।

—কে গো ? একটু নজর করে বলে, ও আপনি, বাবু ?

—তোমার তো দু-মাসের ট্যাক্স বাকি।

মুখটা নিচু হয়ে যায়। ঘরের ভিতরে ঢোকে। একটা জর্দার কৌটোয় খুচরো পয়সার শব্দ। গুনে গুনে দুটো টাকা ধরে এনে বলে, নিন। গত মাসেরটা।

—দুস্। আর এক টাকা ?

—ওইটুকা মেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বউটা বেরিয়ে আসে, বাবু আমি ওর মা। পেটে ধরসি। গায়ে গতরে বড় দেখায়—ওর অখনও দশ বছর হইছেনি গো ?

—ধুর বাবু। আর একটা টাকা দাও। তোমাকে ছাড় দিলে কলোনির সকলে বলবে, এর বয়েস দশ বছরের নীচে আট আনা লও। ওর বয়স আরও কম—কত ঝামেলা লাগবে—। দাও একটা টাকা।

বউটা গোমড়া মুখে দাঁড়ায়। ভাবে, ইস্কুলের মাস্টারের লিখন আনবো, নাকি পঞ্চায়েতের ছাপা লিখন ?

পুরুষটা বলে, তবে দু-টাকা জমা করুন। পরের খেপে সব শোধ লিবেন—

তিন-চার বছরের বাচ্চাকাচ্চা, পাশের চালার লোকজন, ওপাশের বাসিন্দারা ঘিরে ধরে বনবিহারীকে। নারী-পুরুষ, পুত্র-সন্তান গোল হয়ে দাঁড়ায়। বনবিহারী দ্বীপের মতো জেগে থাকে। আবেদন রাখে মানুষগুলো, বাবু—দশ বছরের নীচে টোকাটুকিদের ছাড় দিন। চরে আসছি—ওরা তো রোজগার করতে পারে নাই। ওগুলারে রাখি আসবু কোনঠি ? দুধের বাচ্চা সব…

বনবিহারী নারী-পুরুষগুলোর আবেদন শোনে। নিতান্ত শিশুগুলো অবোধ চোখে তাকিয়ে থাকে। বাচ্চাদের নিয়ে কোল পালটায় মায়েরা। শব্দ হয় শাঁখা-চুড়ির। কথা বলে পুরুষেরা। কথার টুকরো, ভাষার উচ্চারণ মালার মতো বেড় দেয় বনবিহারীকে। এতগুলো মানুষের নিঃশ্বাস, নিবেদন তাকে গরম করে তোলে। রক্তে উষ্ণতা বেড়ে যায়। দ্রুত বহতায় জেগে ওঠে ঠাকুর্দার সেই বৈভব…ভূস্বামিত্ব। একসঙ্গে কতশ বিঘা জমির মালিকানা। কত চাষী মজুর লোকজন! হঠাৎ বনবিহারী মুখ খোলে, তোমরা পাঁচজনে কথা রাখবে ?

সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, হাঁ বাবু হাঁ—

চিৎকার নয়। জল-কলরোল। যে জলের মধ্যে একদা এই ভূমিসম্পদ ডুবেছিল! সমুদ্র উগরে দিয়েছে বলেই তো, এটা প্রাপ্তি! মানুষ খেটেখুটে আট আনা একটাকা উগরে দিলেই তবে নিজের কিছু রোজগার! সেটুকু ভেবে সমঝোতা করতে ঝটপট বলে, ঠিক আছে ছাড় দিলুম। কিন্তু বাকি পাওনা আজ শোধ করো।

জল-কলরোলে হঠাৎ ঢেউ ওঠে। মানুষগুলো বলে, শুধু আজ নয় বাবু। কালকের দিনটাও টাইম দিন—।

(২৪)

মাঝ রাতের কুয়াশা শেষরাতে আরও ঘন। ভোরকে ফুটতে দেয় না। ঘন কুয়াশা লুথিয়ানা জঙ্গলের গাছপালা ঢেকে গাঙ সমুদ্রের উপর ঝুলছে। বিস্তীর্ণ বালিচরের ঠেকনোয় কুয়াশা স্তরটা আশ্রয় পেয়ে থিতু। ফলত বালিচর সংলগ্ন চারকপাটি লকগেট, রিজারভার, একটু তফাতে দেবপ্রবাস গ্রাম, রয়ালগঞ্জ নিজস্ব সীমানা হারিয়ে সমর্পিত। চরের উপর মেছো আড়তের হোগলা ছাউনি, দু-একটা বাতি, সবই কুয়াশায় আবদ্ধ। একটু তফাতে সব কিছুই কুয়াশায় ঢাকা।

একেবারে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ডাইনে তাকায়। দু-ধারে পঞ্চায়েতের গাছ-পালার সবুজ ঘনত্বে দাঁড়িয়ে বিপন্ন কুসুমী। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে স্বামী এখনও ঘুমিয়ে। সঙ্গী হারাবার আশঙ্কায় ভোর ভোর উঠেও সঙ্গীহীন! দু-চার পা এগোয়। পিছনের চালা উঠোন কুয়াশা গ্রাস করে। দৃষ্টির আন্দাজ থাকলেও, নজর পৌঁছয় না। তখন বাস্তু বসতহীন একলা। নিজের গ্রাম, ভৌগোলিকতায় দিন ফোটে। মনে জোর পায় না। সংসারের জন্যে কিছু করতে গিয়েও সংসার আওতার বাইরে।

কুয়াশায় ডালপালা ভিজে। অবরোধে সূর্য জখম। পাখপাখালির ডানা ভারি। এক ঝাঁক কিচিরমিচির আওয়াজ। আওয়াজ গুচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রকৃতি হতে পারে না। কুয়াশার সামিয়ানায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে শুকনো খোঁচা পালায় বৃত্তাকার বাসায়।

কচি গলায় টুকরো বাক্য, লবন্চুস—

—দুবো। চুপমারি বুসে থাকবো? মা শুধোয় সাত বচ্ছরের বাচ্চাটাকে।

—হুঁ। লাল দিবে?

—দুবো।

—একটা, বাচ্চাটার আবেদন।

—আচ্ছা, বলে এ ঝুলুক হাঁটে কলাপাতা রঙের শাড়ি।

—না। খুব লাল। অনেক—

—কইছি তো দুবো। দোকানে যাই?

—দুটা।

আরও দুপা এগিয়ে আসে বউটা। কুয়াশার ঘনত্বে প্রাচীর। শুধু শোনা যায়। দেখতে পায় না।

কুসুমীর কানে গলার স্বর পৌঁছয়। স্বরকে ঘিরে চেনা দেহটা তৈরি হয় চোখের মণিতে। ঢকিতে কুয়াশা চাইয়ে কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি ফুঁড়ে ওঠে।

—কচির মা?

—হুঁ গো দিদি।

—আজ দেরি করছু, মনে হইছে ? কুসুমী ধন্দ কাটাতে জিজ্ঞেস করে।

—হুঁ, বলে কোলের ছেলেটাকে দেখায়, বারাইবো, তখন বায়না, চরে যাবু গো, চরে যাবু।

কুসুমী হাসে। হাসিতে একটা চাপা মর্যাদা পোষণ করে—আমার দুটা তানকে বাপের কাছে শু-করি রাখছি।

কলাপাতা রঙের শাড়ি বলে, তোমার দুটা তো কইলে, বুঝে। আমার এউটা একেবারে বুনো। অবুঝ—

দুই রমণী হাঁটে। পাশাপাশি পা ফেলে আর ভিটভিট কথা বলে। পথের পাশে ঘর বাড়ি। আবাদি গ্রাম। চাষবাস, সন্নিকটে গাঙ সমুদ্র। ঘরের দাওয়ায় বসে বুড়োটা শুকনো খেজুর পাতা পুড়িয়ে কলকের আগুন তৈরি করে। দেওয়াল ঠেকনোয় হুঁকো দাঁড় করানো। সকালের কাশিতে জানান দেয়, বুড়ো বিছানা ছেড়ে উঠেছে। এবাবে উঠোন দাওয়ায় ঝাঁটা ন্যাতা দিক বউ-বউড়িরা। কষ্টের সংসারে দেহের কষ্ট ঝাড়ি ফেলাও। এত ঘুমাউ কেনি ?

কুসুমী বলে, ও বউ ?

কলাপাতা রঙের শাড়ি বলে, কও গো দিদি ?

—বুড়ার যে হুকার আগুন গড়া হইছে ?

—হুঁ। অন্যদিন ঘুম থিকে উঠে সবে হাই তুলে। আজ হুকার আগুন তৈরি। সত্যি বেলা হইছে গো ?

কুসুমী উৎকণ্ঠায় বলে, আড়তে লিবে ?

—চলু না। বড় বড় পা ফেলাও।

জঙ্গলের গরান ঝাউয়ের বাটাম কাঁচি দিয়ে তৈরি কাঠামো। তার উপর বোট বোঝাই টালি এনে ঘর ছাওয়া। কুয়াশায় লালচে টালি ভিজে। নিকোনো ধারি দাওয়া। জানালা থেকে ভেসে আসে রেডিওর গান।

বাচ্চারা চাদর গায়ে পাশাপাশি বসে। কথা বলে। যাত্রার ছেঁড়া পোস্টার মেলে নায়িকার ছবি দেখে। বর্ণপরিচয়ের অ আ মেলায়। আর হাসে। হাসিতে শীতের ধোঁয়া। গাল হাঁ-করে ধোঁয়া বের করে নতুন খেলা পায়। যাত্রার পোস্টার দাওয়ায় বিছিয়ে থাকে। "সিঁথি আমার সিঁদুর তোমার" যাত্রাপালার নথ আঁটা নায়িকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শিশুগুলোর দিকে।

ইউ শেপড্ ড্রেনের তলপ্রান্তে চওড়া মেটে রাস্তা। রাঙচিত্রের বেড়া ঘেরা বাস্তু রাস্তা ঘেঁষে। একখানা বাবলা গাছ রাস্তা ছুঁয়ে। বাবলা তলায় পাঁচ ছ'জন চোদ্দ পনের বছরের মেয়ে। শাড়ি ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে। মাথায় লাল ফিতে বেঁধে চুলের গুছি। হাতে কাঁচের চুড়ি। কানে ঝুটো ট্যাপ। ছটফট করে তারা।

কানে সোনালী দুল, গলায় ঝুটো হার, কপালে হলুদ টিপ, পরনে হলুদ ফ্রক। কোঁকড়ানো চুলে ফরসাটে চোখ মুখে বিভা কামিল্যা। বিভা দু-এক পা এদিক ওদিক হেঁটে আবার ফিরে আসে গাছতলায়।—হাই তোরা যাবো আমার সঙ্গে ? আমি পথ চিনি—

মেয়েগুলোর দু-তিন জন মা তখনও দাঁড়িয়ে। বিভার মা ধমক দেয়, তুই

থামবো ? বড্ড ছ্যামরি হইছু না ?

—বেলা উঠেনি ?

—হুঁ উঠছে, বলে বিভার মা। স্বল্প গাছপালা, খানিক ফাঁকা মেটে রাস্তাটায়। ঘন কুয়াশার মধ্যে মানুষের আদল। দু-এক টুকরো কথাবার্তা। একটু কান খাড়া করে বলে, থাম্ তারা আসতিছে—

মেয়েগুলো এক সঙ্গে বলে, কেনি ? আমরা যাইলে কী হইছে ?

তিন মায়ে একটু হেসে গম্ভীর হয়, বুঝোনি তো ?

কুসুমী সামনে, পিছনে কলাপাতা রঙের শাড়ি। কাছাকাছি এলে বিভার মা বলে, হ্যাঁরে বউরা ? তোদের হাতে মেয়েগুলাকে ছাড়ি দিই। তোরা আসছোনি কেনি ? বরগুলা ছাড়ে নাই ? তানকে কাজে যাইতে কইবি, তোনকে ঘরে থাক।

মায়েদের কথায় চোদ্দ পনের বছরের মেয়েগুলো খিল খিল হাসে। হাসিতে বাবলা গাছে জমা কুয়াশায় দু-এক ফোঁটা ঝরে পড়ে। সঙ্গে বাসি হলুদ ফুল ভারি হয়ে খসে যায়।

কুসুমী বলে, ও মাসি—তোমার মেয়ে তো বড় হইছে গো ?

—দুস্। থাম মা। গায়ে ডাগর হইলে কি বড় ?

কুসুমী আর কলাপাতা রঙের শাড়ি আগে আগে হেঁটে যায়। একটু তফাতে হাঁটে এক মাথায় ছ'জন। কল কল কথা বলে সদ্য কিশোরি গলায় চেক ছক্কা সুতির চাদর, শালের রঙে পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে হাঁটে। বিভার পায়ে হাওয়াই চটির ফট্ ফট্ শব্দ গড়ায় মাটি বেয়ে। গায়ের রঙে কালো আরতি। দু-কানে মা, মাসিদের মতো মটর দানা দোলানো বড় বড় দু-খানা সোনালি ঝুটো দুল, দু-কব্জিতে হাটের মনোহারি দোকানে কেনা সোনালি বাউটি ! ম্যাড়মেড়ে সকালে হঠাৎ ঝিলিক দেয় কানজোড়া। দু-হাতে চাদর মাথায় দিয়ে গায়ে জড়ায়। কিশোরি দেহে যৌবনের উদ্ভাস চাদর জাগিয়ে।

বিভা ফুট কাটে, আরতি তোর বউ হইবার সাধ জাগছে ?

আরতি মুখ ফেরায়, সাধ জাগছে আমানকে না তোনকে ? কত সাজ দিছু তুই—। কাকে ভুলাইবি আমি জানি—

আট দশ বচ্ছরের ছেলে মেয়েদের হাত ধরে তিন চার জন বউ দাঁড়িয়ে। শাশুড়ির কাছে তিন বছরের বাচ্চা মেয়েকে রেখে বিধবা বউটা চুমু খায়। শাশুড়ির কোলে মেয়েটা। মেয়েটার বুকে মোটা সুতির ফুল হাতা গেঞ্জি টেনে টুনে শীতের প্রকোপ আটকে দেয়।

শাশুড়ি বলে, ও বউমা—মোটে সন্ধ্যা করবুনি গো। বাচ্চা জোরো ধরে কাঁদে। আমার শুকনা বুকে ও ভুলে ?

বাচ্চা খুকিটার মা উঠোনে থমকে দাঁড়ায়, তা হইলে যাবোনি গো মা—?

—যাইতে মানা করছি নাই। যাইলে তবু দুটা লগদ পুইস্যা, বাচ্চার মিছরি বিস্কুট তো ? কইছিলি যে বেলা থাকতি আইসতে গো মা ?

বিভা কুসুমীরা চেঁচায়, কাই গো ? যাবে নি যখন, আমরা আগাই ?

বাচ্চা খুকিটার মা মেয়েগুলোর দিকে তাকায় একবার। পরক্ষণে দু-পা পিছিয়ে শাশুড়িকে স্মরণ করে দেয়, ও মা কৌটায় মুড়ি আর গুঁড়ো দুধ আছে গো—।

বাচ্চা খুকিটা ঠাকুমার কোল থেকে দমকা মেরে দু-হাতে তুলে মায়ের কোল চায়। তখন সঙ্গীরা উঠোন ফেলে পাশ বাড়ি ডিঙিয়ে অনেক দূর! বাচ্চাটার দু-হাতের আকুলতায় মায়ের বুক মুচড়ে চোখে জল। থির থাকতে না পেরে চকিতে চেঁচায় বিধবা বউটা,…হাই গো, কাঁচা খেকো মা—মনসা গো পুরুষ মানুষটাকে খাউছু। এইবেলা আমাকেও খায়ে শেষ করাও। কি করি যে কচিটার মুখে আহার যোগাই…।

আচমকা চিৎকারে সঙ্গীরা ঘাড় ফেরায়। বউ দুটো পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিভা এক ছুটে কাছে আসে, ও বউদি কি গা?

অবোধ কচি শিশুটার দু-হাত কেঁপে নেমে যায়। বুড়িটার কোটরগত চোখে অঘ্রাণের শীতে উষ্ণ নোনাজল। বুকে বড় বাজে, পুরুষটা তো আমারই পেটের পুত ছিলিরে বউড়ি…!

নোনাজলের দেশ। ঝোপ জঙ্গল নোনা গাঙ বাদায় প্রান্তভূমি। ভূমিজ সন্তানের জন্যে বুঝি কাঁদে। পেটের সন্তানের জন্যে বিধবা বউটা কাঁদে। কাঁদে পুরুষটার জন্যে এক সমবয়সী নারী।

সঙ্গী বউ মেয়েরা উঠোন ঘিরে দাঁড়ায়। কুসুমী বলে, ও বউদি—বুড়ি পিসি কিছু মুখ কবিছে?

বিধবা বউটা মাথা নাড়িয়ে বলে, না।

বিভা বলে, কচিটার অসুখ বিসুখ?

—না, বলে ঠাকুর গড় জানায় দু-কান নাক মলে বাচ্চা খুকিটার মা।

—তবে চলু তো আমানকে সঙ্গে? বলে বিধবা বউটার হাত ধরে টানে।

ডাইনে টালি ছাউনি ঘর। বড় উঠোনের এক কোণে খড়ের গাদি। ইউ শেপড্ ড্রেন ঘিরে খানিকটা ফিশারি। দু-তিন খানা পুকুর খাপে খাপে এঁটেও খানিক জায়গায় জল চলাচল অবাধ। একখানা ফুলহাতা উলের সোয়েটার গায়ে দিয়ে মাথায় কান ঢাকা টুপি মানুষটা হাঁ করে তাকায়। হাতে লোহার রিংয়ে ছোট ফাঁসের ছাঁকনি জাল সোজা সরল রেখায় ভূমিতল ছাড় দিয়ে একটু ঝুলন্ত। পেটের কাছে সোয়েটারটা অনেক উঁচু। বউ মেয়েগুলোর বকবকানি শুনে বুড়ো চিড়বিড়োয়, শালার এউ মেয়েগুলান তা হইলে আড়তদারদের পক্ষ লিয়া চেঁচাইছিলো—গাছ নয়, সাবাড় চাই—খেটে খেয়ে রোজগার চাই। শালার রাঁড়িগুলা—চার মাস ফুরাইলে যখন বর্ষা আইসবে, গাঙ সমুন্দুর লাফাইবে— তখন বাঁধ ভাঙিলে তোদের ঘর পুকুর থাকবে? বর ভাতারদের লিয়া শুইবি কোনঠি? বলতে বলতে নিজের ফিশারির দিকে তাকায়। আশঙ্কায় আপশোস করে ভূপতি, এই তিন একর খাল ফিশারি ঘেরতে কম লেবার গেছে? সোটাও কি রক্ষা পাইবে শালা শালিদের জ্বালায়…!

বিভা শুধোয় কুসুমীকে, ভূপতি বুড়া না ?

—হুঁ। সারাদিন সো বর খেদানো মুটকিটা ফিশারি, গোয়াল মুনে। আর রাতে আইসে বুড়া মুটকিকে মুনতে—

কিশোরী বিভা রহস্য আঁচ করে হাসে। হাসির ধাক্কার বুড়ো ভূপতি লোহার রিংয়ে জাল নিয়ে মুখ ফেরায়।

—হাই যে বুড়া দেখেটে, বলে বিভা কপট ছলায় কুসুমীকে আঁকড়ে ধরে।

—তুই তো সোমত্ত মেয়্যাছেলে। ওই বুড়ায় ভয় ? ছোকরায় কি করবু রে ?

কথাটায় আগুন ধরে বিভার শরীরে। দু-হাতে কুসুমীকে বেড় দিয়ে বলে, ধরলে জোয়ান ছোকরা ধরুক। ওই বুড়ায় কেনি গো বউদি ?

শীতের হাওয়া গাঙ বেয়ে ঠাণ্ডা। পাতলা আঁচল চাদরে ঠিক জব্দ হয় না। এইটুকু কামালাপে বেশ তেতে ওঠে দু-জনে। দুই নারীতে। বিভার কান গরম, গরম গলার স্বর, দাদা তোমাকে এই সকালে রোজ রোজ ছাড়ি দেয়…

এক ঝটকায় কুসুমী বিভাকে সরায়, দূর হাউড়ি। তোর হউক, স্বাদ বুঝবি।

ভিজে বালির উপর দিয়ে হাঁটে মেয়েগুলো। তাদের গা থেকে দেবপ্রবাসের পরিচয় মুছে যায়। তারা হয়ে ওঠে চরমুখো। একই আকাশ ছেয়ে আছে গাঙসমুদ্র দেবপ্রবাস, মহকুমা শহর কলকাতা দিল্লির ভূমি উর্ধ্বাংশে। তারা ঘর, প্রভাতি গেরস্থালি ছেড়ে চরের বালি ভেঙে ভেঙে হাঁটে পৃথিবীর আকাশ মাথায় নিয়ে।

কুয়াশায় হারিয়ে কুসুমী ডাক দেয়, বিভা কাইরে !

পায়ের গতি থামায়। কুসুমী নিকটতর হলে কানে শোনে, এই তো গো বউদি ?

আট দশ বচ্ছরের বাচ্চা তিনটে সঙ্গী মা'দের দেখতে না পেয়ে ভয়ার্ত চিৎকার, মা—আ—

বিধবা বউটা ভীষণ একলা হয়ে পথভ্রান্ত, ও বিভা—

—কেনি গো ?

—গাঙে পড়বো নি তো ? এক কাপড় ভিজে গেলে বড় জাড় লাগবেরে বোন—

—আহা। আমি যেন কাপড়-চোপড়ের সুটকেশ হাতে আনছি ! আইস—গায়ে গায়ে হাঁটি।

শীতে চরের বালিতে সাদা পালকে মোনাপাখি দোর বারান্দায় বুড়ো বুড়ির মতো জাবড়ি মেরে বসে। মেয়েদের পায়ের শব্দে মানুষের আন্দাজ পায়। কুয়াশা ভেজা ডানা ঝাপটিয়ে পাঁচ সাত হাত উড়ে গিয়ে আবার বসে। কালো কানকাটি পাখি ফিড়িক ফিড়িক উড়ে মরা মাছি খুঁটে খুঁটে খায় মহানন্দে। এখন তো চরময় মাছি।

আট দশ বছরের বাচ্চা ছেলে তিনটের মাথায় উসকো খুসকো চুলে কুয়াশার গুঁড়ি। কাঁচের কুচির মতো চিকচিক করে। মেয়েদের মাথায় চিরুনি টানা চুল।

কপালের চুলে কুয়াশা জমে দু-এক ফোটা জলের ধারা। ভিজে যায় মাথার কাপড়। গাঙের হাওযায় শীতের কামড়।

গরান কোচা আর বাখারি ঘিরে লকপকে বেড়ায় সামান্য বালি পরিসর। এক কোণে হোগলা ছাউনি দিয়ে দো-চালা আড়তঘর। মা কমলাপতি ছেলে ডালিমের সঙ্গে বেড়া ঘেরা বালিতে গত দিনের কাঁচা মাছ চ্যাটালো বাখারির ছুরি দিয়ে উল্টেপাল্টে দেয়। মা বলে, ও ডালিম—

—কও গো।

—এমন কুযাশা চল্‌লে মাছে পোকা হইবে না ? জিজ্ঞাসায় উদ্বিগ্নতা ফুটে ওঠে। কালো চুলে ভাবি গোল মুখ কমলাপতির।

হাতেব মাছ কটা উল্টে দিয়ে কোমর সোজা কবে দাঁড়ায ডালিম। কালো চেহারায় সরু নাক, গোল গোল ভবাট চোখ ডালিমেব। হঠাৎ মায়ের মনে পড়ে জীবন্ত স্বামী বিজয়েব যৌবন। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মা ডালিমের দিকে। ডালিমকে আশ্রয় কবে ডালিমকে ছাপিয়ে সেই কাকদ্বীপের কালীনগব পাড়ায় দু-কাঠা বাস্তুভূমিতে একদা কর্মব্যস্ত মানুষটার অবয়বেব দিকে। সে বাস্তুভূমি নেই···নেই সে মানুষটা···। নিবাবয়বতাব মধ্যে দাঁড়িযে মা। পায়ের তলায় বালি। সাবাড় বেড়ার বাইরে তের চোদ্দ বছরের স্বপন দাঁড়িয়ে। কোলে কমলাপতির নাতনি মণি।

—ও মা। কাজ সারো—কুয়াশা কি সারাদিন থাইকবে ?

সম্বিৎ ফিরতে কমলাপতি বলে, দু-চারখানা পোকা লাগস্যে যে ?

—পাউডার দিবো নে।

—দুস্‌। পাউডারের যে অনেক দাম।

কমলাপতির পালিত ছেলে স্বপন তখনও মণিকে নিয়ে চরে দাঁড়িয়ে। পোকার কথায় ডালিমের উৎকণ্ঠা। তাড়াতাড়ি মাছগুলো উল্টে দিতে পারলে রোদের বালিতে শুকিয়ে পোকাও কমবে। তাই ডালিম হাঁক দেয়, স্বপনটা কই ?

মা থামায়, থাক না সে বাইরে ? তোর মেয়ে তার কোল ছাড়ে নাই—

তের চোদ্দ বছরের স্বপন। কালো চুল কালো রঙে সবে বেড়ে ওঠা কিশোর। চকচকে তীক্ষ্ন দুচোখে মায়া ভিখারি। শিশুকালে মা বাপ হারিয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ঘুরে ঘুরে এখানে হাজির। কমলাপতির পালিত সন্তান হয়ে ডালিমের কাছে ক্রমবিশ্বাসভাজন। সংসারে থাকতে থাকতে ছেলেটা ভাই হয়ে যায়। স্বপন দাঁড়িয়ে থাকে বেড়ার বাইরে। মাত্র একখানা গেঞ্জি গায়ে। গলায় সোনালী জলের কাজ করা হার। হাবের ডগায় তিনকোনা লকেট। কোলে ডালিমের বাচ্চা মেয়ে মণি।

কুসুমী বিভাদের দলটা হাঁটতে হাঁটতে বালি ভাঙে। কুয়াশা মাথায় নিয়ে হাঁটে। কমলাপতির সাবাড়ের বেড়া ঘেঁষে পায়ে পায়ে বালি শক্ত হয়ে পথ। পথের পাশে মণিকে কোলে নিয়ে স্বপন।

মেয়েদের দলটা পাশ কাটায়। কানের দুল ঝিকমিকিয়ে বিভা হেঁটে যায়। একবার ঘাড় ফিরিয়ে কুসুমীকে চাপা গলায় বলে, ছেলেটা রোজ দাঁড়ায়ে কী

দ্যাখেঠে বলু তো।

স্বপন শুনতে পায়। বুকটা ব্যথা করে। মণিকে বুকের কোষে চেপে আদর মাখায়। শূন্য বুকে আপনজনহীন আপশোস।

চার পাঁচ ফুট উঁচু গরান খোঁটা পুঁতে সরু সরু গরান বাতায় বেড়া। ভিতরে চার পাঁচ বিঘে পরিমাণ বালির এরিয়া ঘিরে মাছ শুকোবার সাবাড়। এটা এক নম্বর। মধ্যিখানে যাতায়াতের রাস্তা রেখে আবার বেড়া ঘিরে বালিয় মাঠ পাড়ন। খড় বিছিয়ে তার উপর ঘন ফাঁসের নতুন পুরাতন জাল পেতে ক'দিন আগের মাছ শুকোয়। মধ্যিখানের চলাচল পথের ডাইনে বাঁয়ে বেড়ার বাঁখারিতে ঝোলে ছুরি মাছ, কাটা কামট, দু-চারখানা ফালিকরা হাঙর। রোদ খেয়ে হিমে ভিজে আবার রোদে শুকিয়ে শুটকি গন্ধ। পাশ দিয়ে যেতেই পালে পালে মাছি ওড়ে। বিভার গালে দু-একটা মাছি উড়ে বসে। হাতে ঝাপটায় তাড়ায়। তখন পুব আকাশের কোমর পিঠে হঠাৎ মেঘ ফাঁসানো আলোর তেজ। কুয়াশা পুড়িয়ে ঝলকানি।

লেবার ম্যানেজার চৈতন্য মাইতি হাত খাতাটা নিয়ে তড়বড়িয়ে সাবাড়ে আসে, তোমরা সকলা কাজে লাগবো ?

মেয়েরা চেঁচায়, হুঁ গো দাদা—

বাচ্চা তিনটে ছেলেকে দেখে জানতে চায়, এই টোকা গুলান ?

মা তিনজন নিয়োগের আশায় বলে, ওরাও কাজে লাগবো—

—আরে ধুর। কাজ করবে না, খ্যালবে ? সংশয়ে নাকচ করতে চায় লেবার ম্যানেজার চৈতন্য মাইতি।

মা তিনজন আকুলতা জানায়, সেইদিন ওরা কত মাছ বাছাই করছে মনে নাই গো চেতনদা ?

চৈতন্য দেবপ্রবাসের লোক না হলেও এই গাঙ এই মাটির আশপাশের লোক। সুতরাং একটু ভেবে নিয়ে বলে, তবে হাফ নয় পাঁচ টাকা লিবে। কাজে লাগি যাও—

মা তিনজন রাজি হয়েও শেষ চেষ্টাটা চালায়, বড় লোকের সোমান সোমান কাজ তুলে। হাফ মজুরি দও গো বাবু—

—আমরা অনেক কাজ করবু গো বাবু। আমানকে কাজ দাও—, বাচ্চা ছেলে তিনটে আট দশ বচ্ছরের হলেও যুবকের মতো ভঙ্গি দেখিয়ে মাটি কাটা ঝড়ায় নজর টানে চৈতন্যের। একটা ঝড়া হাতে ঝুলিয়ে ছেলেটা বলে, এই ঝড়া তো আমি মাথায় লি যাই গো—যোগ্যতা বোঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সাড়ে সাতটা টাকার জন্যে শিশু বয়েস অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা চায়। শ্রমের মধ্যে প্রবেশের অনুমোদন যাচঞা করে।

চৈতন্য হেসে ফেলে।—পারবু তো ?

ছেলে তিনটে পাঠশালার শতকিয়া পাঠের সুরে বলে, হুঁ গো বাউয়ু হুঁ।

সাদা বকটা সাবাড়ের মাথায় পাক মেরে কাঁচা মাছ ঠুকরে ঠোঁটে তোলে। গেঞ্জি গায়ে বাচ্চাটা ধাঁ করে তেড়ে যায় বকের দিকে, হ্যাট্—হ্যাট্—হুশ—

খুশি হয়ে চৈতন্য বলে, লে কাজে লাগ। হাফ দুবো—

সন্তানদের নিয়োগে মা তিনজন মর্যাদা পায়। বালির চরটা তাদের প্রিয় বালিস্থান হয়। শীতের রোদ সুখের তাপ বহন করে। উপার্জনের আলোয় মা ছেলেকে দেখে, ছেলে মাকে দেখে।

এক নম্বর সাবাড়ে কাঁচা মাছের ঢিপি আট দশখানা। মেয়েদের দলটা চার-পাঁচখানা গ্রুপে ভাগ হয়ে এক একটা মেছো ঢিপি ঘিরে বসে। রান্নাশাল থেকে একটানা লম্বা হোগলা ছাউনি আড়ত লেবার শেড অব্দি। বিভা লেবার শেডে ঢুকে বাঁখারি কাটা ছুরির আকারে পাটোয়ার বাণ্ডিলটা সন্ধান করে পায় না। লেবার শেডের মধ্যে বিছানাগুলো এলোমেলো গোটানো। হোগলার গায়ে দড়ি টাঙিয়ে লেবারদের লুঙি গামছা। ময়লাপড়া জামা ঝুলছে। পুরনো সুটকেশ, থলের ব্যাগ রেক্সিনের কিটস্ ব্যাগ বিছানা বালিশের নিচে রাখলেও সবই স্পষ্ট। কিন্তু মাছ বাছাইয়ে কাঁটা খোঁচা সামলাতে "পাটোয়া" কাঠিগুলো কোথায়। লেবার শেডটার এ মুড়ো থেকে সে মুড়োয় খুঁজে খুঁজে যায়। পুরুষ মানুষ···ছোকরা লেবারদের গায়ের গন্ধ দড়িতে ঝোলানো লুঙি গামছায়। দু-একখানা জাঙ্গিয়া হাফপ্যান্ট অগোছালো। থমকে দাঁড়ায় বিভা! হাওরাই শার্ট চেক কাটা লুঙি। চেনা রঙ···চেনা অবয়বের আকার। ভাবে মহিমের···নাকি কার্তিক বাঙালের···!

হাতে তেল কালি, ন্যাকড়ায় আঙুল মুছতে মুছতে লেবার শেডে ঢোকে সুদর্শন। বড় বাক্স থেকে রেঞ্জটা হলে জেনারেটারের নাটটা টাইট দেওয়া সুবিধে। সুদর্শন মেয়েটাকে দেখে চমকে যায়! কেউ কি এত বেলা অব্দি বিছানায়? নাকি মেয়েটা বেরিয়ে যেতে দেরি করেছে? ছোকরাটা আগেই পলাতক!

বিভা ঘাড় ফেরায়। ফাঁকা শেড মানুষের উপস্থিতিতে পরিবেশ পায়। বিভা বলে, আমাদের 'পাটোয়া' কাই গো ম্যাসিনদা?

—কি? পাটোয়া?

—হুঁ।

--কাই রাখছিলি কাল?

—এউধাবকে, বলে জেনারেটারের মালপত্র তার হোল্ডার বাপের বাক্সটা দেখায় বিভা।

—তা হইলে আছে। দেখি লও—, বলে জেনারেটারের জন্যে রেঞ্জটা বের করে সুদর্শন। কার্তিক থেকে অঘ্রান—ঘরবাড়ি ছেড়ে চরবাসী। একদম নারী-হীন নিশি যাপন। মেয়েটার গায়ের বাতাস লুঙি খাকি জামা ভেদ করে বুকে। বুক মোচড় দিয়ে রক্তপ্রবাহে। লোহার রেঞ্জটা তালুর চাপে গরম হয়।

পাটোয়া চালিয়ে মাছের ডাঁই ভাঙে কুসুমী, পাশে বিভা। বড় রুপোবাটি, নিহেড়ে মাছগুলো পাশে রাখে মেয়েরা। মহিম ঝড়াভরতি মাছ টেনে নিয়ে যায় বেড়ার ধারে। কাঁচা মাছগুলো বেড়ার বাঁখারিতে ঝুলিয়ে দেয়। শুকোবে

রোদে তাতে।

বেড়ায় মাছ ঝোলানো হয়ে গেলে মহিম চেঁচায়, কার্তিক, কার্তিকরে—ওই মাছগুলা লে আয়—। সাবাড়ে ঢাল—

বেলচা মেরে বাছাই করা মাছ ঝড়া ভরে। মাঝারি, বড় বাঁশ পাতার মতো লালপাতি, সাদা পাতি মাছগুলো ঢেলে দিয়ে যায় কার্তিক। থলেথলে ডিম পেটের মধ্যে।

বাঁখারি কাটা প্যাটোয়া দিয়ে মাছগুলোকে পাড়নে বিছোয় মহিম। একলা রোদে হিমসিম। ঘন বুননে জাল, তলায় খড়ের আস্তর। রোদে বালি তেতে ঘুমসে যায় খড়। তলায় গরম ভাপ উপরে কড়া রোদ্দুর। মাথা নিচু করে কোমর উঁচু—পিঠময় রোদ। গায়ের চামড়া পোড়ে। সাবাড়ের মাছ বিছোয়।

তাপ শুষে নিয়ে জলের প্রাণীগুলো মাটির উপরকার বস্তু হয়ে যায়। বিক্রয়-যোগ্য পণ্যে মর্যাদা পায়। খাদ্যদ্রব্য হয়ে ওঠে বেশ কিছু ভারতীয় মানুষদের। ভারতের বাইরে কিছু রসিক মানুষদেরও।

বাচ্চা মেয়ে মণিকে কোলে নিয়ে স্বপন। গলার হারে তিনকোনা লকেট-ময় রোদ। বিভা স্বপনের গোল কালো মুখের জেল্লায় থম মেরে যায়। দু-চোখ ভীষণ মায়াময় তীক্ষ্ণ। খালি গায়ে নিকষ কালো। ঝকঝকে সাদা দাঁত। স্বপনকে দেখে বলে, হই—ওই বুড়িটা তোর কে হয়ঠে রে?

স্বপন বলে, আরতে?

—হাঁ। ওই সাবাড়ে?

—কেউ নয় গো।

—তবে থাকিস কোনঠি?

—ও হানে, স্বপন উত্তর দেয়।

বিভা উত্তরে অখুশি। বলে, দুঃ। হাবা—।

স্বপন আট দশ বছরের বাচ্চা তিনটেকে দেখে। কলাপাতা রঙের শাড়ি বউটার গায়ের কাছে সাত বছরের বাচ্চা ছেলেটা কলাপাতা শাড়িকে শুধোয়, তুমি ওর মা?

—কেনিরে খোকা?

—আমার মা নাই···, বলতে বলতে স্বপনের চকচকে চোখে ব্যথা চিয়োয়।

বিভা তাকায়, ওই বুড়িটা মা নয়!

—ভারতে আমার কেউ নাই···ইণ্ডিয়ায় কেউ নাই···বোন দিদি ভাইও নাই···, বিড় বিড় করে বলে ছেলেটা।

বিভা হাঁ করে স্বপনকে দেখে। ভারত কথাটা হাজার বার শোনা। 'ইণ্ডিয়া' কথার মানে ধরতে পারে না। শুধু ভাবে, ছেলেটা তো আমারই সমবয়েসী। ছেলেটা মা বোনদের খুঁজে···নাকি মা বোন যে দেশের মাটিতে সো দেশকেও খোঁজে···!

বিভার আনমনায় স্বপন প্রশ্রয় পায়। বলে, তোমাদের দেশ হই লক গেট—

চারকপাটি ওই পাশের তন ?

মা ভাই বোন হীন…দেশ মাটি হীন কিশোর ছেলের সামনে নিজের গ্রাম আছে, মা ভাই বোন আছে বলতে সুখ পায়। তখন যে সামান্য স্বরবাহক শব্দ, হ্যাঁ।

(২৫)

রোদ বালিচরের হঠাৎ-কলোনির ছেঁড়া তেরপলিন, খড় হোগলার ছাউনি মাথায়। বালির দাওয়া, বালির উঠোন। রান্না করে দু-এক চালার বউ মায়েরা। উনুনে খোঁচা পালা ঠেলে দিতেই এক ঝলক আগুন। তোবড়ানো কড়ার গায়ে ধোঁয়ার কষ পড়ে কালি। বউটা পাল্লা টেনে দু-হাতে চাপ দিতেই মট…। বুকটায় ধক্ করে লাগে। পাশে তাকায়, পিছনে তাকায়, দেখতে পায় না। চেঁচায় সরু গলায় বউটা, ও দীনু—দীনুরে—এ—এ

গায়ে গায়ে বাঁশ খোঁটা গরান হেতাল জুড়ে গেঁথে কাঠামো। তারপর গায়ে হোগলা, ছেঁড়া চট কিংবা মাথার উপর পাতলা পাতলা খড় বিছিয়ে ছাউনি। শীতের রোদ আটকায়, রাতের হিম প্রতিরোধ করে। উত্তুরে হাওয়ায় শীত ঢোকে পাক মেরে মানুষের আবাসে। চার মাসের ঘর সংসারে।

ওপাশের খাটুয়া বউ মুখ বাড়ায়, কী হয়ঠেরে দিদি ?

ছ'সাত বছরের বাচ্চা ছেলে। উৎকণ্ঠায় থর থর কাঁপে বউটা। খাটুয়া বউয়ের দিকে তাকায়, আমার কোলেরটা—দীনু কই যে…

—খ্যালছিলি তো ছেলেমেয়ে গুলান, উত্তর দিতে সাহস যোগায় খাটুয়া বউ। এক থানা এক পোস্ট অফিসে ভিন গাঁয়ের মানুষ। বালিস্থানের হঠাৎ-কলোনিতে নিকট প্রতিবেশী। একই জীবিকায় ঢুকতে এসে পাশাপাশি।

খোঁচা পালার যোগান নেই, সুতরাং উনুনের আগুন নিভে সরু সরু ছাইয়ের রেখা। দাহ্য হারিয়ে খোঁচা পালার একদা চেহারা। রুগ্ন তাপে উনুনটুকু বালির উপর। তোবড়ানো সিলভার কড়ায় শুকনো নিহেড়ে মাছের ঝাল আগুনহীনতায় লঙ্কা হলুদে টলটল করে।

ছোট্ট ছাউনিঘেরা ঘরে রেডিও চলে। সামনের উঠোনে জঙ্গুলে গেঁমুয়া গাছের চারখানা বাঁকা খোঁটায় মাচা। ফরেস্টারের বগড়া ডগ বিছিয়ে ঘনত্ব। মজুরির বদলে মাটি কাটা ঝড়া মাপে কাঁচা নিহেরে ভোলা পড়তি ঝড়তি রুপোবটি শুকনো হয়। তলায় মুরগি বাচ্চা ঘেরা জালে কিচমিচ করে।

রান্না ফেলে বউটা ডাকে, ও দীনু—দীনুরে—এ—এ

কালো কুচকুচে চেহারায় গা ভরতি শিরা। ঘরের ভিতর বালির উপর খেজুর পাতায় বোনা চ্যাটাইয়ে গুটোনো বিছানা। বিছানার গায়ে হেলান দিয়ে রেডিও শোনে। মশলা ফুরনো ব্যাটারিতে ক্ষীণ আওয়াজ।—ও দীনু আছুরে—

বউটার গলায় মায়ের ডাক।

রেডিওর ক্ষীণ আওয়াজ উপচে কানে যায় চিন্তামনির। ঘরের বাইরে উলটো বাতাসে নিহেড়ে ভোলার শুটকি গন্ধ। চিন্তামণি বলে, আগো—এক পাল আমাদের ছেলেমেয়েরা হাই আড়তের দিকে গেছে—

আঁকুড় পাঁকুড় জানতে চায় বউটা, আমার দীনু আছে···

বউটার উদ্বিগ্নতা দমাতে বলে, আমাদের সব কটা বাচ্চাকে দেখছি গো—কী সব গুড়ায়ঠে—

—তাই! চিনো তো আমার টোকাটাকে?

—হ্যাঁ, জানায় চিন্তামণি। নিজের চোখ ও স্মৃতিতে ভীষণ আস্থা।

বিপন্নতা খানিক কাটে। কাটে বলেই সম্ভ্রম জাগে মনে। নোনা গাঙ, ধুধু ফাঁকা সমুদ্র কাণ্ড—মানুষ ছাড়া কেবা এই ভৌগোলিকতায় আপনজন আছে। তাই জিজ্ঞেস করে, বউদি কাই গো দাদা?

এক খণ্ড কাপড় কোমরে গুঁজে পরেছে চিন্তামণি। শীতের রোদ খালি গা। ঘর তো নয় বালির উপর আচ্ছাদন ঘেরা ছাউনি। ছাউনি চিরে রোদ ঢোকে ঘরে। বিছানায় পুঁটলিতে হোগলা ফুঁড়ে রোদের ফালি। চলাফেরায় বালি উঁচু-নিচু ঘরের মেঝে বারান্দায়।

—অ্যাঁ? বউদি? উতো নিম্মলবাবুর আড়তে—মাছ বাছাই হইতেছে। দু ট্রলার মাছ পাইছে। লোকটার কপাল জোর—

—কপাল জোর বউদিরও, একটু ঠোকরা দেয় বউটা।

—আড়তদারের কপাল, আমানকে কি?

—মজুরি না লিয়ে ঝড়া ভরতি মাছ 'ফেরকা' লিবে, বলে মাচাটা দেখে বউ। শুকনো মাছের গন্ধ রোদ বাতাসে। মাচাটার কাছে মুখ বাড়িয়ে বউটা বলে, ও দাদা,—এক ঝড়া কেনি গো? অখনও দু-পাঁচ ঝড়া ফেরকা লইলে শুকাইবে—

দাবড়ি দিয়ে চিন্তামণি বলে, আরে দুঃ। আগে 'ফেরকা'য় মাছ পাউক তা নয় শুকাইবার গল্প ফাঁদে?

বউটার খিল খিল হাসিতে চিন্তামণির মাচা দোলে। রোদ বাতাসে হাসি বালি বেয়ে আর দু-পাঁচ ঘরের কানে।

সংসারের খুঁটিনাটি সারতে সারতে চার পাঁচটা বউ মুখ বাড়ায়। পরনে লাল জমিনের শাড়ি। টিয়াপাখি রঙের ময়লা শাড়িতে রুখু চুলে কালো কালো চেহারা হাতে রুপোর বালা। ঝুটো পাথরের নাকছাবিতে রোদ। ফিস-ফিস করে বলে, দিনুর মা, অতো হাসেঠে কেন?

দীনুর মা মাচার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, পিস মিলের খুটি বসছে গো দাদা—

—হুঁ। অনঙ্গ জানায় আড়ত তো? জিজ্ঞাসায় বউটার তথ্যের ভিত দৃঢ় হয়?

মাচাটায় চোখ বুলিয়ে দীনুর মা আপশোসে বিড়বিড়োয়, সিজিন তো যায় যায়···। যে কটা দিন আছে মজুরির বদলে এউবার থিকে "ফেরকা" লুবো—

কলতলা ঘিরে ডাইনে বাঁয়ে দোকানপাট। চা পান বিড়ি বিস্কুট রুটি, চাল

ডাল আলকাতরা পেরেক। হোমিওপ্যাথি এ্যালোপ্যাথি ডাক্তারখানা। শেষ দিকে চুল দাড়ি কাটার 'বাচ্চন' সেলুন।

দশ বারোজন বাচ্চা ছেলে মেয়ে দোকানের সামনে ঘুর ঘুর করে। পড়ে থাকা পলি প্যাকেট, ঢালাইয়ের সময়ে ব্যবহৃত পলিথিন শিটের ছেঁড়া টুকরো খুঁটে খুঁটে কুড়োয়। ছ'সাত বছরের দীনুটা এফ ডি এম কোম্পানির আড়তের সামনে দাঁড়ায়। বড় বাক্সে শুঁটকি মাছ বাঁধাই হয়েছে পলিথিন শিট দিয়ে। চলে যাবে বাগনান ফুলেশর ভুটভুটি ট্রলার চেপে। টুকরো শিটের লোভে দাঁড়িয়ে দীনু। মোটা দড়ি বাঁধতে বাঁধতে লোকটা বলে, কিয়্যা কচি ? কী চাও—?

—আউটা লুবো ?

—কী টা ?

পড়ে থাকা কালো শিট ফরফর ওড়ে। সেটা ধরে কাঙালের মতো অনুমতি চায় দীনু—এউটা গো বাউয়ু— ?

ঢলঢলে হাফপ্যান্ট ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দীনু বয়স্ক চোখে মানুষটার মন বোঝে। মানুষটা বলে, লিবো—

—হুঁ গো বাবু।

—কি করবি ? ঘর ছাইবি না খেলবি ?

মুহূর্তে ছকে ফেলে বাচ্চা দীনু, খেলবার জন্যি কি দিবে ? সুতরাং বলে ওঠে, ঘরে শীত ঢুকে— । ঘর ঘেরবো—

মানুষটা খুশি হয়ে বলে, যা লিগে যা। আর কাউকে ডাকবো নি—

—না, আশ্বাস দেয় দীনু।

ছ'সাত বছরের দীনু হাঁইফাই করে কুড়োয় কালো পলিথিনের শিটের টুকরোটা। চারপাঁচ জন ছেলেমেয়ে দেখতে পায়। দু-হাতে কাঁচের চুড়ি। রঙিন আকাচা ফ্রক গায়ে মেয়েটা পাশের বাচ্চা ছেলেকে বলে, হাই দেখু—

—কিরে লক্ষ্মী ?

—হাইয়ে দীনু পায়ঠে—কত বড় কাগজ…

—যাবোরে লক্ষ্মী আউখানে ? শুধোয় সুবল।

—হুঁ। চলু—, বলে চার পাঁচজন এক সঙ্গে দৌড়য়।

বাক্স বাঁধছিল মানুষটা। বাচ্চাগুলোর হাতে ছোট ছোট ব্যাগ। মানুষটা বাচ্চা ছেলে মেয়ে দেখে অবাক।—কি মাঙছিস র‍্যা ?

—দীনুকে দিছো। আমানকে দিবে নি ?

বাচ্চাগুলোর গলায় যেন অধিকারের অভিযোগ।

বাক্স বাঁধা দড়িটার গিঁট দিতে তখনও বাকি। থমকে চেঁচায়, ভাগ্। হট্ যা সব—

বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো পালায়। কলকল কথাবার্তা একদম গাঙ কিনারে বালিচরে। চরের বাঁ-দিকে সমুদ্রমুখ ছোঁয়া গাঙ। রোদ পড়ে নোনাজল চকচক করে। সবুজের ঝোপ সাজিয়ে টানা কয়েক মাইল লুথিয়ান জঙ্গল।

রোদ্দুরে হাঁটে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। বকবক করে লক্ষ্মী, দীনুর কত

কাগজ—

দীনু বড় সড় পাওনায় খুশি হয়ে হাসে। বলে, চল্ না—আর কিছু পাবো—। তুইও পাবি।—

লক্ষ্মী গা ঘেঁষে বলে, আমাকে ছিঁড়ে দুবোরে কাগজটা ?

দীনু মনমরা হয়ে তাকায় লক্ষ্মীর দিকে। কোন ভিন গাঁ গ্রামের বাচ্চা-কাচ্চা সব। হঠাৎ-কলোনিতে ক'মাসে বন্ধু হয়ে গেছে। খেলার সাথী হয়ে গেছে। সেই মেয়েটা একটুও কাগজ পায় নি…পলি প্যাকেটও পায় নি…। মনটা সেঁতিয়ে যায় দীনুর।

ফট করে আট বছরের লক্ষ্মীটা ব্যাগ খুলে দেখায়, সব ফাঁকা রে…

ছেলেমানুষ দীনু বলে, ঘর যাইয়া দুবো—

—ঠিক দুবো। দুবো তো ? যেন সত্যি প্রতিশ্রুত করিয়ে নেয়।

ডাইনে বেড়া ঘেরা সাবাড়। গরান বাঁখারির গায়ে নিহেড়ে রুপোটি মাছ শুকোয়। শুকোয় বেড়ার মধ্যে বালির পাড়নে। লেবার মেয়েরা বাঁখারির পাটোয়া ঠেলে ঠেলে শুকনো মাছগুলো উলটে পালটে দেয়। বেলা এগারোটার রোদে শুটকি হয়। ছন্নছাড়া মনাপাখি, কানকাটি পাক খায় শুকনো মাছের উপর আকাশে।

হঠাৎ-কলোনির বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো বালিচর ভেঙে হাঁটে, পাখিগুলো উড়ে গিয়ে চক্রাকারে ঘোরে। মৌর্য দাসের বাইন গাছটায় বাঁশ ডগালিতে টাঙানো সবুজ পাইপ লাইট দিনের আলোয় যেন কাগজ জড়ানো লাঠি।

বড় বাবরি চুলে মাথা ভরতি শচীন দাস। লম্বাটে মুখ। চোয়াল চোপরা ভারি। মাঝখানে সিঁথি কেটে যেন যাত্রাদলের ডাকাত। হলুদ নাইলন সুতোয় বড় বেঁউতি জালের ছেঁড়া অংশটা ব্লেড মেরে কেটে দেয়। পাশেই বালির উপর সুতো জড়ানো থোবিলটা পড়ে। হাত দুয়েক ফাঁস বুনে দিলেই জালটা কাজের জন্যে 'ফাঁড়ে' যাবে। মাঝ সমুদ্রে পাতা হবে।

শচীন দাস থোবিলটা গলিয়ে ফাঁস দিতে গিয়ে ছেঁড়া বাতিল জালটুকু জড়িয়ে যায়। বতিল নাইলন সুতোর জালটুকু রাগে ছুঁড়ে ফেলে চরের বালিতে।

পিছনের মাঝবয়সী লোকটা সরু সুতোয় ফাঁস বুনতে বুনতে 'ডেইসা' থামিয়ে শুধোয়, শচীনদা—কী ফ্যালাই দিতেসো ?

—আমাগো গলার ফাঁস।

—দুস্। ফাঁস ছাড়ায়ে যামু কই ? মৌর্যর বাবার তন সাতশ টাকা ধারি। এ্যাহন শোদ দিতে পারত্যাসিনি। সিজিন ফুরোয়—

—ক্যান ? শচীন দাস জানতে চায়।

—মইধ্যিখানে দুইশ টাকা ধার নিসি ?

—অ। তা হইলে আর কমু কি…

—তোমার কি। সিজিন ফুরাইলে তোমাগো কীর্তন লাগবে—

শচীন দাস ঘাড় ফেরায়। সঙ্গী লোকটির প্রতি ভালোবেসে তাকায়। যেহেতু শচীন দাসকে শুধু মেছুড়ে জেলে নয়, একজন কীর্তনীয়া হিসেবে মূল্যও

দিচ্ছে। খুশি হয়ে শচীন দাস বলে, সুধীরদা—

—কও।

—যুবক কালে রেডিয়ুতে অডিসন দিছিলাম—ফিছারিতে ইন্টারভ্যু দিসিলাম। কোনুটাই তো লই নাই ওই গান গান কইর‍্যা—

বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দলটা হঠাৎ ছোটে। যে যাকে পারে ধাক্কা দিয়ে এগোয়। শিশু চেহারা। কচি কচি হাত-পা। মৃদু ধাক্কায় লেপটে পড়ে বালির উপর। আবার উঠে দৌড়য়। চোখের সামনে হলুদ…বাতিল হলুদ নাইলনের ছেঁড়া জালটা।

আট ন'বচ্ছরের ছেলে অশোকটা প্রাণপণে ছোটে। পিছু নেয় দীনু লক্ষ্মী সুবল। ছেঁড়া বাতিল জালটুকুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রোগা অশোক। সাত আট বছরের সুবলও গিয়ে আঁচড়ায় জালটা। বাচ্চা মেয়েগুলো গায়ের কাছে দাঁড়ায়। হুড়োহুড়ি করতে গিয়েও থমকে যায়। লক্ষ্মীর ব্যাগ একদম ফাঁকা। তখন মনে হয়, উরা তো ছেলে…আমরা মেয়ে।

নাইলন সুতোয় একখণ্ড ছেঁড়া জাল নিয়ে টানা হাঁচড়া করতে করতে অশোক আর সুবল ঘুষোঘুষি লাগায়, বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ভয়ে চেঁচায়। মিলিত চিৎকার আতঙ্ক জাগায়। শচীন দাস 'থোবিল' সুতো পাশে রেখে উঠে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা একটু বুঝেই জোরে হাঁকরে দেয়, কারা মারপিট করত্যাসিস বে—এ—এ—

গলা নয় যেন গর্জন। থমকে যায় দুজন। তবে ভয় পায় না। গরীব ঘরের শিশু। হাজার ধমক ধামকে শৈশব হারাচ্ছে। দ্রুত মানুষ হয়ে উঠছে। শচীন দাস কাছাকাছি আসতেই ঘুষোঘুষি মন্দগতি।—কী হইস্যে কও?

ছেঁড়া হলুদ জালটা তখন পায়ের কাছে। সেটার উদ্দেশে অশোক বলে, আমি আগে ধরছি জালটা—

সুবল পক্ষভুক্ত হয়ে বলে, আমি আগে দেখছি জালটা—

কীর্তনীয়া শচীন দাস আতান্তরে। ফট করে মনে পড়ে ব্লেডটা তো থোবিল সুতোর কাছে। চকিতে একটা কৌশল করে হুমকি দেয়, এ্যাই তোরা দুইজনায় ছেঁড়া জালডারে ধর—। ধর জলদি—

দুই শিশুতে ছেঁড়া জালটার দুই প্রান্ত ধরে শচীন দাসের পিছু পিছু আসে। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে।

লক্ষ্মী পড়ে থাকা বড় জালটা দেখে ভাবে, এর একটুখানি যদি আমি পাইতাম গো…।

হাতের মধ্যে ব্লেড। মাঝখান থেকে সিঁথি কাটা বাবরি চুল মাথার দু-পাশে ঝামরে পড়ে কষাইয়ের মতো লাগে। ধমক দিয়ে বলে, জালডারে কে আগে ধরসিলিস রে?

উত্তেজনায় দ্রুত উত্তর দেয় অশোক, আমি—

সঙ্গে সঙ্গে সুবল বলে, আমি যে আগে দ্যাখছি চর থিকে…সো সো…, বলে কোন কিছু দিগদর্শক বা অবস্থান মেলাতে পারে না।

—আচ্ছা। ঠিক আছে—। জোরে টান দাও জালডারে—, কড়া গলায় আদেশ দেয় শচীন দাস।

দুই শিশু ভয়ে টান টান। জালটাও নিষ্কম্প। শচীন দাস ঠিক মাঝামাঝি ব্লেড মেরে চাপ দেয়। হলুদ নাইলন সুতোর জালটা দুইভাগে দু-টুকরো। শচীন দাস বলে, হইল ? হইস্যে··· ? যা—দুই জনারই সম্পত্তি।

বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো ভাবে, ইস্ ! মাগো—আমরা যদি জালটা একবার ছুঁইতে পারতাম···।

দশ-বারোজন বাচ্চা ছেলে মেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায় আর ভাবে, এই বালিচর···দেশে কিছু পেতে গেলে ছুঁয়ে থাকতে হবে···লেগে থাকতে হবে, এরকম একটা প্রতীতিতে নতুন দীক্ষা লাভ করে এই শৈশবে।

হোগলা ছাউনির দো-চালা অনেক খানি লম্বা। বালির খুঁটি পুঁতে পুঁতে দাঁড় আর খড় পাকিয়ে কাছি দিয়ে ঘেরা এরিয়া সামনে খোঁটার উপর বাঁখারি বিছিয়ে মাঝারি সাইজের মাচা। মাচার পাশে সরু বাঁশের তো-কাঠায় কাঁটা পাল্লা ঝুলিয়ে অনঙ্গ জানার পিসমিলের আড়ত।

পাতলা চটের বস্তায় ছোট ভোলা, নিহেড়ে শুটকি আধমণ একমণ ওজনে সাইজ করে বাঁধা। এক কোণে কেরোসিন স্টোভ হাঁড়ি কড়া চালের বস্তা। হোগলা চালার মটকায় একখানা হ্যাজাক ঝোলে। টিনের সুটকেসে ক্যাশ বাক্স। পাশেই ভাঙা কাঠের বাক্সর উপর খান পনেরো শেলট, খাতা পেন্সিল। এক বাণ্ডিল খড়ির পেন্সিল ভেঙেচুরে অনেকগুলো। 'পড়বে এস' প্রথম পাঠ বইটার মলাটে বিনুনি বাঁধা মেয়ের পাশে হাসিমুখে ছেলেটা দাঁড়িয়ে। দু-জনে একটা বই পড়ছে আনন্দ করে। মলাটের তলায় লেখা,

স্টেট রিসোর্স সেন্টার (পশ্চিমবঙ্গ)
বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগ
১/৬ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মাচার কাছে পাল্লার দড়ি ধরে একটু শ্বাস নেয় বউটা, হাতের ব্যাগে শুকনো মাছ। বউটা বলে, ও বাবু— বাবু—মাছ লুবো গো ?

কাজের ছেলেটা কাছে আসে। বউটা নিচু হয়ে পলিথিন কর্ডের বাজারি ব্যাগটা মেলে ধরে। তার কালো ভরাট হাতে সরু শাঁখা নোয়া কব্জি বন্ধন করে নড়ে চড়ে।

খোলা ব্যাগে হাত ভরাতে গিয়ে বউটার হাতে ছুঁয়ে যায়। শাঁখা নোয়ায় মৃদু ঝিনিক। মধ্যবয়সী বউ। তিনচারটে ছেলেমেয়ের মা। পুরুষটা খেটে খেটে দড়ি। বেশ গাট্টা গোট্টা ছোকরা এই কাজের ছেলেটা। ব্যাগে হাত চালিয়ে কটা শুটকি ভোলা বের করে, বড্ড ছোটো যে গো ?

—ছোটো হবে নি তো কি ? ফেরকায় আড়তদাররা বড়ু বড়ু মাছ দিবে ?

কাজের ছেলেটা মুখ তোলে। শোনে বউটার যুক্তিযাক্তা। পরে বউটা বলে, দর কত ?

—বাবুকে জিজ্ঞাস করো, বলে আঙুল দেখায়।

অনঙ্গ মোটা খাতায় হিসাবটা গুছিয়ে বলে, কি মাছ?

—ভোলা, উত্তর দেয় কাজের ছোকরাটা।

—সাইজ কেমন? জানতে চায় পিসমিলের আড়তদার অনঙ্গ জানা।

গোটা ব্যাগটা এনে দেখায় বউটা। অনঙ্গ জানা দেখে বুঝে বলে, কেজি সাত টাকা করে। আচ্ছা ওকে সাড়ে সাত দিবি—মেপে ফেলা।

বউটা বলে, কেন গো বাবু? আট টাকা করে তো শুনছি—

—দুস্। কে তোমাকে কইছে? দেখি—, বলে ব্যাগের মধ্যে হাত চালায়। সাবধানে এক মুঠো শুটকি ভোলা তুলে অনঙ্গ বলে, এ্যা। বালি ভরতি। মাচায় শুকোতে পারো নি?

—মাচা। বিস্মিত হয়ে খানিক সময় কাটায়। তারপর বলে, কলোনিতে মাচাটা বাঁধবো কিসে গো বাবু? ফরেস্টার একটা পালা কাটতে দিছেনে—

হাতের মুঠোয় শুকনো ভোলা মাছ কটা ধরে অনঙ্গ নিজের পক্ষে আরও যুক্তি যোগাড় করে, দুস্। অখনও মাছ ভিজা। রস আছে। আমাকে শুকাতে দিতে হইবে। তারপর তো ম্যাসিন কোম্পানিরা লিবে। এখন তোমার এক কেজি তো শুকনা হয়ে পাঁচশ কি ছয়'শ?

বউটা আর বিতর্কে যেতে চায় না। বরং বলে, মাপি লওতো বাউয়ু—। আমার চাল সরষার তেল কিনতে হইবে—

ছোকবা বিমল, সঙ্গে দুই বুড়ো। খালি গায়ে শুধু কাপড় আর লুঙ্গি পরে অনঙ্গবাবুর কাছে। ছোকরা বিমল বলে, দাদা—

অনঙ্গ তাকাতে গিয়ে হোগলার গায়ে বড় পোস্টারটা চোখে পড়ে। দুটো ছেলে আর মেয়ে খল খল হাসিতে ভেসে যাচ্ছে ছবির মধ্যে। ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে কিছু বলছে। সামনে মোটা মোটা হরফে লেখা, অ, আ ক, খ,।

—কি বিমল?

—এই দুজনকে ধরছি, আমাদের পড়ুয়া। দাও। বিড়ি খাবাও—

পাশে কৌটয় হাত বাড়ায় অনঙ্গ। সাক্ষরতা কমিটির সদস্য। একটা বের করতে গিয়ে আরও দুটো বিড়ি বের করে। হাতে ধরিয়ে বলে, লও, খাও সকলে।

বিড়ি হাতে পেয়ে মানুষ তিনজন পাকিয়ে ফুঁ দেয়। তখন কাজের ছোকরাটা চেঁচায়, বাবু—উ

—কিরে?

কাঁটা পাল্লার একদিকে ব্যাগ থেকে ঢালা মাছের ছোট্ট স্তূপ। ওপাশের পাল্লায় পাঁচ কেজির বাটখারার সঙ্গে একখানা টুকরো ইট বসিয়ে দু'শ গ্রামের ওজন জ্ঞাপন করে। বাটখারা আর ইটের টুকরোর দিকে নজর করে কাজের ছোকরাটা হাঁকে, পাঁচ কেজি দুশো—

সাদা কাগজে টোকছা রেখে হিসেব করে অনঙ্গ জানা।

বিমল বিড়ি ধরিয়ে দেশলাইটা বাড়িয়ে দেয় পাশের দুজনকে। অনঙ্গ সাড়ে

সাত টাকা কেজি দরে হিসেবে মেলায়, বাবরে বাব্। উনা চল্লিশ টাকার মাল বিকাইলে গো মেয়াছেলে ?

বউটা সংকুচিত হয়ে বলে, গরীব মানুষের এই কটা টাকায় অনেক দেখলেন গো বাবু—?

অনঙ্গ বউটার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে টাকা গোনে।

বউটা বলে, আড়তে এত মাল…কারখানায় পেষাই হলে কত টাকায় যে বিকাবে !

বুড়ো দু-জন বই শেলটের বাণ্ডিলের কাছে গিয়ে ঘাটে। রাতের বেলা পড়তে যে বইটা পায়, খুঁজে খুঁজে সেটা বের করে। বালির উপর থাপড়ি মেরে বসে মাঝবয়সী উত্থান সামন্ত 'পড়বে এস' প্রথম পাঠ বইটার পাতা ওলটায়। চার নম্বর পরিচ্ছেদের ছবিটা দেখে। বাড়ির পুরুষ মানুষটা দু-খানা খুঁটি পুঁতে একখানা ছোট বাঁশ দড়ি দিয়ে দু-দিক বেঁধে ফেলেছে। আর একটা খুঁটি গর্তে ঢকিয়ে জোরে ঝাঁকুনি মেরে গভীরতা তৈরি করে। পাশে শাবল কোদাল। এক লেচি দড়িও। একটুও তফাতে বউটা খড় কোটা বঁটিতে খড় কাটে। বাড়ির বউ। মেজলায় গরুটা ভঁস ভঁস শব্দে জাবনা খায়…। দেখতে দেখতে উত্থান সামন্তের মনে হয়, আরে… ! ইতো আমারই ঘরকন্না ! উটা আবার লিখাপড়া …সাক্ষরতা… !

বিড়িতে বার কয়েক দম মেরে বিমল বলে, অনঙ্গদা—উত্থানদাকে কইয়ে দাও, আজ রাতে পড়তে আইসতে—

—উত্থান বাবু, অনঙ্গ জানা সাক্ষরতা কমিটির সদস্য। তারপর মাস্টার ট্রেনার। অর্থাৎ এম. টি.। গলায় বেশ জোর।

—হুঁ। বাবু কী কইছেন ?

—কাল আইলে নি যে ?

—উফ্। সারা দিন মাছ বয়ে ছয়ে গায়ে পিঠে দরদ করছিলো গো বাবু ?

—আর সব তো আইছিলো ?

—আইছিলি ? হুঁ আজ রাতে আইসব—, গলায় উৎসাহের সুর। হঠাৎ বিমল জানতে চায়, হ্যাজাকের তেল পাঠাইছে পঞ্চায়েত থিকে ?

—হুঁ। প্রধানও আইছিলো, অনঙ্গ জানা খবরটা দিয়ে বিমলের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে।

বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তের চোদ্দ বছরের স্বপন ঘুরতে ঘুরতে পিস-মিলের কাছে হাজির। নিহেড়ে লালপাতি মাচায় বিছানো থাকলেও একদম দেখে না। বরং রোদে দাঁড়িয়ে বাক্সের উপর সাজানো বই শেলটগুলো দেখে। অবাক চোখে কেমন সমীহ। বিমল দেখতে পেয়ে বলে, এই স্বপন—

—কন ?

—লিখা পড়া শিখবি ?

—কখন শেখবো ?

—রাতে ?

—উঁহু। দাদার সঙ্গে সে ডিঙিতে যাই মাছ ধরতে?

—দুপুরে। মেয়েদের সঙ্গে?

—শেখবার পয়সা পামু কোন হানে? স্বপন নিরীহ গলায় সমর্পণ করে নিজেকে।

বিমল আশ্বস্ত করে, দুস্ পাগল! পুইস্যা কিসের?

কালো চেহারায় গোল মুখ। চকচকে দু-চোখে তের চোদ্দর কিশোর?

বিমলের প্রশ্রয়ে বাইরের রোদ থেকে আড়তের চালার মধ্যে ঢোকে। ছায়া পেয়ে আরাম। বাচ্চা মেয়ে মণিকে নামিয়ে বালিতে হাঁটু গেড়ে বসে। খালি দেহে গা-ময় কালো। সরু চেনের সোনালি হাবে তিনকোণা লকেট। বাক্সর একটা বই হাতে নিয়ে স্বপন পাতা ওল্টায়। বর্ণগুলো দিক পালটে তার চোখের সামনে। ছবির আকার দেখে বইটাকে অবস্থানে এনে বিস্ময়ে দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবির মধ্যে ঢুকে কেমন আনচান করে ছেলেটা। চকিতে ছবির মধ্যে কাগজের নৌকো ভাসানো ছেলেটাকে দেখতে পায়। মোটা স্কেচে ছেলেটার মুখ তার হৃদয় বিদ্ধ করে। জাগিয়ে দেয় নিজের হারানো কত কী যে…!

—হই তোর মা-বাবা আছে?

স্বপন চোখ ফেরায়। একটা ঘোরে এতক্ষণ তলিয়ে গেছিল! খেয়াল হলে বলে—না।

—তারা কোথায় থাকতো?

—বাংলাদেশে।

—কমলাপতি বুড়ি কে হয়?

—আমার মা। পালছে তো— ?

তখন চারকপাটি লক গেটের চওড়া বাঁধের উপব মুখ বাঁধা বস্তা ঝুলিয়ে জোরে জোরে হাঁটে। গলা বেড় দিয়ে টিনটার দু-পাশে ফিতে ঝোলানো। টিনের গা-কেটে কাঁচ বসানো। টিনের ভিতরে পদার্থটা দৃশ্যমান।

ঢালু বেয়ে নামতে গিয়ে বাঁ-হাতে ঠাকুর পুজোর আরতি ঘণ্টা বেজে ওঠে ঠনু। শেখ সামাদের হাতে।

যেহেতু এখনও ফাঁকা নির্জন চর, বাজনাটা অনেকক্ষণ চরের বালি মেখে এগোয়। শেখ সামাদ বালির উপর হাঁটে। মোটা সোলের হাওয়াই চটির গোড়ালি পা থেকে সরে সরে যায়। শুকনো বালি রোদ পেয়ে মিহি। নরম।

বালিচরের হঠাৎ-কলোনি। গায়ে গায়ে ছাউনি ঘিরে ঘন ঘিঞ্জি। শেখ সামাদের কাছে হাত ঘণ্টা। একটু নাড়াতেই ঠং ঠং বেজে ওঠে। বাজনাটা প্রথম ছাউনি ছাওয়া থেকে পার হয়ে এঁকে বেঁকে, এঘর ওঘর পাশ কাটিয়ে খানিক দূরে। ঘর বারান্দা পার হয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো বাইরে আসে। উঠোন দাওয়ায় এখন রোদ। রোদ আঁকাবাঁকা লাঠি খুঁটির মাচায়। মাচায় শুটকি মাছে রোদ গেঁথে থাকে।

বাচ্চা ছেলে দীনু এক লাফে বাইরে এসে ঘণ্টাবাদককে খোঁজে, পায় না। অথচ কোন ছাউনির পাশ থেকে যে ঘণ্টার আওয়াজটা আসছে। যেহেতু চোখের

আওতায় ঘণ্টাবাদক তখনও আসেনি। দীনু ছুটে ঘরের মধ্যে ঢোকে। এক কোণে গুছিয়ে রাখা টুকরো পলিশিটটা আর ছেঁড়া জাল বুকে আঁকড়ে অমূল্য সামগ্রীর মতো নিয়ে আসে। রোদে হঠাৎ-কলোনির ছাউনি খড় ছেঁড়া তেরপোলিন হোগলা স্পষ্ট হয়ে গায়ে গায়ে বালির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ছাউনি চালার ছাঁচ কাটিয়ে শুটকি মাছের নড়বড়ে মাচাতলার পাশ দিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরে। শেখ সামাদের কাঁচা পাকা দাড়ি। লুঙ্গির উপর একখানা সুতির মোটা ফুল হাতা গেঞ্জি। গলা বেড় দিয়ে পুরনো মাফলার।

বাচ্চা ছেলে মেয়েরা ছেঁড়া হাওয়াই চটির টুকরো, পলিথিন প্যাকেট হাতের মুঠোয় মুচড়ে এনে দাঁড়ায়। ঘণ্টাবাদক জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে গোটা কলোনিকে শোনায়। পিলপিল করে বাচ্চারা ছুটে আসে। হাতে ছেঁড়া জাল। ট্রলারের ফেলে দেওয়া ফাটা পলিথিন পাইপ জংধরা পেরেক।

বাচ্চা ছেলে মেয়েরা ঘিরে ধরে। শেখ সামাদ কাঁধের বস্তা বালিতে নামায়। গলা থেকে ফিতেয় ঝোলে কাঁচ লাগানো টিন। টিনের মধ্যে সাদা গোলাপি রঙ লাগানো শণপাপড়ি ফুলে ফেঁপে এক তাল।

বাচ্চা ছেলেটা দুটো পলিপ্যাকেট নিয়ে কচি হাত বাড়ায়, এই যে লও—

শণপাপড়িওলা সামাদ প্যাকেট দুটো বস্তায় রেখে বলে, হাত পাতরে বাওয়া—

বাচ্চা ছেলেটা অনেক আশায় দু-হাত কোষ করে পাতে। শণপাপড়িওলা টিনের ডালা খুলে এক চিমটি গোলাপি শণপাপড়ি দেয়।

বাচ্চাটার মুখ কালো। বলে, এই টুকা—

—আবার চিকাচিকা যোগাড় করু কাল অনেক দুবো। আশ্বাস দিয়ে সামলায় বাচ্চাটাকে।

খালি গায়ে সুবল ছেঁড়া জালটা নিয়ে হুড়োহুড়ি করে।—এই লও। আমাকে দিবে তো—

শণপাপড়িওলা জালটার পরিমাণ, ওজন আন্দাজ করে আধ মুঠো শণ-পাপড়ি হাতে দেয়।

সুবলের জোড়া চেটোয় মিঠাইটুকু যৎসামান্য। এখন বলে, আর একটু দিবে নি ?

—অনেক দিছি তোকে। থামু, বলে মৃদু ধমক দেয় শেখ সামাদ।

বাচ্চা ছেলে মেয়েদের এমন হইচই দেখতে মায়েরা রান্না ছেড়ে বালির উঠোনে। রোদে পোড়া ফরসা মুখ তামাটে শণপাপড়িওলার। কাঁচা পাকা দাড়ির গোড়ায় নোনা ঘাম। নোনা জল নোনা হাওয়ার ভু-খণ্ডে। হাতের ঘণ্টা জোরে জোরে নাড়ে। ঠং ঠং বেজে ওঠে কলোনির হাওয়ায়। ছাউনি ছাওয়ার চট, হোগলা দেওয়ালে সে শব্দ থমকে থাকে খানিক।

বাচ্চা মেয়ে মণিকে কোলে নিয়ে তের চোদ্দ বছরের স্বপন। চকচকে চোখে দেখে শণপাপড়িওলার বাক্স। সব সময় হাতের ঘষায় হাত ঘণ্টাটা যেন নতুন।

ছেঁড়া জাল কালো পলিশিট কাগজটা বুকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্রক গায়ে লক্ষ্মীটা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে বেকুব। খালি হাতে বন্ধুদের মিঠাই খাওয়া দেখে। দীনু প্রথমে ছেঁড়া একটুকরো সবুজ নাইলন জালটা বাড়িয়ে দেয়, এই যে লিবে ?

শণপাপড়িওলা দীনুর বুকে কালো পলিশিটের এক খামচা কাগজ দেখতে পেয়ে বলে, উটা দিবো নি ?

—হুঁ। আগেবটার শণপাপড়ি দাও, শিশু গলায় আবেদন।

বাচ্চাদের ভিড় ঠেলে লক্ষ্মীটা আসে। দু-হাতে সরু কাঁচের চুড়ি। রুখু সুখু চুলে কচি মুখ। ভারতীয় শিশু। শণপাপড়ির গন্ধে টাকরা ভিজিয়ে জল। নিজের হাতে দ্রব্যটি পাওয়ার আকুল বাসনা। দীনুর গায়ে হাত দিয়ে বলে, আমাকে কাগজ দিবি কইছিলি, দিবো নি ?

বাচ্চা মণিকে কোলে তের চোদ্দ বছরের স্বপন দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীকে দেখে। দেখে দীনুকে।

দীনুর মা কাছে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মী বলে, কইরে—একটু কাগজ ছিঁড়া দেনা—

দীনু কাগজটা ধীরে ধীরে বুক থেকে হাতে নামায়। হাত আলগা দিতে কুণ্ঠন মেলে খানিক প্রসারিত হয়।

শণপাপড়িওলা বলে, ও কচি—ওই কাগজটা দিবো রে ? অনেক শণপাপড়ি পাইবি—

শিশু দীনু হস্তগত জিনিসটা আর শণপাপড়িব প্রলোভনে দ্বিধাগ্রস্ত। লক্ষ্মীটা আবাব ধাক্কা দেয়, কইরে—দিবি কইছিলি···

—এই মেয়েছেলা। কি রে ? দীনুর মায়েব ধমকে শিশু লক্ষ্মী চমকে ওঠে। দীনুর তোলপাড় খানিক কমে। ফট করে কাগজটা সব বাড়িয়ে দেয় শণপাপড়ি-ওলার দিকে। খুশি হয়ে শেখ সামাদ বস্তার মধ্যে কাগজটাও সেঁধিয়ে দেয ?

মনমরা লক্ষ্মীর মুখ চুপসে এতটুকু। কলোনি পাড়ার খেলার সাথী দীনুটা তার কাছে ভয়ঙ্কর রাগের, ঈর্ষার সঙ্গী হয়ে যায়। মনে ভাবে, আর কক্ষণো ওর সঙ্গে খেলা নয় !

চকচকে চোখে স্বপন দেখে লক্ষ্মীর চোখ মুখ। লক্ষ্মী তাকিয়ে থাকে। টিন কাটা কাঁচের ওপারে মহার্ঘ দ্রব্যটুকু !

শণপাপড়িওলা বলে, কাইরে খোকা—?

কচি হাতের দু-তালু মেলে বাড়ায় দীনু, দাও। দিবে ? শেখ সামাদ টিনের ডালা খুলে এক থাবা সাদা শণপাপড়ি দেয় দীনুর হাতে।

হাওয়ায় ফুলে থাকে শণপাপড়ি। দীনু বলে, একটু লাল দিবে নি ?

শেখ সামাদ চোখ বড় বড় করে বলে, আরও—? আবার ডালা খোলে। গোলাপী রঙের শণপাপড়ি এক চিমটে তুলে বিব্রত। কচি হাতে যে রাখার জায়গা নেই ? পড়ে যাবে।

দীনুর মা ছুটে গিয়ে হাত পাতে, আমাকে দাও। ও আমার টোকা—

শেখ সামাদ গোলাপী শণপাপড়ি ধরে বিপন্ন। দীনু প্রতিষ্ঠা দিতে বলে,

হাঁ গো আমার মা—

স্বপন দু-চোখ ভরে দেখে দৃশ্যটা।

লক্ষ্মী সরে যায় দীনুর কাছ থেকে। দু-তালুর বস্তুতে দীনু মুখ ডুবোতে গিয়ে চোখে পড়ে শুকনো শুটকি মুখে লক্ষ্মী। কাছে গিয়ে দীনু বলে, লক্ষ্মী লে। একটুখানি লিবি—কিন্তু—

লক্ষ্মী দীনুর হাত ভরতি শণপাপড়িতে আঙুল গেঁথে চমকে যায়, কতটা··· কতখানি···।

কালো চেহারায় চকচকে চোখে স্বপন দীনুর মার কাছে গিয়ে বলে, আপনের ছেলে···?

দীনুর মা চমকায়। স্বপনের দু-চোখে তৃষ্ণা। নিরুত্তর দীনুর মা।

রোদ মাথায় একলা হয়ে স্বপন বলে,—আপনাগো দ্যাশে মন সয় না···।

এক খাবলা শণপাপড়ি মুখে পুরে দীনুটা মায়ের কাছে দাঁড়ায়। মা দীনুকে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, রক্তের সম্পক্ক না থাকলি দেশের মাটি জলে স্বাদ লাগে···

(২৬)

অগ্রহায়ণের শীত চামড়া কেটে ভিতরে সেঁধোচ্ছে। ম্যানেজার ফুল সোয়েটার কানে মাফলার জড়িয়ে হিসেব লেখে। পাশে নারান শী খাতা বের করে দেখায়, কে কত রোজ কাজ করেছে।

শেখচাচা জেনারেটার চালায়। ভট্ভট্ শব্দ হয়। সাবাড়ে আলো জ্বলে। মেয়ে লেবাররা সাবাড়ে বিছানো লালপাতি মাছ পাটোয়া দিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে। জগন্নাথ ধীরে ধীরে বেলচা মেরে বড় ঝোড়ায় তুলে দেয়। ঝোড়ার গায়ে লাঠি বাঁধা। সামনে দুজন, মলিন আর গণেশ। পিছনে দুই ভড়বড়ে বউদি।

মলিন, গণেশ ভারী ঝোড়া ধীরে ধীরে বয়ে চলে, পিছনে লাল কলোনির বউদিরা বলে, ও ভাই একটু পা চালিয়ে চল। ঘরে সন্ধে দুবনি ?

পুজারী গোপাল বেরা মন্দিরে প্রদীপ জ্বালায়। একগোছা ধূপ বালিমাটির মেঝেয় গেঁথে দেয়। ঝাঁঝে কাঠি মারে। কাঁসার ঝাঁঝ ঝম্‌ঝম্ বাজে। গ্রীষ্ম-বর্ষায় হু-হু ঝড়-বৃষ্টি দাপিয়ে যায় ফাঁকা চরে। এখন ঝাঁঝের বাদ্যিতে দেবস্থান। মানুষের জীবিকার আস্তানা। মাটির ধুনাচিটা নিয়ে রান্নাশালে যায়। জ্বলন্ত কাঠের টুকরো চিমটে দিয়ে ধুনাচি ভরায়। গনগনে আগুন। একমুঠো ধুনো-গুগগুলের গুঁড়ো ঢালতেই ভরভরে ধোঁয়া। প্রথমেই বিশালাক্ষী দুর্গা মা গঙ্গাদের সামনে দিয়ে পরে অফিসঘরে ক্যালেণ্ডারে দেবতাদের আরাধনা করে। ঘুমন্ত মাছির ভনভন শব্দ। পরক্ষণেই নেতিয়ে যায় মাছিগুলো। ধোঁয়ায় শুটকি গন্ধ খানিক দমিত।

পুজারী গোপাল বেরা অফিসঘর থেকে গোটা চালাটার সামনে ধুনাচি

ঘুরিয়ে সমুদ্রমুখো দাঁড়ায়। দূরে সমুদ্রের নোনাজলের ফাড়ে ভাসছে যে মানুষগুলো—তাদের শুভকামনায় মহাসমুদ্রকে গড় করে। মিন্টু দাস চটি খুলে মন্দিরের উদ্দেশে হাত জোড় করে মাথা নোয়ায়।

শেখচাচা থমকে দাঁড়িয়ে বুকের কাছে হাত রেখে কী যে বিড়বিড় করে! গা থেকে পাড় খসা চাদরটা হড়কায়।

আটহাতি কাপড়ে কাছা দিয়ে সামনে কোঁচা। মোটা সুতোয় ন-দণ্ডি পৈতে। ডানদিকের কোমর বেয়ে নীচে। গায়ে একখানা ছেলেমানুষি চাদর। হাতে পিতলের ফুলসাজি। সাজির ছোট্ট বাটিতে চন্দন। তুলসী পাতা, ফুল একমুঠো। দু-ব্যাটারি টর্চটা নিভনো। মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়। তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলেমানুষ ব্রাহ্মণ। মন্দিরে ঢুকতেই মিন্টু দাস শুধোয়, হ্যাঁ ঠাকুরমশাই—

দাঁড়ায় ছেলেমানুষ ব্রাহ্মণ।

—তুমি এই সন্ধ্যায় ?

—দুপুরে আসতে পারি নাই গো বাবু ?

আর দেরি না করেই মন্দিরে ঢোকে। সকালের জল-থালাবাসন সাজানো। পুজোয় বসে ছেলেমানুষ ব্রাহ্মণ।

জলধর খাতা সাবতে সারতে বলে, ও নারানদা—মেয়ে লেবারদের হিসাব ?

নারান শী খাতাটা টেনে নিয়ে অপর পৃষ্ঠায় দেখায়, এই যে ছক। নামে নামে দাগ মারা।

—আর যারা মজুরি না লইয়া ঝোড়া ভরতি মাছ নেসে ?

—ও। ফেরকা ? তাদের নামের পাশে শূন্য লিখা—

জলধর ধমক দেয়, দুস্। ওইভাবে খাতা ল্যাখে ? নামের পাশে একটা 'ফ' ল্যাখবে—

সাবাড়ময় আলো। লেবার বউ-মেয়েরা অফিসঘরের সামনে দাঁড়ায়। হাতে যে যার 'পটোয়া' বাতা।

কপালে টকটকে লাল সিঁদুরের বড় টিপ। কুচকুচে কালো মুখে চওড়া কপাল। বড়সড় ভারী মুখ। হাতে শাঁখা-চুড়ি ভরতি। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর নখ-বরাবর ফাটা। শুটকি মাছের কাঁটা ফুটে সামান্য ক্ষত। চোদ্দো-পনেরো বছরের লাল-হলুদ ফ্রক পরা মেয়েগুলো বউটাকে বলে, ও মাসি—সদ্দারকে ডাক দিবে তো ?

বউটা সমর্থন পেয়ে হাঁকে, কাই গো বাবু—তোমরা কি খাতায় হাজিরা লিবে ? না ঘর যাবো ?

নারান শী-র কানে লাগতেই ফিরে তাকায়। বউ-মেয়েদের দেখে খাতাটা চায়। ম্যানেজারের হিসেব লেখা থেমে যায়।

নারান শী খাতাটা নিয়ে আড়তের চালার বাইরে। জোরে হেঁকে ওঠে, উফ্ একটু আর দেরি সইছেনি ?

বউটার সঙ্গে অল্পবয়েসী মেয়েগুলো দোহারকি দেয়, আমরা ঘর যাবুনি ?

—ও। ঘর যেন বিশমাইল গাঙ পারিয়ে? সাবাড়ের বেড়া টপকাইলে কলোনি ?

হলুদ ফ্রক পরা চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়েটা বলে, অঁ। কত রাত হইছে দেখছো ?

নারান শী মেয়েটার ছটপটে চোখমুখ দেখে তারিয়ে তারিয়ে।—তোরা কি জলে পড়ছ্যু না বাঘে ধরছ্যে ?

—হাঁ। তোমার কি গো নারানদা ? আড়তের রান্না হচ্ছে খাইতে বসবে। আমানে রান্না বসাইতে হইবে। বাসন মাজতে ধুইতে বাকি—, বলতে বলতে মাথার চুল খুলে বিনুনি বাঁধে ফ্রক পরা মেয়েটা।

নারান শী খাতার পৃষ্ঠা খুলে মেয়ে লেবারদের হাজিরার তালিকা বের করে। প্রথমের নামটা পড়ে মিল খায় না মুখরা কিশোরীর সঙ্গে। তাই ঠাট্টা করতে বলে, বাপু রে! যেন তিন ছেলেপুলের মা-গিন্নির সঙ্গে কথা কইতেছি ?

মেয়েটা হাসে, লজ্জায় বউদির পেছনে দাঁড়ায়।

বউদি দাবড়ি মারে, রেখা চুপ যা—। হাজরে লিক বাবুটা—

নারান শী চেঁচায়, লক্ষ্মী—

মেয়েটা বলে, আছি গো।

নারান নামের পাশে লেখে এক সংখ্যাটা।

—সরলা ?

বউদি বলে, কেনি গো, আমাকে চিনোনি ?

—তা হউক ডাক সাড়া দিতে হইবে।

—স্বপ্না ?

—আছি।

—গিরিশ ?

কালো হাড়গিলগিলে ছেলেটা দাঁড়ায়,—আছি।

নারান শী ধমকায়, তুই কি থালা মাজবি ? না, রান্না করবি ?

—না। ছেলেটা সরলভাবে উত্তর দেয়।

—তবে যা, আর একটু কাজ তুল ?

খিলখিল করে হাসে মুখরা মেয়ে রেখাটা। সান্ত্বনা—একলা দাবড়ি খায়নি। একজন বেটাছেলেও সন্দারের দাবড়ি তো খেল!

মলিন ফিসফিস করে বলে জগন্নাথকে, কইলুম হাড়গিলে, অখন যাবোনি রে শালা। লে মেয়েমানুষের সামনে বেইজ্জত হও।

মেয়েদের ভিড় কাটিয়ে ছেলেমানুষ ব্রাহ্মণ ভেতরে ঢোকে। কাঠির ডগায় চন্দনের ফোঁটা। মালিকের কপালে দিয়ে আবার কাঠি ঠেকায় চন্দন-বাটিতে। জলধরের কপালে দিতেই এই শীতে ছ্যাঁক করে লাগে। ছেলেমানুষ ব্রাহ্মণ চমকে যায়! ভাবে, মিশ্টুবাবু ফোঁটা লিয়া দেবতারে গড় জানাইলে। আর জলধর-বাবু? নিজে মালিক হইলে···! দৃশ্যটায় খানিক জোর পায় ছোকরা ব্রাহ্মণ। সরাসরি মালিককে বলে, বাবু—আমানে একশ টাকা অগ্রিম দিবেন ?

মিন্টু দাস মুখ নিচু করে শুধোয়, ক্যান ? কি অইব ?

—বাবার বড় অসুখ।

—ক্যান ? দ্যাখসি পূজা কইরতে নির্মলবাবুর আরতে ?

—দু-তিনদিন আগে দেখছেন। অউখানে পূজা করি তবে বাড়ি যাবু গো —বাবু ?

নিজের পকেট থেকে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে মিন্টুবাবু হাঁক দেয়, ও জলধর ?

—মেঝদা ?

—ঠাকুর মহার নাম বরাবর একশ টিয়া লেইখ্যা রাখবা তো। সারে সাতশর মইধ্যে একশ।

এই রাত্রিতেও মাছি গালের উপর বসে। হাত ঝাপটায় তাড়ায়। হোগলার গায়ে মাছিগুলো ঝাঁক বেঁধে ঝিমোয়। আলগা কাচের গেলাসে সাত-আটখানা মাছি ডানায় জল জাপটে মরে আছে। পাশের ঘরে গো-ডাউন। শুকনো মাছের ছোট-বড় বাণ্ডিল। বোটকা মেছো গন্ধ ভরে থাকে। গন্ধ তো নয় সৌরভ। উপার্জনের। অর্থের।

ছেলেমানুষ ব্রাহ্মণ চলে যেতেই নারান বলে, ওই কচি ব্রাহ্মণ তিন বাপবেটায় দুই বছবে চাব বিঘা জমি কিনছে—

—হ। কিনবে। দশ বারোখানা আরতে, সারে সাতশ হইলে তো অনেক টাহা ?

লাল কলোনির চালায় চালায় উনুন জ্বলে। ভাত ফোটে। আনাজপাতি সিদ্ধ হয় ডালপালার আগুনে। চালার সামনে কাঁচা বাইন বগড়া ডগের ডাঁই। শীতের রোদে শুকোয়। উঠোনে ছোট ছোট মাচা। পড়তি-ঝড়তি ভোলা রাঙি চিংড়ি দু-চারখানা, লতলতে নিহেড়ে গালাসি কেটে শুকোয় মাচায় মাচায়।

লাল কলোনির একান্ত আড়াল ঝুপসি চালায় দু-একখানা লম্ফো। বেশিরভাগ চালার রান্নাশাল, উঠোনে আড়তদারের বিনি পয়সার আলো। সাবাড়ের সীমানা বেড়ায় তিন-চ্যরখানা খুঁটিতে টিউবলাইট। আলো ছড়িয়েছে ফিশলটেব নোনা বাঁধ অব্দি।

লাল কলোনির মনমরা ভ্যাবলা যতীন চট বিছিয়ে হোগলাঘরের মধ্যে শুয়ে। ডানপাশে দাদার আট বছর বয়সী ছেলে বাঁপাশে দশ বছরি মেয়ে। ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে কাদা। মাঝে-মাঝে গামছা ঝাটকায়, মশা তাড়ায়।

শাশুড়ি জ্ঞানদা ঘড়ুই কটা রাঙি চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে এগিয়ে দেয়, বউমা লও গো। ইবার লবণ দাও—

কালো ফরসার ধারাধারি রঙ। খালি গায়ে লাল ছোপ-ছোপ শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে রান্না করে। লবণের মালাটা শাশুড়িকে ধরিয়ে দেয়, তুমি লও গো মা। আমি ভাতের ফেন গালাই।

—হ। খুশি হয় জ্ঞানদা ঘড়ুই। বউমার বিবেচনায় কৃতজ্ঞ সহায়-সম্বলহীন শাশুড়ি। টানা দুবছর বড়ছেলে ঘরে ফেরেনি। কষ্টের সংসারে নাতিটা তখন

দুবছর। মেয়েটা চার বছরে। বড়বউ বলেছিল, মা ইবার বাপের দোরকে চলি যাই ?

বুক কেঁপে গেছিল বুড়ি শাশুড়ির! এমন গায়ে-গতরে খাটুন্তে মেয়েছেলে বউমা…তাকে ভুলে আছে বড়ছেলেটা! কী এমন মেয়েমানুষ হাজিপুরের মেছুনি বিধবা মাগীটা! নিজের আঁতের রক্তে অমন নাতি-নাতনি দুটা। বুক কামড়ায়!

ঘড়ুইবউমা খেদে বলেছিল, এইখানে কি করবু গো আমি ?

—কেনি! আমানে সংসারে সংসার করবো ?

—না, বড়বউয়ের গলায় জেদ আর ব্যর্থতা।

ভয় পেয়েছিল ঘড়ুইবুড়ি।…একটু হলেও ঘরদোর। ছোটমত ডোবা, দু-চারখানা হাঁস-ছাগল…কাঠাচারেক ডাঙা চাষ! অমন খাটাখাটনির বউ…! বাধা দিয়ে বলেছিল শাশুড়ি বুড়ি, না কেনি গো বউমা ?

দেওর যতীন এসে দাঁড়ায়। চার বছুরে ভাইঝিটা কাকার লুঙির কাছে।

বড়বউমা বলেছিল, আমানে দ্যাখবেটা কে ?

যতীন দু-পা এগিয়েছিল, কেনি গো ? আমরা মরে গেছি ?

কালো ফরসার ধারাধারি গোল মুখ। চকচকে দু-চোখ কুল পেতে আমরণ তাকায়। খপ করে দেওরের হাতটা ধরে, দেখবো ? ঠিক নিজের মতো একলা করে দেখবো ? কও…কইবে তো…। চার বছুরে মেয়েটা কাকার লুঙি খামচে হাঁটু আঁকড়ায়।

শাশুড়ি বুড়ি জোয়ান ছেলের বিপন্ন একাকিত্ব দেখে। নিজের বুড়ি চোখে মেয়েমানুষের আনচান। বড়বউয়ের চোখের ভাষা চিরে চিরে নজর করে। রক্তের নাতি-নাতনির কাতর মুখ ছেয়ে যায়। আশ্বাস দিয়ে ঘড়ুইবুড়ি বলেচিল, হুঁ। নিজের মতো করে একলা হয়ে দ্যাখবে—

বউটা গোল মুখে ঝলকে উঠেছিল। প্রশ্রয়ে…প্রতিশ্রুতিতে।

তাগড়াই যতীন তখন মরমরা ভ্যাবলা…!

ভাতের ফেন ঝাড়া হয়ে গেলে বড়বউমা পেছন ফেরে, কাঁই গো মা চিংড়িতে লবণ দিছো ?

চকিতে সম্বিৎ ফেরে। বুড়ি বলে, হুঁ গো বউমা। লও—।

বাটিটা এগিয়ে দেয়। হোগলাঘরে গামছা ঝাটকায় মশা তাড়ানোর শব্দ। কড়ায় মাছ বসিয়ে মটমট শুকনো পালা ভাঙে ঘড়ুইবউ। মেটে হাঁড়ির উনুনে জ্বালুন ঠেলে দেয় একটা একটা। তরকারিতে ফুট ধরে। বুটবুট শব্দ হয়!

বুটবুট করে ঘড়ুইবুড়ির মনে। জানতে চায় বুড়ি, বউমা—

—কি কইছো ?

—মিন্টুর আড়তে তোমার কয় রোজ হাজিরা হইছে গো ?

ঘড়ুই বউ জ্বালুনটা ঠেলে। অঘ্রানের শীত। উনুনের তাপ গায়ে-বুকে। পা-দুটো আলগা হয়ে হাঁটু অব্দি উদোম। গোলগাল ভরা মুখ। হাঁটুর উপর ডান গালটা এককাত রেখে শাশুড়ির প্রশ্নটা শোনে। বউয়ের মনে লাগে,…

শাশুড়ির মনে ব্যথা নাই। শুধু ভয়…আমি সংসার ছাড়ি যাইলে ওদের খাটুনেতে লোকের অভাব পড়বে। সো জন্যে গিরা বাঁধতে শুইতে দেয় দেওরের সঙ্গে বড়ছেলের ফাঁক মেজছেলে ভরায়। লাতি-লাতনির যে বাপ আর বাপ নাই… ছোট বয়সের বিয়া হওধা বউ—এই বয়সে বর নাই—কাছেও নাই…। বুড়িটার কণ্ট নাই গো…! হিসাব করে…মেজছেলেকে খাটিয়ে হিসেব চায়।

বড়বউ মিয়ানো গলায় পুড়তে পুড়তে বলে, নারানদা কইছিলো খাতা ধরে —ওই পনেরোটা কি ষোলোটা। খাতায় লিখা আছে—

—তার এক রোজ তো ইউনানের চাঁদা? বুড়ি মনে করিয়ে দেয়।

—হুঁ।

—ওর তো সতারো না আঠারোটা?

—কার?

—তোমার দেওরের?

চমকে যায় বউমার বুকের ভিতর। ভাবে, ক-বছর তো একসঙ্গে শোওয়া-থাকা? অখনও দেওব…! মনটা ভারী হয়ে যায়। চুপচাপ বসে থাকে।

শাশুড়ি বুড়ি পরামর্শ দেয়, ইবারে মাছ লও। মজুরি থাক—দুটা শুকনা শুটকি করে বেচতে পারবো। সো কলোনিতে দোকান বুসছে—

—হুঁ। লুবো, আশ্বাস দেয় বউটা।

এক ছাউনি, এক দোর। এক বিছানায় শোয়। শীত ঘন। রাত গভীর হয়। শেখচাচার জেনারেটর চলে। শব্দ হয় ভট্‌ভট্‌…।

দূর ছাউনি চালায় মরা ব্যাটারিতে রেডিও কঁকায়। পাশ ফিরতে শাঁখা-চুড়ির ঠুন্‌ঠান্‌। স্বল্প উপাদানে জীবনধারণ। লাল কলোনি বালিচরে ঘুমোয়।

কম্বল-কাঁথায় পা ডোবাচ্ছে। লেপের মধ্যে কোমর সেঁধিয়ে সিগারেট টানে মিন্টু দাস। খাওয়ার পর ব্রাশ ঘষছে জলধর। পলিথিনের জগের ফুটো দিয়ে দু-তিনখানা মাছি জলের মধ্যে। জলধর সমস্ত জল ফেলে দিয়ে আবার নতুন গড়ায়।

'ভি' বর্ণ গেটের নীচে এক মানুষ ঢোকে।

কানে-মাথায় মাফলার জড়িয়ে বুড়ো ধীরু দাস। হাতে একখানা গেঁটে লাঠি। নারানের বেড়ার গায়ে ঝোলে ছুরি মাছ বড় ভোলা নিহেড়ে। রাত গভীরে চুরি যায়। কচি কচি বাচ্চারা চুপিসাড়ে আসে। তাই ধীরু দাস পথ রুখে জিজ্ঞেস করে, কে? কোন জনা গো?

—আমি।

—কে আমি? কইবেন তো?

—আচ্ছা কইবো নে। মিন্টু আছে?

—দেহেন আরতে, ধীরু দাস আহত গলায় বলে। শীতের হাওয়া। আবার নাক-মুখ ঢাকে পুরনো ছেঁড়া মাফলারে।

ভেতরের আলো নিভিয়ে দিলেও হোগলা বেড়ার ফাঁক গলে আবছা

স্পষ্টতা। সাবাড় আলোময়। চেনা যায় কোনটা কার বিছানা। কে কথা বলে, কে পাশ ফেরে।

মিলন ফিসফিস করে বলে, চিকচিকা কাগজটা? হই জগন্নাথ?

জগন্নাথ পাশ ফেরে, বালুশের তলায়।

—হেই।

—কি?

—আমি যাবো? বিড় বিড় করে পাশাপাশি দুইজনে।

—যাবি—তা যা—

উলটো দিকে পাশ ফেরে। মলিন বুক চিতিয়ে শুয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ে না। শেডের মটকায় হাতলে দড়ি গলানো জালভাসি সাদা বল ঝুলছে, যে-যার পরিমাণমত লবণটুকু নিয়ে। জালের বল সমুদ্রে ভাসে। ছাঁদি জালের গারোয়ান দড়ির রেখা বুঝতে। মলিন চটের বিছানায়…সে ভাসে থির চোখে নিজের ভাবনায়। মাঝে মাঝে উত্তাপে দোল খায়। গায়ের রক্তে ঢেউ ওঠে…।

আড়তমুখী রাস্তার দু-ধারে গরানবাতার বেড়া। বড়-ছোট দুই সাবাড় ঘেরা। লম্বা লম্বা রুপোবটি মাছ গরানবাতায় এপার-রপার হয়ে ঝুলছে। পায়ে পায়ে এলোমেলো বালি। বালি ভেঙে হাঁটে। পাশ গাঁয়ের কুকুর দুটো আড়তের ভাত-পানতা খেয়ে ধামসা। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ ডাকে। জলধর মুখে জল পুরে ফেলে দেয়। হাঁক দেবে, কে? তখনই মানুষটা চেঁচায়, মিন্টুবাবু—আছো? ঠোঁটের সিগারেট সরিয়ে জানতে চায়, কে আপনে?

—দামোদর।

—আরে! আয়েন—

বড় ঝাউখুঁটির দুখানা ফ্রেমে বড় সাইজের পাল্লা ঝোলে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাতলা চটের বস্তা পাঁচ-ছখানা হোগলা বেড়ার গায়ে। দামোদর ধীরে ধীরে অফিসঘরে ঢোকে।—আমাকে চিঠি দিসেন?

—হাঁ। দিসি। বিনয় দাস কইসে, আপনে তার লোক তুলসেন?

—হ্যাঁ নিসি।

—ক্যান?

—উই লোক যে আমার তন চোদ্দোশ টাহা দাদন নিসে—

—তাই! বিস্ময়ে মিন্টুর গলার স্বর বদলায়। পরে বলে, বিনয়ের তন আঠারোশ টাহা নিসে যে…

দামোদর বিস্ময় দমন করতে বলে, লইতে পারে—। অ্যাহন কি করবা?

—সমিতির মিটিং অইব। অ্যাহন থ্যাকসেন চরে? না চলি যাইবেন আবার?

—না। আরতে অনেক কাম আছে।

দাঁত-মুখ ধুয়ে অফিসঘরে ঢোকে জলধর। জিজ্ঞেস করে, দামোদরবাবু?

—কন।

—ফাড়ে ছিলেন?

—হয়। কয়দিন তো গোছ কুপছি ফাং বাঁশ বানছি। মাছ হয় নাই—

কথাটায় মিন্টু দাসের মুখ শুকিয়ে যায়। নিজের লোকজন তো কিছু মাছ পাঠিয়ে মাঝ-সমুদ্রের ফাড়ে ভাসছে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকায় দামোদরের দিকে। তখন বাকি কথাটা শুরু করে, দুই দুইবার ফাড় বদল কইর‍্যা মাছ পাইছি। তারপর আইলাম—

মিন্টু দাস সাগ্রহে শুধোয়, মাছ পাইসেন?

—হয়। পাইসি—

—কয়খান ট্রলারে মাছ পাইসেন?

—একখান।

উৎকণ্ঠা চারিয়ে যায় মিন্টু দাসের বুকের ভিতর। একচালান মাছ পৌঁছিয়ে চাল মশলা ডিজেল নিয়ে গেছে মাঝি বিলু দাস। মাঝ-সমুদ্রে জাল পেতে ষোলোজন ডিঙির উপর। নোঙর গেঁথে ট্রলার দোলে। গোটা আয়োজনটা এককথায় 'ফাড়'। জানতে ইচ্ছে মিন্টু দাসের। উত্তেজনায় কোমরের লেপ সরিয়ে সোজা বসে। আগ্রহ দেখায়, ওহ্যানে মাছ কি রহম? আমাগো ট্রলারের লোকজনের সঙ্গে দেহা হইসে?

—আসবার সোময় দেহা হইসিলো?

—আমাগো জালে মাছটাছ পাইসে?

—হয়। মাছ ওঠসে।

খুশি হযে মিন্টু দাস নড়েচড়ে। মাচা খচ্‌মচ্‌ বাজে। বলে, তয় হইলে হ্যারা কি আজগো আইবে?

—হেয়্যা তো কইতে পারুম না।

জলধর লেপমুড়ি দিয়ে শোনে। দুই মানুষের কথা থেমে যায়। সাবাড়ময় আলো। শেখচাচার জেনারেটার চলে। ভট্‌ভট্‌ শব্দ। গাঙ-কিনারে দামোদরবাবুর মাছ আড়তে যায়। ট্রলারের কেবিন মাথায় জোরালো আলো। সাদা বালিচরকে আরও সাদা করে দেয়। মিন্টু দাসের দেওয়া সিগারেট টানতে টানতে দামোদর বালিপথে হাঁটে। বালিচরে সাবাড়গুলো ঘিরে আলো। তারপর গ্রাম গাঁ, ফিশলটের ঝোপ জঙ্গল ডাইনে গাঙ সমুদ্র অন্ধকারে একাকার।

বাইন গাছটার মগডালে মৌর্য দাসের সবুজ নিয়ন আলো। সবুজ আলোটা দিগ্‌দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে। দামোদর একটু থমকে ভাবে, ওই আলোর দিকে আর কত্‌টা যাইলে আমার আরত চালা···!

লাল কলোনির চালা ঝুপড়িতে নরনারীর নিঃশ্বাসের শব্দ রাতকে আরও নিঃসঙ্গ করে তোলে। কিশোর-কিশোরীরা পাশ ফিরে শোয়। শিশু মায়ের বুক হাঁচায়। মানুষগুলো রাত্রির মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। শুধু রক্তপ্রবাহের মতো গাঙ সমুদ্র বেয়ে যায় বিশ্বচরাচরে। হঠাৎ শীতার্ত মৃদু বাতাসে একঝলক ঢেউ ওঠে চরকিনারে। চমকে জেগে যায় ঘড়ুইঘরের বড়বউমা। ডানপাশে মনমরা ভ্যাবলা দেওর যতীন, বাঁপাশে দশ বছুরে মেয়ে নীতু, নীতুর পাশে আট বছুরে ছেলেটা। তারপরেই বুড়ি শাশুড়ি জ্ঞানদা ঘড়ুই। বড়বউ পাশ ফিরে

যতীনকে জাপটে কানে মুখ লাগায়, হুই—

—কি ? অন্ধকার চালায় উচ্চারণ প্রাণ পায়।

—এই দুটা তো দাদার ? ফিসফিসিয়ে বলে বউটা।

যতীন উত্তর করে না।

—তোমার মতোটা তো কেউ নাই···

পাশ ফিরে মুখ দেখতে চায় বউদির। মুখে মুখে লেগে যায়।

—হস্‌পিডালের আর কিছু নাই···

—মা জাগবে যে, আতঙ্কে বলে যতীন।

—জাগুক। মা চায় তোমানে আমানে আরও এক হইতে···

—ছেলেমেয়েরা জাগবেনি···

—দিন দুপুর দাপিয়ে কাহিল।

বাঁধন আলগা হয়ে সতর্কতা বিলিয়ে দেয়। দুই নারী-পুরুষে স্ত্রী-পুরুষ হয়। আজ রাতের মুক্ত নৈকট্য কত রাতকে যে মুছে দেয়! নিজের মতো ফুটে যতীনের মন ভালো হয়। তলিয়ে যায় চরের রাতে। কাঁথা-কম্বলে অঘ্রানের শীত গড়ায়।

লেবার চালা অন্ধকার। আচমকা উঠে বসে মলিন। পাতা বিছানো পাতা থাকে। হোগলা চালার স্বল্প আলোয়, বাইরে জোরালো আলোর দিকে ভীষণ টান। বালিশের তলায় পাতলা পলিথিনের চিকচিকা প্যাকেট। দোকানে কেনা সাবান, চিরুনি, ভেজলিন, টিনের সুটকেসে। খালি প্যাকেটটা হাতে পায়। সরিয়ে রাখে ফিল্মি গানের দেড় টাকায় চটিবই। মলাটে গোলাপী রং। হেমন্তের মুখ।

গায়ের চাদর জড়িয়ে দাঁড়ায়। চিকচিকাটা পেটের গেঞ্জিতে। 'উঁ' নাদে যাতনা রচনা করে।

জগন্নাথ বলে, কিরা ?

—পেট পাকাইতেছে—

—তবে যা। বাহারে যা—

খালি পায়ে হৃষ্ট মন। চাদর গায়ে বড় বড় পা ফেলে। রান্নাশালের কোণে বেড়া। নিহেড়ে রুপোবটি শুকোয়। একমুঠোয় পাঁচ-সাতখানা মুচড়ে চিক-চিকায় ভরে।

ভাতের ফেন আনাজের খসা ফেলার গর্ত। আর একমুঠো শুটকি মাছ নিতে গিয়ে গর্তে পা পড়ে। পচা-রসায় হাজার মাছি ঘুমন্ত। পায়ের চাপে বোঁদকা গন্ধ। মাছিগুলো একসঙ্গে ভনভনিয়ে জেগে ওঠে। ভয়ে সিঁটকে পা সরায় মলিন। পিছনে তাকায়, এই শব্দে রান্নাশালে ঘুমন্ত পুজারী জাগছে নি তো···।

পলিথিনের চিকচিকাটা চাদরের তলায় নিয়ে বেড়া ডিঙোয়। লাল কলোনির মাটি। ছোট ছোট চালা ঝুপড়ি। বউ-বাচ্চার ঘরদোর। আড়মোড়া ভেঙে মেয়ে-

মানুষের গলায় হাই ওঠে। বুকে মচকায় মলিন। ক-ঘর ডিঙোলেই তো ফিশ-লটের নোনা বাঁধ।

বাঁধের ঢালু বেয়ে নীচে নামে। ডাইনে নোনা বাঁধের উচ্চতা-আড়াল দেওয়াল। বাঁদিকের ঢালুতল দিয়ে হাঁটে। জোরে জোরে হাঁটে। কাঁচা গেঁমুয়া ঝোপ, বাইনের ঝুপসি বুনো ঝাউয়ের ঝাড় রাতটাকে আঁকড়ে রেখেছে। ছেলে-বেলায় খেলাচ্ছলে অনাদরের গাছপালা যে এই ফিশলটটুকু পার হতে কত সাহায্য করে···! রাতের সামিয়ানার দড়ি টেনে রাখে বালিস্থানের কালীর ঝাঁকড়া বাইন গাছ ফিশলটের ঝাউ-গেঁমুয়া। ঝুলন্ত রাতের তল দিয়ে হাঁটে মলিন। পায়ের নীচে নোনা ধুলো ঢিল। হোঁচট খায়। সামলে নেয়। এক টুকরো কাছির আভাস। পাশ কাটাতেই পচা গন্ধ। জালের গাঙ বেঁড়ো রসে কটু গন্ধে জায়গাটা ভারী। দ্রুত পার হয়ে ওপারের বড় বাঁধে মলিন। বাঁধে দাঁড়িয়ে সামনে তাকায়। গাছপালার আঁধার ভেদ করতে পারলে দু-তিনখানা বাদা। তারপরেই তো নিজের খোড়ো ঘর। পাশ চালায় গোয়াল, তার পাশের ঘরে···। বুক নাচে। রক্ত ধাক্কা দেয় অন্ধিসন্ধিতে। একবার পিছনে তাকায়। ফিশলটের কুপকুপে অন্ধকার ঠেলে চর। চর ঘিরে সাবাড়ের বেড়া। বাইন গাছের ডগায় মৌর্য দাসের সবুজ নিয়ন। ভয়ংকর দাপটে জ্বলছে। ছুটে নামে বাঁধের ঢালে।

লেবার শেডে জগন্নাথ ঘুমোয়। আড়তের অফিসঘরে হোগলা দেওয়ালে কালী, গণেশ, রামকৃষ্ণ ক্যালেণ্ডারে চুপচাপ। বড় কাঠের সিন্ধুকের উপর এক-জগ জল। কাচের গেলাস উপুড় থাকে। দেবতাদের উদ্দেশে হ্যারিকেনটা মৃদু জ্বলে। মন্দিরের গায়ে খড় ছেঁড়া চটের উপর গাঁয়ের কুকুরটা সাবাড় মোনে।

ধানের জটার ভারে বাদার ধানগাছ নতমুখ। হিমে ভিজে শীত-জব্দ অন্নচারাগুলো। নিজের গ্রাম ফুঁড়ে ছোট্ট উঠোনে দাঁড়ায়। আত্মজনের গন্ধ নাকে লাগে। প্রায় দু-মাস এসব ছেড়ে বালিচরে। খিরিশ কাঠের কমজোরি দরজায় বালা নাড়ে, কাই গো ঘুমে গেছু ?

—কে ?

—খুল।

বউটা গায়ে-বুকে আঁচল জড়ায়। ওঘর থেকে বুড়িমা হাঁকে, কে রে মঙ্গলা ?

—তোমার ছেলে ?

—দোর খুল।

মলিন দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। রাতের গভীরতা মাপ করে। হাতের চিকচিকাটা এগিয়ে দেয়। কচি বউ আলুথালু গা-বুক। মোটা কাঁথার গরম ভাপ গায়ে। আলগা চুল, ঘুমে ফোলা চোখমুখ। মলিনের কপাল-গলায় ঘাম। বউটা আঁচল দিয়ে মোছে।

—এক গেলাস জল দিবে ?

—হুঁ। দিচ্ছি—

মলিন দাওয়ার মেটে কলসি গড়িয়ে একঘটি জলে পা ধোয়। চরের ধুলো

ধুয়ে সাফ করে। পরিষ্কার হয়। টুনটুনি বাতির উসকানো আলোয় গেলাসটা চকচকে। ঢকঢক করে জল খায়। একটু ধাতে এসে একদণ্ড থির।

বউটা বলে, খাবা হইছে ?

—হাঁ।

—তবে আইসো, গরম কাঁথা মেলে কচি বউ ডাকে।

মলিনের বুকে হাত ঢেলে দিয়ে কচি বউ বলে, আজ সন্ধে থিকে মন কইছিলো তুমি আইসবে। আর একটু আগে বারাইলেনি ?

মলিন ফিসফিস করে বলে, রাত থাকতি আড়তে চলি যাবু—

কথাটায় তড়িতাঘাত ! দুবাহু দিয়ে বাঁধে বউটা, না।

গাঁয়ের কুকুরটা দু মাসের ভাত-পান্তা মাছের কাঁটা খেয়ে তাগড়াই। ঘেউ ঘেউ শব্দে চেঁচায়। মানুষটার গায়ে একখানা মোটা গেঞ্জির উপর হাফ-সোয়েটার নোনাজলের হাওয়া-বাতাসে গায়ের চামড়ায় নুন পড়ে তামাটে। মাথার চুল উলুপ-ঝুলুপ। কটা, লালচে। মুখময় আকাটা দাড়ি-গোঁফ। বীভৎস রূপ দেখে তেড়ে তেড়ে চেঁচায় কুকুরটা। ডাক দেয় মানুষটা, ও জলধরবাবু—জলধরবাবু গো—ও

মুখের লেপ সরিয়ে মিন্টু দাস চেঁচায়, কে ? কেডা ?

—আমরা। ট্রলার আনসি—

—বিলু ?

—হয়।

—কয়খান ?

—দুইখানাই, বলতে বলতে হোগলার বেড়া পাশে সরিয়ে ঢোকে।

—মাছ পাইছিস ?

উত্তর না দিয়ে বিলু দাস নিজেই ব্যবস্থা করতে বলে, লাট লাগাইতে অইব। ওনেক মাছ—

মিন্টু দাস হাঁকডাক শুরু করে, ও নারান ও জগন্নাথ—লেবাররা সব ওঠ। ট্রলার আইছে—। মাছ লামাইতে হইব—ওঠ—, বলতে বলতে নিজের হাত-ঘড়িটা দেখে, তিনটে পাঁচ।

একেবারে ভরঘুমে আঘাত। ধড়ফড় উঠে বসে নারান। হাই তুলে চোখ কচলায়। মিন্টু দাস ব্যস্ত গলায় বলে, সব লেবারদের ডাকি তুলবা এহনি।

মিন্টু দাস লেডিস শালটা গায়ে চাপিয়ে সকলকে ডাকে। হাতের সিগারেট প্যাকেটটা বিলুকে দিয়ে বলে, ন্যাও। খাবা তো—

সিগারেট প্যাকেট হাতে নিয়ে বলে, ট্রলার খালি করলে সকালেই ফারে যাইবো—।

বিলুর কথা কানে সেঁধোতেই মস্তিষ্কে কাজ করে নতুন সিদ্ধান্ত। মিন্টু দাস পরামর্শ দেয়, নারান—লাল কোলোনির লোকজন মাইয়া লেবারদের কাজে ডাকবা তো—

শেখচাচা চার ফ্ুটে তিনখানা বাঁশের ত্রিভুজ ডগায় বাঁধা হোল্ডার-সহ লম্বা তার টেনে টেনে নিয়ে যায় বালিচরের নীচে। জল-কিনারা অব্দি। দ্ুশো পাওয়ার বাল্ব ঝ্ুলিয়ে দিতে বালির উপর আলো। শীত বাঁচাতে বিছানার কম্বলটা তখনও গায়ে। ব্ুড়ো মান্ুষ কম্বল গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গোটা সাবাড়, লাল কলোনি জেগে ওঠে। আড়তের লেবাররা হাফপ্যান্ট গায়ে গেঞ্জি চাপিয়ে শেড ছাড়ে! গো-ডাউনের কাছে এক কুইন্টাল মাছ ধরে বড় ঝোড়া যার নাম 'ঢোল', মাঝারি সাইজের ঝোড়া 'সাং', মাটিকাটার মতো ঝোড়া 'ফেরকা' উপর-নীচ করে সাজানো। চারখানা শক্ত কাঠ মেরে চতুর্ভুজ পাল্লা সাইজ। চার কোণ থেকে মোটা নাইলন কাছি বেঁধে ছ-সাত হাত বাঁশের মাঝখানে বাঁধা। এটাই 'লাট'।

ছোকরা লেবারদের হাতে বাণ্ডিলখানেক বিড়ি ধরিয়ে নারান শী বলে, যা ভাই যা। জলদি কাজ সার—

ট্রলারের কেবিন থেকে আলো। ট্রলারের ডেক বিছিয়ে লালপতি ভোলা নিহেড়ে র্ুপোবটি মরা কামট হাঙর। বেলচা মেরে ভরতি হয় বড় বড় ঝোড়ায়। মাথায় করে ঝোড়া উঁচু ট্রলার থেকে নামে জলভাসি ডিঙিতে। এক-দ্ুবার লগি ঠেলতে মাছভরতি ঝোড়াগ্ুলো নিয়ে ডিঙি ঠেকে ক্ুলে। তারপর চাব কোণ কাঠের মধ্যে বড় 'সাং' ঝোড়ার মাছ ঢেলে 'লাট' বয় সামনে-পিছনে দ্ুই ছোকরা। শেখচাচার আলোয় বালিপথ পরিষ্কার। ছোকরা লেবার কোমর দ্ুলিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ছ্ুটে ছ্ুটে আসে। ঢেলে দেয় সাবাড়ের উপর। চকিতে র্ুপোর স্ত্ুপ।

ক্রমশ রাত ফ্ুরিয়ে যায়। অনেক মাছ···! সকালেই ট্রলার ফাড়ে যেতে চায়। মিন্ট্ু দাস লেবারদের বলে, হেই—গাঙেব জল কমছে। তোরা 'সাং' লইয়া ট্রলারেব তন যা—

মালিকের কড়া নির্দেশ। ছোকরা কজন মাঝারি সাইজের ঝোড়া নিয়ে প্রথমে পা-ডুবি নোনাজলে নামে। শীতের রাতে নোনাজল ঠাণ্ডা। আর-একট্ু এগোয় পায়ের গোছ ডোবে। শেষে উর্ুর নরম মাংসে নোনাজলে শীত কামটের মতো কামড়ায়। মাথার খালি ঝোড়া ট্রলারের লেবার টেনে নেয়। ঝ্ুলিয়ে ধরে মাছ-ভরতি ঝোড়া, কি রে মাথায় ঠেকছো?

—হ্ঁ।

—হাত ছাড়ি?

তখন মান্ুষের চলাফেরা চলকানি জলে কোমর বরফ ঠাণ্ডা। মাথায় ভার। জল ঠেলে ভার বয়ে ক্ুল। হাওয়ায় শীত। কোমর দোলায়। নাচের ভঙ্গি আনে, গোটা শরীর ওঠে-নামে। বালি পাড়ায়। শেখচাচার আলো মাড়ায়— সাবাড়ের গোছানো সমতলে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, কে আছ্ু রে? লাবাইবিনি?

ঝোড়া উপ্ুড় করতেই মাছ। গা-চকচকে আঁশ। শেখচাচার আলো পড়ে সম্ুদ্রের মণি-ম্ুক্তা।

মিন্ট্ু দাস চেঁচায়, ও নারান—কোলোনির মাইয়াদের ডাক দিসিলি?

রাতটা ভোরের দিকে ক্লান্ত নরনারী ছাউনি আড়ালে এলোমেলো। নারানের ডাক বেয়ে যায় লাল কলোনির এমুড়ো থেকে ওমুড়ো। যারা মিন্টু দাসের খাতায় কাজ করে একবার পাশ ফিরে চোখ মেলে। হাই তোলে। ছেঁড়া লেপ-কাঁথা ত্যাগ করতে আলসা। শাশুড়ি ঘড়ুইবুড়ি ডাকে, ও বউমা যাবোনি?

—হুঁ।

ঠাকুমার ডাকে দশ বছুরে নাতনি জেগে ওঠে। বলে, আমি যাবো—

—কোনঠিরে অষ্টমী?

—ট্রলারে। সেদিন এক ব্যাগ মাছ পাইছিলি। সেগুলান তো ঠাকমার মাচায় শুকায়?

কুলকুচো করে বাসিমুখের গন্ধ কাটায়। চোখ ধোয়। হাত চালিয়ে মাথা গুছোয় ঘড়ুইবউ। আলগা খোপা বেঁধে গায়ে ব্লাউজ আঁটে। মনমরা যতীন বলে, আমি যাবো—

—না। তুমি শু-থাকো। পরামর্শ আর নির্দেশে সে বাক্য গড়ে ওঠে। গায়ে ফ্রক গলিয়ে বাজারি পলিথিন ব্যাগ হাতে নেয় দশ বছরের অষ্টমী। বড়-বউমা বলে, বড্ড জাড় রে মা?

—হউক।

গা-গতরে ভরাট বড়বউমা। চাদর জড়াতেও নজর-ধরা বুক। বুড়ি শাশুড়ি বলে, ফেরকা লুবো—?

ঘড়ুইবউ মাথা নাড়িয়ে সায় জানায়।

চালার বাইরে আসতে আরও চালা। স্বপ্না বের হয়। রেখা নীতা বউদি। কালোনির মেয়ে লেবাররা কাজে যায়। বেড়া ডিঙোতেই সাবাড়। শেখচাচার আলোতে তাবা সাবাড় কর্মী।

নারান শী হাঁকে, তোমরা কজনা?

মুখরা বউদি বলে, গুনতে জাননি?

পাশেই ছোট-বড় ঝোড়া, বস্তা। বেলচা দাঁড় করানো। মাটিকাটা ঝোড়াটা হাতে নিয়ে ঘড়ুইবউ বলে, এই ঝোড়ার এক ঝোড়া মাছ লুবো—

—মজুরি?

—লুবোনি। 'ফেরকা' চাই—

—টিফিন?

—আহা গো? ঘরের জল খায়ে, সাবাড়ে খাটবো? টিফিন দিবে—

মেয়ে লেবাররা একসঙ্গে বলে, হাঁ, আমরাও ফেরকা লুবো। টিফিন খাবাইতে হইবে—

পাশেই মিন্টু দাঁড়িয়ে, তাই অইবে। কাম ধরি ফ্যালাও এহুনি।

বালির উপর খড়, তার উপর ঘন বুননের জাল বিছিয়ে সাবাড়। স্থানে স্থানে ঢিপি করা মাছ। কলোনির বউরা, চোদ্দো-পনেরো বছরের ফ্রকপরা মেয়েরা মাছ বাছাই করে। মিন্টু দাস দেখিয়ে দেয়, তোমরা ছুরি মাছগুলানরে এদিকের তন রাইখবা, ভোলারে ওদিকে, লালপাতি এহ্যানে—

যেহেতু তলায় খড় তার উপর ঘন ফাঁসের জাল, পা ফেলতেই খসমস শব্দ। পিছনে তাকায় মিন্টু দাস। মাঝারি 'সাং' ঝোড়ায় মাছ। 'লাট' বয়ে নিয়ে আসে জগন্নাথবা। তদারকি কবতে মিন্টু দাস বলে, থাম্। এই লাট এহ্যানে ফেলা—। একটু জায়গা বাখতে হইব তো? আগের মাছগুলানকে শুকাইতে দিতে অইব না?

মেয়ে লেবাররা হাতে বাঁখারি কাটা 'পাটোয়া' নিয়ে মাছের ঢিপি ভাঙে। পরে সুবিধেমত হাত দিয়ে মাছ বাছে। ছোট-বড় শ্রেণীকরণ করে। বড় স্তূপ ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট স্তূপ হয়। সবুজ ঘুনি জালেব উপর মাছ। শেখচাচার আলো পড়ে। নাইলন জালের সুতো চিকচিকায়। চিকমিক করে কাঁচা মাছের আঁশ।

মেয়েদের সঙ্গে বসে মাছ বাছছিল নারান। হঠাৎ মিন্টু দাস বিব্রত। আকাশে কেমন ফ্যাকাশে রং ধরে। দু'ট্রলারের একখানা কি খালি হয়েছে? সুতরাং জল-কিনারে ট্রলারের কাছে যেতে উদ্যোগ নেয় মিন্টু দাস। তখন এক ঝোড়া মাছ মাথায় নিয়ে আসে ছোকরা লেবার। মিন্টু দাস হাঁক দেয়, নারান—

—আজ্ঞা?

—ওই ঝোবাটা ওদিকে বেরার তন ফ্যালাইতে কও—, বলে দুই বেড়ায় মাঝখান দিয়ে হাঁটে। বড় তরোয়ালের মতো রুপোবটি মাছ দু-পাটে শুকোয়। ঝুলে ঝুলে ল্যাজ-মাথা এক বেখায়। কয়েক পা যেতেই মনে হল, লেবারগুলো ঠিক ঠিক মাছ বইতিসে, নাকি বিরি খায় আর গল্প চালায়…। কাজের গতি এত কোম ক্যান?

শীতের শেষ রাতে হাওয়া ভারী। ভারী বাতাসে শুকনো মাছের শুটকি গন্ধ পাক খায়। নাকে লাগে না মিন্টু দাসের। লেডিস শালটা ভাল করে গায়ে জড়াতে জড়াতে ভাবে, আরও মাছ…আরও শুকাক। গাছের পাতার মতো সাজিয়ে ঝুলবে সাবাড় জুড়ে। শেওড়াফুলি বাগনান আসাম ত্রিপুরাব লোক আইবে ভুটভুটি বোট লইয়া। চালান যাইবে—। কিন্তু লেবাররা কাজ তুলতিসে কই?

কাঁচা মাছের বাছাই করতে করতে বউদি হঠাৎ চেঁচায়, হাই মাগো সাপ—

—কাঁই গো? নারান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে এগোয়।

মেয়ে লেবাররা সরে আসে। নারান দেখে-বুঝে বলে, দ্যাখি পাটোয়াটা? বাঁখারি কাটা পাটোয়া দিয়ে খোঁচায় মাছের মধ্যে সাপটাকে। পাটোয়া খুঁচিয়ে দড়ির মতো ঝোলায় সাপটাকে। সবাইকে ধমকে বলে, দুস্! তোমরা কি কলিকাতার মেম নাকি গো? মরা সাপে ঢং দেখাইলে?

—হুঁ। দিবে তো মজুরি মাত্র পনেরো টাকা—? না হয় এক ফেরকা কুচো মাছ? গাঙের ওই বিষাক্ত জিনিস হাতে তুলতে হইবে?

ঘড়ুইবউ বলে, ও নারানদা—

—কি?

—মজুরি বাড়াইবেনি?

—কাজ সারো তো—, দাবড়ি মারে নারান।

—কেনি গো ? বাবুর আড়তে শুটকির দাম এ বছর বাড়ছেনি ?

ফট করে আলো নিভে যায়। শেখচাচার জেনারেটারের ভট্‌ভট্‌ শব্দ বন্ধ। চারদিকে ভোর। বক-চিল্ল ক্র্যাঁ ক্র্যাঁ শব্দে আকাশে ওড়ে। কানকাটি, মনাপাখি সাবাড়ের উপর পরিসরে পাক খায়। কাঁচা মাছের লোভে চক্রাকারে ঘোরে।

ট্রলার থেকে ঝোড়া নামাতে গিয়ে দু-চার খানা মাছ খসে পড়ে নোনাজলে। অষ্টমী মেয়েটা জামা ভিজিয়ে মরা মাছ খাপচি মেরে ব্যাগে ভরে। মিন্টু দাস হাঁক দেয়, এই মেয়েটা—সরি যা। পালা কাজের সোময়—

বাচ্চাকাচ্চাগুলো জল ঝাঁপায়, মরা মাছ কুড়োয়।

ভয়ার্ত পশুর মতো দৌড়ায় মলিন। বড় বাঁধের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখে, পুবের আকাশ লালচে। মিন্টু দাসের সাবাড় সীমানায় বক-চিলের ওড়াওড়ি। মেয়ে লেবারদের ভিড়।

ফিশলটের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটে। দূরত্ব কমাতে। আর ভোরকে ভোরের খাঁচায় রাখতে। ঝোপঝাড়ের পালা-খোঁচায় পা ছড়ে যায়। তখন মনে হয়, গাছগুলো রাতকে আর-একটু ধরে রাখতে পারলোনি গো…! যখন ফিশলটের নোনা বাঁধে মলিন, নজরে পড়ে বউ-মেয়েদের। বলে, হাই দেখ নারানদা—

—কী ?

—তোমার লোক।

ঘড়ুইবউ মেয়েদের দিকে অবহেলায় তাকায়, বড্ড বকবকানি চকারচিকির করছু তো ?

নারান তাকিয়ে থাকে। মলিন লাল কলোনি পার হয়ে সোজা সাবাড়ের বেড়া ডিঙোয়।

মিন্টু দাস এসে দাঁড়ায়। মলিনকে দেখে ভয়ংকর হাঁক দেয়, ধর! ধর হালারে। বার বার মনে হইতেছে লোক কোম। কাজ ওঠছেনি— ?

নারান ছুটে যায়। মলিন বেড়ার কাছে চুপচাপ দাঁড়ায়। নারান লজ্জায়, অযোগ্যতায় ক্ষিপ্ত। তারই সংগ্রহ করা লেবার এমন বেইমান, কামচোর! মিন্টু দাস গায়ের চাদর কোমরে গিঁট বেঁধে বড় বড় পায়ে মলিনের কাছাকাছি। রাগে চোখ গোল গোল। মাথার চুল ঝাঁকড়া, হ্যা রে হালা—কই গেসিলিস ? 'পেট পাকিয়েছিল' কথাটা বলতে গিয়ে পারে না। কচি বউয়ের কাছে রাতের মায়া, মমতাময় যাপনে মিছেকথাটা এই সকালে বানাতে বাধে। তাই সে নতমুখে বলে, বাড়ি—

—কাউরে বল্‌সিলিস ? নারান, তোরে কইছিলো ?

মাথা নাড়িয়ে 'না' কথাটা ফুটিয়ে তোলে দেশের ছেলে নারান শী।

—তয় হইলে হালা ? চার মাসের জইন্যে তিন হাজার টাহা চুক্তি—তার মইধ্যে আটশ টাহা দাদন নিসিস ?

অপরাধীর মতো বলে, লইছি—

বিশ্ব ব্যাঙের মতো লাফায় মিন্টু দাস, তয় হইলে আমার কাজে ফাঁকি? টাহাটা তো আমার— ?

—একটা দিন কাজ করছি নাই, ধীর গলায় মালিককে বলে।

—আবার মুহের উপুর কথা, বলেই মারে সপাটে এক চড়।

দৃশ্যটায় ঘড়ুইবউ দোল খায়। মেয়েরা খিলখিল হাসে। গোটা সাবাড় অন্যমনস্ক।

মিন্টু দাস বলে, বাঁনধ্ হালারে। এহ্যানে আর কাউরি বারিতে যেন বউ নাই? শালা মাগীখোর—জোচ্চোর—। ওরে ছারি দিলে, সব লেবার ওই কান্ড বাধাইবে—? বাঁনধ্ কাছি দিয়া পশুভাবে।

নারান দাসবত এগিয়ে যায়।

মিন্টু দাস উত্তেজনায় অবিন্যস্ত। অফিসঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, নারান তোমার লেবার এমন হারামি! বিয়ালে তোমার সনে কথা অইব—।

চার মাসের জন্যে লেবাব যুগিয়ে কিছু কমিশন আর নিজে কাজ করে বেতন উপার্জন। সেটাও বরবাদ হওয়ার উপক্রম। কাছিটা নিয়ে নারান বলে, বড্ড চুলকানি তোমার? ঠায় দাঁড়াইবি বে জানোয়ার—

ভোর পুরিয়ে সকাল হয়। ক্রমে ক্রমে মধ্যদুপুর। ধু-ধু বালিচরে বেড়াবন্ধন। ডাইনে সমুদ্রশাসন। কাজের বিনিময়ে ডাক পড়ে, টিফিনের সাবাড় ফাঁকা হয়ে রান্নাশালে, লেবাব শেডে ভিড়।

চোদ্দো-পনেরো বছবের মেয়েরা মলিনকে দেখে মুখ ঘুবিয়ে ফিকফিক হাসে। মুখরা বউদি শুনিয়ে বলে, যেমন রাতের বেলায় সুখ করছো দিনের বেলা রোদে ভাজা হও—।

—না গো, শুটকি হও—, বলে মাত্রা চড়ায় পনেরো বছরের মেয়ে নীতুটা।

জগন্নাথকে একলা পেয়ে নারান ধমকায়, তুই আমানে জানালিনি কেনি? অখন কোম্পানির কাছে আমার মান থাকবে? ফিরে বছর তোদের কাজে লাগাইতে পারবু?

বিপদে পড়ে জগন্নাথ। বলে, আমি কী করবো? আমি কি গেছিলি ঘরে?

—দূর বোকা। দেশের ছেলে—নিজ হাতে শাস্তি। মন চায়?

—উ তো পর মেয়েছেলের কাছে যাইনি? এত শাস্তি? অপমান?

—থাম্। মালিক ম্যানেজার কেউ ঘর যাইতেছে? এই চার মাস ওদেব ঘর আছে না সংসায় আছে? শুধু টাকা···লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা। দক্ষিণে হাওয়া বইবার আগে যতো পারে টাকার যোগাড়···

—তবে, ছাড়ি দাও না?

—দুস্। আমি কে?

—তবে ইউনিনে জানাও। লিডাররা আসুক—

—সে তো বিকালের আগে নয়।

টিফিনের ভাত খেয়ে থালাটা ধুয়ে ঘড়ুইবউ থমকে দাঁড়ায়। ক-পা হেঁটে এগোয়। ধীর গলায় বলে, খাবা হইছেনি, না ?

মলিন মাথা নিচু করে চুপচাপ।

ঘড়ুইবউ হাঁটু মুড়ে বসে, আমার চালা থিকে একমুঠো পানতা আনি দুবো— ?

মলিন কথা বলে না।

রোদ ক্রমশ গরম হয়। তলস্থ বালি তাতে। চরের শিরা-উপশিরায় গোপন সঞ্চয় শুকনো হয়।

ঘড়ুইবউ ছোকরা মলিনের যুবকমুখ, চোখ দেখে। আস্তে করে বলে, বউটারে খুব ভালবাসো, না ?

মলিন মুখ তুলে তাকায়। দু-চোখ যাতনায় জরে যায়।

ঘড়ুইবউ'য়ের গোলগাল চেহারা ভারী বুক ঝাঁঝরা।

ফিশলট্ পেরোলেই দু-তিনটে বাদা মাত্র। দূর নয়, নিকট! বালিচরে রোদ ঝরে। প্রহর গড়ে। পরবাসে প্রহর বাড়ে।
